শিক্ষা শৃঙ্খলা চরিত্র দেশপ্রেম সেবা

সন্দীপন

বার্ষিকী-২০১৫

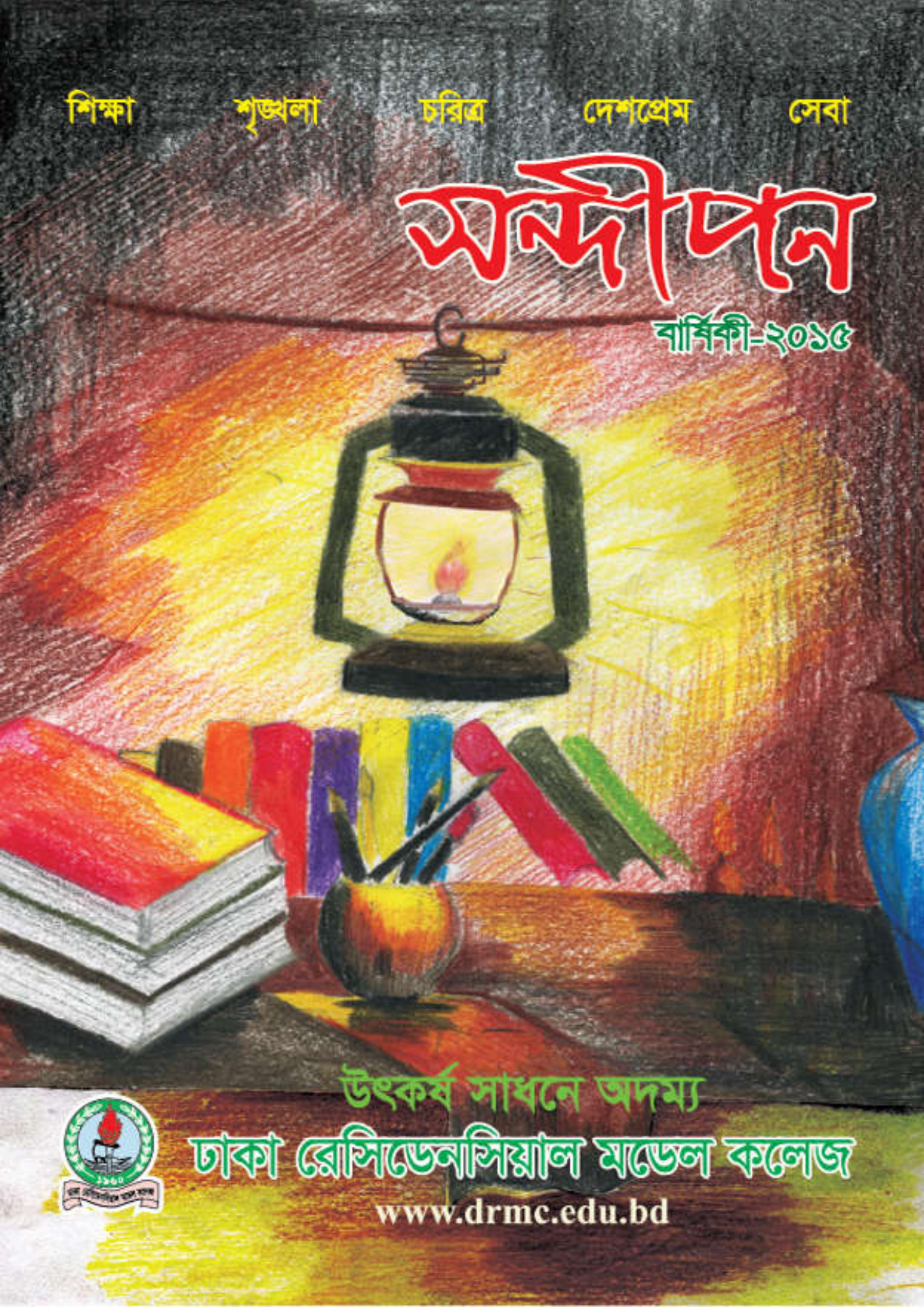

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

www.drmc.edu.bd

DHAKA RESIDENTIAL MODEL CO
প্রশাসন ভবন

সন্দীপন

পৃষ্ঠপোষক :

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল হান্নান
অধ্যক্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

ফেরদৌস আরা বেগম, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা
ইরশাদ আহমেদ শাহীন, উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা
মোঃ খালেদুর রহমান, উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ-২০১৫

মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক, সহযোগী অধ্যাপক
সাবেরা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক
মির্জা তানবীরা সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক
রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী অধ্যাপক
ড. রুমানা আফরোজ, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, প্রভাষক
সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী, প্রদর্শক
মাস্টার মোঃ আনিসুল ইসলাম, দ্বাদশ-ঙ (প্রভাতি শাখা)
মাস্টার মোঃ রায়হান হোসেন, দ্বাদশ-ঙ (দিবা শাখা)
মাস্টার সাকিব আহমেদ সিদ্দিকী, দ্বাদশ-গ (প্রভাতি শাখা)
মাস্টার মোঃ কাজী আতাপ জাহিন, দ্বাদশ-ঙ (দিবা শাখা)

মুদ্রণতত্ত্বাবধায়ন : মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক, সহযোগী অধ্যাপক
সাবেরা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক
রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী অধ্যাপক
সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী, প্রদর্শক

আলোকচিত্র : তানবীরা সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক

প্রচ্ছদ : চৌধুরী ফাতিন ইলহাম, নবম-ঘ (প্রভাতি শাখা)

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫

মুদ্রণ : অণিমা
৯৯ ও ২৮৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা
ফোন : ০১১৯৮-২০০১৭৩, ০১৯১২-১৬০৪৪৬
ই-মেইল : animacommunications@gmail.com
anima.shemu91@gmail.com

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ এবং বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ

সভাপতির বাণী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। এতে যেমন প্রতিষ্ঠানের সাংবৎসরিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে, তেমনি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্বকীয় প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ঘটে। শিক্ষার্থীদের বিকাশোন্মুখ চেতনার লালনে বার্ষিকী উর্বর ভূখণ্ডের ভূমিকা পালন করে। বার্ষিকীর এ গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বার্ষিকী 'সন্দীপন' তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। 'সন্দীপন-২০১৫' এর প্রকাশকে আমি স্বাগত জানাই।

বার্ষিকীর নবীন লেখকদের মধ্য হতে একদিন বিশ্ববরেণ্য প্রতিভার আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে–এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আগামীদিনের সেই সম্ভাবনাময় লেখকদের প্রতি রইল আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।

পরিশেষে কলেজের অধ্যক্ষ এবং বার্ষিকী প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সোহরাব

মোঃ সোহরাব হোসাইন

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

অধ্যক্ষের বাণী

মননশীল ও সৃজনপ্রয়াসী মানুষমাত্রই আত্মপ্রকাশকামী। শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশের আবেগ আরো প্রবল। তারা তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য সন্ধান করে অবাধ ও উপযুক্ত মাধ্যম। শিক্ষার্থীদের মননশীলতার চর্চা এবং সৃষ্টিশীল আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রতিবছর হাউসভিত্তিক দেয়ালপত্রিকা, বিজ্ঞানম্যাগাজিন ও বিতর্কস্মৃতিনির ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশ করে থাকে কলেজবার্ষিকী। এ চিরায়ত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হচ্ছে **'সন্দীপন-২০১৫'**।

'সন্দীপন' এ লেখার ক্ষেত্রে তৃতীয় হতে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ছাত্রদের বৈচিত্র্যময় লেখায় ও তুলিতে তাদের কচি-কোমল মনের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাদের জন্য আমার আশীর্বাদ রইল। কলেজের যেসব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বার্ষিকীতে লিখে ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের প্রতিও রইল উষ্ণ অভিনন্দন।

আশাকরি বার্ষিকীটি ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবে। পরিশেষে যাদের নিরলস শ্রম, সাধনা ও সহযোগিতায় **'সন্দীপন'** প্রকাশিত হচ্ছে তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মোঃ আব্দুল হান্নান
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সম্পাদকীয়

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বার্ষিকী প্রকাশের ইতিহাস সুপ্রাচীন ও গৌরবময়। প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিকী 'The PROGRESS' প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বার্ষিকী 'সন্দীপন'। অসীম সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং তাদের সাহিত্যপ্রয়াসকে উদ্দীপিত ও সন্দীপিত করার মহত্তম উদ্দেশ্যে 'সন্দীপন' তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে আজো প্রকাশিত হচ্ছে।

বার্ষিকীতে প্রকাশের জন্য আমরা ছাত্রদের নিকট থেকে প্রচুর লেখা ও চিত্রাঙ্কন জমা পেয়েছি। সেগুলোর মধ্যে উভয় শাখার সকল শ্রেণির ছাত্রদের কিছু বাছাইকৃত লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রয়োজনীয় পরিমার্জনসহ ছাপানো হল। স্থানাভাবে অনেকেরই লেখা ও চিত্রাঙ্কন ছাপানো সম্ভব হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করছি।

শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীরা ছাড়াও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী লেখা দিয়ে 'সন্দীপন'কে সমৃদ্ধ করেছেন। সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। বার্ষিকীর লেখায় ব্যাকরণসিদ্ধ আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সচেতন ও সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও বার্ষিকীতে কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। পাঠকসমাজ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি।

'সন্দীপন-২০১৫' এর বিশেষত্ব হল– এতে কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর মাননীয় সভাপতি ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সকল ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ছবি পৃথকভাবে প্রকাশ–যা অতীতে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো বার্ষিকীতে কখনো হয় নি। একারণে এ বছরের বার্ষিকীর কলেবরও আগের সকল বার্ষিকীর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ০১ জানুয়ারি থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত কলেজের কর্মকাণ্ড ও তথ্যাবলি এ বার্ষিকীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ২০১৫ এর সর্বজনীন স্মৃতিবাহী বিশেষত্বের জন্যই হয়ত বার্ষিকীটি সকলের নিকট সমাদৃত ও সংরক্ষিত থাকবে আজীবন।

বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয়ের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রাজ্ঞ দিকনির্দেশনা ছাড়া বার্ষিকীটি তার বিশেষত্ব নিয়ে প্রকাশিত হত না। স্যার বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করে বার্ষিকীর সমস্ত লেখা নিবিড়ভাবে পাঠ করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন। এজন্য স্যারকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষবৃন্দ, সর্বস্তরের সহকর্মী ও মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও
আহ্বায়ক, বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ

বোর্ড অব গভর্নরস

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি

শাহাবুদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

কাজী রওশন আক্তার
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

প্রফেসর ফাহিমা খাতুন
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য

প্রফেসর মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
সদস্য

মোঃ আবু সাঈদ শেখ
যুগ্ম-সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
এবং অতিরিক্তপ্রতিনিধি-প্রভাতি শাখা
সদস্য

ড. এম নিয়ামুল নাসের
অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং অতিরিক্তপ্রতিনিধি-দিবা শাখা
সদস্য

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষকপ্রতিনিধি
(প্রভাতি শাখায় কর্মরত)
সদস্য

মোঃ বাকাবিল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক ও শিক্ষকপ্রতিনিধি
(দিবা শাখায় কর্মরত)
সদস্য

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ আব্দুল হান্নান
অধ্যক্ষ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ
সদস্য-সচিব

শিক্ষকবৃন্দ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ আব্দুল হান্নান
অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষবৃন্দ

ফেরদৌস আরা বেগম
প্রভাতি-সিনিয়র শাখা

ইরশাদ আহমেদ শাহীন
দিবা-সিনিয়র শাখা

মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রভাতি-জুনিয়র শাখা

মোঃ খালেদুর রহমান
দিবা-জুনিয়র শাখা

সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ

নিশাত হাসান
ইংরেজি

মোঃ মনজুরুল হক
গণিত

ড. মোঃ নূরুন নবী
ইংরেজি

জেহিন বেগম
বাংলা

আসমা বেগম
প্রাণিবিদ্যা

ফাতেমা জোহরা
ইসলামশিক্ষা

ড. সৈয়দা খালেদা জাহান
বাংলা

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
গণিত

রওশন আরা বেগম
ইসলামের ইতিহাস

মোঃ রফিকুল ইসলাম
রক্তবিজ্ঞান

মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান

মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
বাংলা

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি

সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ

মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন
শারীরিক শিক্ষা

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
যুক্তিবিদ্যা

জে এম আরিফুর রহমান
রসায়নবিজ্ঞান

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত

রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারুকলা

মোহাম্মদ আব্দুলাহ্ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ইংরেজি

রতন কুমার সরকার
চারু ও কারুকলা

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস

অনাদি নাথ মণ্ডল
গণিত

আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
কম্পিউটারশিক্ষা

ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলামশিক্ষা

নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গণিত

মোঃ জাহেদুল হক
রসায়নবিজ্ঞান

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গণিত

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা

আসাদুল হক
ইংরেজি

মুহাঃ ওমর ফারুক
ইসলামশিক্ষা

সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি

মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত

প্রসনজিত কুমার পাল
রসায়নবিজ্ঞান

খোদেজা বেগম
অর্থনীতি

মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা
ব্যবস্থাপনা

নার্গিস জাহান কনক
উদ্ভিদবিদ্যা

ড. রুমানা আফরোজ
বাংলা

প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি

মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান

হাফিজ উদ্দিন সরকার
উদ্ভিদবিদ্যা

জাকিয়া সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা

ফাতেমা নূর
ইংরেজি

নুরুন্নাহার
চারু ও কারুকলা

মোঃ আয়নুল হক
ইংরেজি

প্রভাষকবৃন্দ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মোঃ ফরহাদ হোসেন
ভূগোল

সাবরিনা শরমিন
ভূগোল

এ কে এম বদরুল হাসান
পদার্থবিজ্ঞান

খন্দকার আজিমুল হক পাপ্পু
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ ফারুক হোসেন
রসায়নবিজ্ঞান

মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া
রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ইসলামশিক্ষা

মোঃ নজরুল ইসলাম
রসায়নবিজ্ঞান

অসীম কুমার দাস
ভূগোল

দেওয়ান শামছুদ্দোহা
ইংরেজি

মোঃ শামসুজ্জোহা
শারীরিক শিক্ষা

জি এম এনায়েত আলী
উদ্ভিদবিদ্যা

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ নুরুল ইসলাম
কৃষিশিক্ষা

মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া
কৃষিশিক্ষা

মোঃ খায়রুল আলম
কৃষিশিক্ষা

মোঃ ফারুক হোসেন
শারীরিক শিক্ষা

মোঃ মহিউদ্দিন
ইসলামশিক্ষা

মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী
গণিত

হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলা

মোঃ হিসাব আলী
গণিত

মোঃ ওয়াছিউল ইসলাম
গণিত

মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী
বাংলা

মুহসিনা আক্তার
হিসাববিজ্ঞান

জাফর ইকবাল
হিসাববিজ্ঞান

মোঃ সাইফুল ইসলাম
বাংলা

মশিউর রহমান
বাংলা

মোহাম্মদ আল আমিন
ইসলামশিক্ষা

মোঃ এনামুল হক
ইংরেজি

সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলামশিক্ষা

মোসাঃ ইশরাত জাহান
কৃষিশিক্ষা

তৌফাতুন্নাহার
পরিসংখ্যান

রাসেল আহমেদ
কম্পিউটারশিক্ষা

মোঃ আমিনুর রহমান
রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস
ইংরেজি

রাশেদুল মনসুর
ইংরেজি

হাসিনা ইয়াসমিন
ভূগোল

আবদুল কুদ্দুস
যুক্তিবিদ্যা

মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন
ইংরেজি

হরি পদ দেবনাথ
রসায়নবিজ্ঞান

নিয়ামত উল্লাহ
পদার্থবিজ্ঞান

রফিকুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ নাহিদুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ আবু ছালেক
উদ্ভিদবিদ্যা

তানিয়া বিলকিস শাওন
বাংলা

আয়িশা আনোয়ার
কম্পিউটারশিক্ষা

মোঃ আব্দুল জলিল
ইংরেজি

মোঃ আশিক ইকবাল
কম্পিউটারশিক্ষা

মোঃ মাসুম বিন ওহাব
রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ খলিল মিয়া পাঠান
রসায়নবিজ্ঞান

ওমর ফারুক
গণিত

মোঃ হাসান মাহমুদ আবু বক্কর সিদ্দিক
গণিত

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
প্রাণিবিদ্যা

মোঃ আবু সালেহ
গণিত

ফাহমিদা আক্তার
বাংলা

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
ইংরেজি

তারেক আহমেদ
বাংলা

মোঃ খায়রুজ্জামান
ইংরেজি

তামান্না আরা
বাংলা

আয়েশা খাতুন
প্রাণিবিদ্যা

মো. আমিনুল ইসলাম
বাংলা

মোঃ আবু সাঈদ
ইংরেজি

মোঃ আহসানুল হক
ব্যবস্থাপনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইসলামশিক্ষা

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
বাংলা

মোঃ মাজহারুল হক
ইতিহাস

সর্ব্বাণী রায়
ইংরেজি

মোঃ মুরাদুজ্জামান আকন্দ
অর্থনীতি

মোঃ জাকারিয়া আলম
ইংরেজি

আসাদুজ্জামান
বাংলা

কৃষ্ণ কুমার বিশ্বাস
বাংলা

মু. ওমর ফারুক
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ আব্দুল হামিদ
ইসলামশিক্ষা

মোঃ ওয়াজিব উল্লাহ্
উদ্ভিদবিদ্যা

ফারজানা ইসলাম
বাংলা

মোঃ সাদিউল ইসলাম
ইংরেজি

মারিয়া হক
গণিত

শাহিন আলম
বাংলা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বুলবুল আহমেদ
বাংলা

মেহেদী হাসান
রসায়নবিজ্ঞান

মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
গণিত

সহকারী শিক্ষক ও প্রদর্শকবৃন্দ

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, ইসলামশিক্ষা

আব্দুল মোমেন খান
প্রদর্শক, ভূগোল

মোঃ ছানাউল হক
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

মোঃ কামাল হোসেন
প্রদর্শক, কম্পিউটারশিক্ষা

ভারত চন্দ্র গৌড়
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
প্রদর্শক, কম্পিউটারশিক্ষা

মোঃ ফোরকান
প্রদর্শক, রসায়নবিজ্ঞান

ফারহানা আক্তার
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

পরেশ চন্দ্র রায়
প্রদর্শক, গণিত

ওয়াহিদা সুলতানা
প্রদর্শক, ভূগোল

মোঃ রমজান আলী
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

প্রণব হাওলাদার
সহকারী শিক্ষক, হিন্দুধর্ম

বর্নালী ঘোষ
সহকারী শিক্ষক, সঙ্গীত

মোঃ তাজ-আল তানভীর
প্রদর্শক, রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ জুবায়ের হোসেন
প্রদর্শক, গণিত

মোঃ জাহিদুজ্জামান জাহিদ
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদ এর স্টাফ

মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন
ইমাম

মোঃ হাসানুজ্জামান
খাদেম

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ মশিউর রহমান
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
মেডিকেল অফিসার

নিয়াজ আব্দুল্লাহ্
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

গোলাম হোছাইন খান
গ্রন্থাগারিক

দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ

ফরিদ আহমেদ
সহ. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মতিয়ার রহমান
লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

মোঃ অছিউর রহমান
সহ. স্টোর কর্মকর্তা

মোঃ আমীর সোহেল
সহ. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ রেজওয়ান
উপ-সহ. প্রকৌশলী

মোঃ মাইনুল ইসলাম
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর

তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

আব্দুল্লাহ্ মুর্শিদ
হিসাব রক্ষক

রওশন আরা বেগম
পি.এ.টু প্রিন্সিপাল

মোসাম্মৎ তহমিনা খানম
প্রধান সহকারী

তানজিম হাসান
হিসাব রক্ষক

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী

আব্দুর রহিম
উচ্চমান সহকারী

মোঃ ইফতিয়ার এহসান চৌধুরী
উচ্চমান সহকারী

সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ
উচ্চমান সহকারী

ফারহানা আফরোজ
স্টোরকিপার

মোঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো
কেয়ারটেকার

মোঃ সুহেল রানা
স্টোর এ্যাসিসটেন্ট

মোঃ আফজাল হোসেন
টেক্সটবুক স্টুয়ার্ড

রওশন আরা সাথী
মেট্রন

মোঃ খাইরুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

মুহাম্মদ শহিদুর রহমান
অফিস সহকারী

মোঃ লোকমান হোসেন
স্টুয়ার্ড

মোঃ রবিউল ইসলাম
ফার্মাসিস্ট

মোছাঃ মুনিরা বেগম
মেট্রন

দিলীপ কুমার পাল
স্টুয়ার্ড

মোছাঃ রোকেয়া আখতার
অফিস সহ. কাম-কম্পি.অপারেটর

হাবিবুর রহমান
হিসাব সহকারী

মোঃ শহীদুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

রিপন মিয়া
হিসাব সহকারী

মোঃ মঈনুল হাসান
গ্রাউন্ডস সুপারিনটেনডেন্ট

মোঃ মহসিন আলম
অফিস সহকারী

হাসিনা খাতুন
অফিস সহকারী

আল-মামুন
অফিস সহকারী

মোঃ আব্দুল খালেক
গাড়িচালক

মোঃ শহীদউল্লাহ
গাড়িচালক

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ মমতাজ উদ্দিন মজুমদার
ইলেকট্রিশিয়ান

চাঁদ মিয়া
প্লাম্বার

নাসির উদ্দিন আহমেদ
ওয়্যারম্যান

মোঃ ছাদেক আলী
কাঠমিস্ত্রী

আবু সাঈদ
বাবুর্চি

মোঃ আমজাদ হোসেন
টেবিলবয়

মেথিউ রবীন্দ্র মুহুরী
ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট

রহমত উল্লাহ
টেবিলবয়

শ্রী সাবিয়া
হেড সুইপার

মোঃ দৌলত আলী
হাউজগার্ড

আবু সাঈদ মোল্লা
হাউজমালি

মোঃ শাহজাহান
টেবিলবয়

আছাদুজ্জামান হাওলাদার
হাউজগার্ড

মোঃ আব্দুল জলিল
বাবুর্চি

মোঃ রেজাউল আলম খান
মেশন (রাজমিস্ত্রী)

মোঃ নুরুল ইসলাম
সহকারী বাবুর্চি

আমিনুল হক
টেবিলবয়

মোঃ মোস্তফা
বাবুর্চি

মোসাম্মৎ জরিনা খাতুন
আয়া

মোঃ আব্দুল রশিদ
বাবুর্চি

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হেড গার্ড

মোঃ আব্দুল মান্নান সিকদার
প্লাম্বার হেল্পার

মোঃ মোতালেব
ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট

মোঃ হারুন অর রশীদ
ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট

মোঃ ইউনুস
সুইপার (সেন্ট্রাল)

মোঃ আবুল কামাল
এমএলএসএস

মোঃ জাকির হোসেন
ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট

মোঃ ইয়ার আলী
বাবুর্চি

মোঃ আইয়ুব আলী	মোহাম্মদ আলী খান	মোঃ খলিলুর রহমান	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	মোঃ ছাবেদ আলী	শ্রী কৃষ্ণান দাস	মোঃ জিল্লাহ
সুইপার (সেন্ট্রাল)	এমএলএসএস	ল্যাব. এটেনডেন্ট	এমএলএসএস	রংমিস্ত্রী	সুইপার (সেন্ট্রাল)	কার্পেন্টার হেলপার

মোঃ জাকির হোসেন মধু	মোঃ আব্বাস আলী	মোঃ ফারুকুল ইসলাম	মোঃ আবজাল হোসেন	মোঃ সেলিম	মোঃ কামাল হোসেন	মোঃ মঞ্জুরুল হক
সহকারী বাবুর্চি	সহকারী বাবুর্চি	ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট	সহকারী বাবুর্চি	টেবিলবয়	বাবুর্চি	ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট

মোঃ আব্দুর রশিদ	মোঃ সোহরাব হোসেন	মোঃ দেলোয়ার	মোঃ আব্দুল কাদের	মোঃ মনির হোসেন	তিমথী পেনাপেন্টী সবুজ	মোঃ আমিনুল ইসলাম
এমএলএসএস	সহকারী বাবুর্চি	এমএলএসএস	এমএলএসএস	হেডমালি	সুইপার (সেন্ট্রাল)	টেবিলবয়

মোঃ জাকির হোসেন	মোঃ রেজাউল ইসলাম	মোঃ শহীদুল ইসলাম	ইফতিয়াজ হোসেন বাবু	মোঃ হানিফ	মোঃ মোকছেদ আলী খাঁন	খন্দকার আমিনুল ইসলাম
ওয়ার্ডবয়	গেইট দারোয়ান	ম্যাট	সুইপার (হোস্টেল)	সুইপার, শিক্ষাভবন-১	নিরাপত্তা প্রহরী	নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ আনোয়ারুল হক	মোঃ ফারুক সিকদার	মোঃ কুদ্দুস মোল্লা	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ কামাল হোসেন	মোঃ মজিবুর রহমান	মোঃ আব্দুর রহমান
নিরাপত্তা প্রহরী	নিরাপত্তা প্রহরী	নিরাপত্তা প্রহরী	নিরাপত্তা প্রহরী	নিরাপত্তা প্রহরী	ওয়ার্ডবয়	হাউসগার্ড

আব্দুল জলিল মিয়া	আল আমিন খোন্দকার	মোঃ শহীদুল ইসলাম	শাহ মোঃ আজিজুল হক	মোঃ বশিউর রহমান	গাজী মোস্তাফা কামাল	মোঃ মোকছেদুল হক
ওয়ার্ডবয়	ওয়ার্ডবয়	প্রাক্টিকসম্যান	ওয়ার্ডবয়	ম্যাট	টেবিলবয়	টেবিলবয়

মোঃ মহিদুল হক	মোঃ মোকলেছুর রহমান	মোঃ মন্টু মোল্লা	মোঃ নূর আলম সিকদার	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মোঃ নাসির উদ্দিন	মোঃ আব্দুল হক
ম্যাট	স্টোর আর্দালি	মালি (সেন্ট্রাল)	ম্যাট	ওয়ার্ডবয়	হাউসমালি	হাউসগার্ড

স্টাফদের গ্যালারি

মোঃ সাহানাজ হোসেন — ওয়ার্ডবয়
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক — হাউজমালি
মোঃ শহীদুল ইসলাম — হাউজমালি
মোঃ লিটন মিয়া — লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট
মোঃ আব্দুল্লাহ — টেবিলবয়
মোঃ আজমল হোসেন — এম্বুলেন্সম্যান
মোহাম্মদ আলাউদ্দিন — ওয়ার্ডবয়

মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ — টেবিলবয়
মোহাম্মদ শফিকুর রহমান — ওয়ার্ডবয়
মোঃ মজিবুর রহমান — গেইট দারোয়ান
মোঃ জাহিরুল ইসলাম — এম্বুলেন্সম্যান
মোঃ রফিকুল ইসলাম — পাম্প অপারেটর
মোঃ সাইফুল ইসলাম — মালি
মুহাম্মদ শরীফ হোসেন — এম্বুলেন্সম্যান

মোছাঃ শিউলি আক্তার — হোস্টেল সুইপার
মোঃ সাইফুল ইসলাম — এম্বুলেন্সম্যান
মোঃ আহসানুল হক — টেকনিক্যাল বেয়ারার
আব্দুর রশিদ শেখ — এমএলএসএস
খালেদ পারভেজ — এমএলএসএস
আব্দুল কাদের — এমএলএসএস
আনোয়ার হোসেন খান — নিরাপত্তা প্রহরী

আব্দুস সালাম — নার্সিং এ্যাসিসটেন্ট
মোঃ জালাল উদ্দিন — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ জহিরুল ইসলাম — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ হেমায়েত হোসেন — এমএলএসএস
মোঃ ওসমান আলী — ওয়াচম্যান
মোঃ মফিজুল ইসলাম — ওয়াচম্যান
মোঃ শহিদুজ্জামান — হাউজগার্ড

মোঃ রাসেল বেপারী — হাউজগার্ড
মোঃ আবু সায়েম — লাইব্রেরি এটেনডেন্ট
মোঃ রিপন আলী — সুইপার
মোসাম্মৎ লাইলী আক্তার — সুইপার
মোঃ স্বপন হোসেন — সুইপার
আকলিমা বেগম — সুইপার
এ কে এম মইনুল আকবর — সুইপার

মোঃ আব্দুল মবিন — বৈদ্যুতিক সহকারী
নূর মোহাম্মদ কাজল — বৈদ্যুতিক সহকারী
আজিবুল ইসলাম — টেবিলবয়
সেলিম মিয়া — টেবিলবয়
মোঃ মাহিদুর রহমান মাসুম — টেবিলবয়
মোঃ রাসেল আলী — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ নজরুল ইসলাম — নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ খলিলুর রহমান — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম — সুইপার
হাবিব মোল্লা — গেইট দারোয়ান
মোঃ হানিফ — এম্বুলেন্সম্যান

সূচিপত্র

বিষয়শিরোনাম	পৃষ্ঠা
হাউসপ্রতিবেদন	২৪
টিচার্স-অফিসার্স-স্টাফস কর্নার	৩০
স্টুডেন্টস কর্নার	৫৫
ছড়া ও কবিতা	৫৬
গল্প ও ভ্রমণকাহিনি	৬২
কৌতুক, ধাঁধা ও সাধারণজ্ঞান	৭৩
প্রবন্ধ-নিবন্ধ	৮০
English Writing	৯৩
চারুচিত্র	১০৫
স্টুডেন্টস গ্যালারি	১১১
স্মৃতি-কৃতি-সাফল্য	১৮৯
কোলাজ	২০০

কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউসমাস্টার
নাসরীন বানু

হাউসটিউটর
আসাদুল হক

হাউসএন্ডার
মোঃ ফাহিম হাসান

হাউসপ্রিফেক্ট
আসাদুজ্জামান রিজন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে কুদরত-ই-খুদা হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এ হাউসের প্রথম নাম ছিল 'জিন্নাহ হাউস'। স্বাধীনতার পর হাউসটির নামকরণ করা হয় '১ নম্বর হাউস' এবং পরবর্তীকালে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয় 'কুদরত-ই-খুদা হাউস'। শুরুতে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করত এ হাউসে; বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে।

হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও মনোরম। হাউসের অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির অপরূপ মোহনীয় একটি বাগান। হাউসপরিচালনার ক্ষেত্রে হাউসের সাথেই রয়েছে 'হাউসমাস্টার' ও 'হাউসটিউটর' এর আবাসনব্যবস্থা। এছাড়াও সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য হাউসে রয়েছেন ১জন মেট্রন, ১জন বাবুর্চি, ১জন সহকারী বাবুর্চি, ১জন ম্যাট, ৩জন ওয়ার্ডবয়, ২জন টেবিলবয়, ১জন দারোয়ান, ১জন মালি ও ১জন সুইপার। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে রয়েছে ১০জন ছাত্রের সমন্বয়ে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের পিইসি পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র এবং জেএসসি পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ হাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া আন্তঃহাউস মঞ্চ প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃহাউস ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এ হাউসের ছাত্রদের সাফল্য অসাধারণ।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। কুদরত-ই-খুদা হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক– এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।

জয়নুল আবেদিন হাউস

হাউসমাস্টার
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান

হাউসটিউটর
সামীয়া সুলতানা

হাউসএন্ডার
মোঃ নাইমুর রহমান

হাউসপ্রিফেক্ট
মোঃ আকতারুজ্জামান আবির

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি আবাসিক হাউসকে বলা হয় ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এসব স্তম্ভের অন্যতম জয়নুল আবেদিন হাউস। এ হাউসের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬১ সালের পহেলা মে থেকে 'আইয়ুব হাউস' নামে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের মহান শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'জয়নুল আবেদিন হাউস'।

লাল সিরামিক ইটের তৈরি দোতলা এ হাউসটি দেখতে অত্যন্ত মনোরম। দেয়ালের শোভাবর্ধন করেছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সপ্রতিভ ম্যুরাল। ২০১৪ সালের এসএসসি ব্যাচের ছাত্রদের সৌজন্যে প্রতিস্থাপিত ম্যুরালটি ছাত্রদের হাউসপ্রীতির এক টুকরো নিদর্শন।

বর্তমানে হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে বিভিন্ন নামের আটটি বড় সেকশন বা ডরমিটরি এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক চারটি বিশেষ কক্ষ। এ হাউসে আরো রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিংহল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধাসহ একটি কমনরুম, একটি প্রেয়াররুম এবং নানা জাতের দেশি-বিদেশি ফুলেভরা একটি চমৎকার বাগান।

ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য হাউসের সাথেই রয়েছে হাউসমাস্টার ও হাউসটিউটরের বাসভবন। এছাড়া রয়েছে দশজন সার্বক্ষণিক কর্মচারী এবং একজন মেট্রন। কর্মচারীদের প্রায় সবাই হাউসে বসবাস করেন। নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের জন্য ছাত্রদের মধ্য থেকে গঠন করা হয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

লেখাপড়ায় এ হাউসের ছাত্রদের ধারাবাহিক সাফল্য প্রশংসনীয়। ২০১৪ ও ২০১৫ সালের পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষায় এ হাউসের প্রায় সকল ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে জয়নুল আবেদিন হাউসের ছাত্রদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস দেয়ালপত্রিকা ও আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ফজলুল হক হাউস

হাউসমাস্টার
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

হাউসটিউটর
মোঃ নূরুল ইসলাম

হাউসএন্ডার
মোঃ শিহাব উদ্দিন

হাউসপ্রিফেক্ট
মোঃ জামিল চৌধুরী

"কর্মভার-নবপ্রভাতে নব সেবকের হাতে করে যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাব ঘোষণা করে তোমার আহ্বান।"

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হাউস ফজলুল হক হাউস। দেশমাতৃকার অমর সন্তান কৃষকবন্ধু, অসাধারণ বাগ্মী শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল ফজলুল হক হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট-বড় আটাশটি রুম, একটি কমনরুম ও সুবিশাল ডাইনিংহল।

হাউসপরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউসমাস্টার ও একজন হাউসটিউটর। এছাড়া তাঁদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০জন কর্মচারী। হাউসপরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের জন্য রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ'—এ সংস্কৃত শ্লোকে হাউসের ছাত্ররা মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় টানা তৃতীয়বারের মতো রেকর্ড সংখ্যক পয়েন্টের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং চ্যাম্পিয়নট্রফিটি হাউসে স্থায়িভাবে দিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া আন্তঃহাউস দেয়ালপত্রিকা ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রানারআপ এবং ভলিবল ও ইনডোর গেমস্ প্রতিযোগিতায় এ হাউস অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউসমাস্টার
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন

হাউসটিউটর
মুহাম্মদ ওমর ফারুক

হাউসএন্ডার
মোঃ খালিদ হাসান

হাউসপ্রিফেক্ট
আশিকুল হক

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি বিশেষায়িত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবাসিক ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠানের ছয়টি হাউসের মধ্যে নজরুল ইসলাম হাউস অন্যতম। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামানুসারে এ হাউসের সকল ছাত্র তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাঁর গুণাবলি নিজেদের মধ্যে বিকশিত করার স্বপ্ন দেখে। হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আছেন একজন হাউসমাস্টার ও একজন হাউসটিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০জন কর্মচারী। ছাত্রদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ও হাউসপরিচালনার সুবিধার্থে রয়েছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম সমন্বয় নজরুল ইসলাম হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদ্রোহী কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত এ হাউসের ছাত্ররা হাউসের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়ে থাকে।

ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিনমাফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। তাই এ হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে। ২০১৫ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানারআপ হয়।

উল্লেখ্য যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহিদ শেখ জামাল এ কলেজের ছাত্র থাকাকালে নজরুল ইসলাম হাউসে আবাসিক ছাত্র হিসেবে বসবাস করেন এবং এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ২০১০ সালে কলেজের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নেহভাজন ছোট ভাইয়ের স্মৃতিবিজড়িত এ হাউস পরিদর্শনে আসেন এবং হাউসের চমৎকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন।

লালন শাহ হাউস

হাউসমাস্টার
মোহাম্মদ নূরুন্নবী

হাউসটিউটর
জি এম এনায়েত আলী

হাউসএন্ডার
মোঃ গোলাম সারওয়ার

হাউসপ্রিফেক্ট
আব্দুল্লাহ আল জাহিদ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে লালন শাহ হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের 'মেডিকেল সেন্টার' হিসেবে ব্যবহৃত হত। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি '৩ নম্বর হাউস' নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক লালন শাহ এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ হাউস'।

পূর্ব ও পশ্চিমে লম্বিত ও প্রকৃতিপরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। শিক্ষাভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত এ হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ২৯টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১১০জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষাসহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই অবস্থান করে এ হাউসে। ছাত্রদের বসবাসের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিসরুম, কমনরুম, ডাইনিংহল, কিচেনস্টোর ও স্টাফরুম। হাউসের ছাত্রদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা ও সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিয়োজিত আছেন ১জন হাউসমাস্টার ও ১জন হাউসটিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন ১জন স্টুয়ার্ড, ১জন ওয়ার্ডবয়, ১জন বাবুর্চি, ১জন সহকারী বাবুর্চি, ১জন ম্যাট, ২জন টেবিলবয়, ১জন মালি, ১জন দারোয়ান ও ১জন সুইপার। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন আছে গভীর হৃদ্যতা তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে হাউসের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক।

কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ গ্রেড অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস মঞ্চ প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বাগান প্রতিযোগিতা ও ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৫ তে এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

হাউসমাস্টার
মোঃ লোকমান হাকিম

হাউসটিউটর
মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা

হাউসটিউটর (বর্ধিত ভবন)
মোঃ খলিল মিয়া পাঠান

হাউসএন্ডার
ফারহানুর রহমান তন্ময়

হাউসপ্রিফেক্ট
ওমর ফারুক

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে ২০ মার্চ ২০০৮ সাল থেকে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। এ হাউসের আসনসংখ্যা ৮৮টি। দিবা শাখায় ভর্তিকৃত ছাত্রদের আবাসনচাহিদা অনুযায়ী হাউসের আসনসংখ্যা একেবারেই সীমিত হওয়ায় ০৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের বর্ধিতাংশ (যা পুরাতন ব্যাংকভবন নামে পরিচিত) চালু করা হয়। বর্ধিতাংশে আসনসংখ্যা ২৮টি। এ হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রয়েছেন ১জন হাউসমাস্টার ও ২জন হাউসটিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন ১জন স্টুয়ার্ড, ২জন ওয়ার্ডবয়, ১জন বাবুর্চি, ১জন সহকারী বাবুর্চি, ১জন ম্যাট, ২জন টেবিলবয়, ২জন দারোয়ান ও ২জন সুইপার। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

হাউসপরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে এ হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। হাউসের সামনে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলের বাগান ও একটি সুবিশাল মাঠ, পশ্চিমে একটি আমবাগান ও পেয়ারাবাগান, পূর্বে ফুলবাগান ও পেঁপেবাগান এবং পেছনে রয়েছে আরেকটি পেয়ারাবাগান। সবুজেঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায় ও শান্তির আশ্বাস মেলে। পাঁচতলা এ হাউসের বিভিন্ন তলায় রঙিন আলো হাউসের সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ মনোরম পরিবেশ ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বৃদ্ধি করে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ হাউসের ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের ভালোবাসা ও ভক্তির অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়ালপত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পরপর চারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস ব্যাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এবং ২০১৩ ও ২০১৫ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বর্তমানে একটি সুসংগঠিত ডিজিটাল অফিস দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে হাউসটি ।

টিচার্স
অফিসার্স
স্টাফস
কর্নার

শিক্ষা, সহশিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

সাবেরা সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

কলেজপরিচিতি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫২ একর জমির উপর 'রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ') প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬০ সালের ০৬ মে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরাসরি পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাভার অর্পণ করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিদ্যালয়টির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। ১৯৬৭ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সচিবকে পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করে। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষাসম্প্রসারণ নীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে এ প্রতিষ্ঠানে 'দ্বিতীয় শিফট' চালু করা হয়। বর্তমানে উভয় শিফটে তৃতীয় হতে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনে প্রায় ৫০০০ জন ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে।

যুগোপযোগী শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির সুষম বিকাশ সাধন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর কর্মজীবন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিচে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজের শিক্ষা ও সহশিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হল :

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শতকরা প্রায় একশত ভাগ পাশ করে থাকে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডবৃত্তি পেয়ে থাকে। নিচে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হল :

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল-২০১৫

পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	পাশের হার
পিইসি	২৮৫	২৮৫	২৮২	১০০%
জেএসসি	৩৯৮	৩৯৮	৩৪৮	১০০%
এসএসসি	৫১৭	৫১৪	৩৮৫	৯৯.৪২%
এইচএসসি	৮৫২	৮৪৯	৪৬৪	৯৯.৬৫%

সহশিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য-২০১৫

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা বছরব্যাপী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায়ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে থাকে। নিচে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের অর্জিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হল :

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত **সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৫ প্রতিযোগিতার থানা পর্যায়ে ০৮ জন ছাত্র এবং মহানগর পর্যায়ে ০২ জন ছাত্র বিজয়ী।**
- ২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দো ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত **KUKKIWON Cup Taekwondo Champion-2015 প্রতিযোগিতায় ০৩টি গোল্ড মেডেল, ০২টি সিলভার মেডেল ও ০২টি ব্রোঞ্জ** মেডেল লাভ করে **চ্যাম্পিয়ন।**
- ২২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত Science Society and Society of Petroleum Engineers বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত **International Earth day Celebration প্রতিযোগিতায় Earth Olympiad এ চ্যাম্পিয়ন।**
- ৩০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল কর্তৃক আয়োজিত সপ্তম স্বাধীনতা দিবস **আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন।**
- ২৬ থেকে ২৮ মে ২০১৫ তারিখে ঢাকা কলেজে অনুষ্ঠিত 5th DCSC National Science Expositional কর্তৃক আয়োজিত **IQ Test-এ প্রথম এবং কুইজে জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন।**
- ২৯ মে ২০১৫ তারিখে বুয়েটে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের ICT division কর্তৃক আয়োজিত **জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় কুইজে সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন।**
- ৩০ ও ৩১ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়েস্টার্ন কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় **গণিত অলিম্পিয়াডে প্রথম ও দ্বিতীয় এবং জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান।**
- ১১ ও ১২ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত **কোরিয়া অ্যাম্বাসেডর কাপ তায়কোয়ান্দো চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন।**
- ২৪ থেকে ২৬ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ভিকারুননিসা নুন কলেজ কর্তৃক আয়োজিত Language Festival-এ **কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন।**
- ০৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত North South University কর্তৃক আয়োজিত **Earth Olympiad প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন।**
- ০৬ থেকে ০৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ভিকারুননিসা নূন কলেজ কর্তৃক আয়োজিত Pran Frooto Science Festival-2015 এ **কুইজে স্কুল পর্যায়ে রানারআপ ও কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন, সুডুকু-তে রানারআপ, ম্যাথ ও কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন।**
- ০৬ থেকে ০৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কর্তৃক আয়োজিত **প্রথম আলো-আরডিএস ষষ্ঠ জাতীয় বিতর্ক উৎসব-২০১৫ এ কলেজ পর্যায়ে রানারআপ ও শিশু পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন।**
- ০৫ জুন থেকে ১৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত United International University কর্তৃক আয়োজিত 8th UIU National Debate Championship-2015 এ **আন্তঃকলেজ বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন।**
- ০১ আগস্ট ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতি আয়োজিত ৪৪তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলা-২০১৫ প্রতিযোগিতায় **ফুটবলে থানা, ঢাকা মহানগরী ও ঢাকা অঞ্চল পর্যায়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন, হ্যান্ডবলে থানা ও ঢাকা মহানগরী পর্যায়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন এবং সাঁতারে ঢাকা মহানগরী পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন।**
- ২৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত IUT কর্তৃক আয়োজিত **বিজ্ঞান উৎসবে সাধারণ জ্ঞান ও প্রজেক্ট ডিসপ্লেতে চ্যাম্পিয়ন।**
- ০৮ ও ০৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হলিক্রস কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় **কুইজে চ্যাম্পিয়ন, Physics, Math ও IT অলিম্পিয়াডে প্রথম এবং প্রজেক্ট ডিসপ্লে ও রুবিক্স কিউব এ রানারআপ।**
- ১৩ ও ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় ইয়াং ইন্টার স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত **Physics, Chemisty, Biology, Math, Ecology, Sports Quiz, Scerapbook (Senior), Brain Games, Art, Culture & Literature Quiz অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন, Wall Magazine ও সাধারণ জ্ঞান (জুনিয়র) এ চ্যাম্পিয়ন, সাধারণ জ্ঞান (সিনিয়র) এ রানারআপ এবং The Search (Senior) এ চ্যাম্পিয়ন।**
- ১৭ ও ১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় **Chemisty, Sudoku, Math ও IT অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন।**

- ১২ ও ১৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত Bangladesh University of Professionals (BUP) কর্তৃক আয়োজিত Science & Literature Festival এ **কুইজে চ্যাম্পিয়ন, বাংলা ও ইংরেজি অলিম্পিয়াডে প্রথম এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রানারআপ**।
- ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত National Earth Olympiad কর্তৃক আয়োজিত **অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন**।
- ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিটি ব্যাংক ও প্রথম আলো কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান জয়োৎসবে **Project display-তে সারাদেশের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন**।

কলেজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড-২০১৫

শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন

- কলেজের ওয়েবসাইট এর আধুনিকায়ন এবং এর মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট SMS প্রেরণ, ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং অভ্যন্তরীণ সকল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।
- কলেজের প্রশাসনভবন, শিক্ষাভবন, কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষকমিলনায়তন, হাউস ও শিক্ষকদের আবাসিক কোয়ার্টারসমূহে ফাইবার অপটিক্যাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
- কলেজের ২৫জন শিক্ষককে নায়েমে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট এর প্রশিক্ষক দ্বারা কলেজের ৬০জন শিক্ষক এবং ৬০জন ছাত্রকে ইংলিশ স্পোকেন কোর্স সম্পন্ন করানোর ব্যবস্থাকরণ।
- কলেজের প্রভাতি ও দিবা শাখার ছাত্রদের পৃথক ক্লাসটেস্ট গ্রহণের প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন করে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ও অভিন্ন রুটিনে একত্রে ক্লাসটেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।
- সাময়িক, বার্ষিক, প্রাকনির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষায় প্রচলিত ০১ সেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে ০৪ সেট প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।
- শক্ষকবৃন্দের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, অনলাইনের মাধ্যমে কলেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি ও রেজাল্ট প্রসেসিং এবং নায়েমে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের সাথে সকল শিক্ষকের অভিজ্ঞতাবিনিময় বিষয়ক ০২ দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন।

প্রশাসন ও অবকাঠামো সংক্রান্ত উন্নয়ন

- কলেজের বটমূলপ্রাঙ্গণের মানোন্নয়ন এবং বটমূলমঞ্চের চারপাশে বাংলাদেশের লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনের ম্যুরাল ও খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের বাণী স্থাপন।
- শিক্ষাভবন-১ হতে শিক্ষাভবন-৩ পর্যন্ত নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন।
- কলেজের পুকুরসংস্কার ও খননকার্য সম্পাদন এবং মাছের পোনা অবমুক্তকরণ।
- ফজলুল হক হাউসের সংস্কার ও রংকরণ।
- প্রশাসনভবনের বৈদ্যুতিক লাইনের চেইঞ্জওভার স্থাপন।
- শিক্ষাভবন-১, ২ ও ৩ এ লুকিংগ্লাস স্থাপন এবং শিক্ষাভবন-১ এর বাথরুমসমূহ সংস্কারকরণ।
- কলেজের অডিটোরিয়ামের সাউন্ড সিস্টেমের জন্য টুলবক্স ও অনারবোর্ড তৈরিকরণ।
- লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের বসবাসের কক্ষ সংস্কারকরণ এবং সকল বৈদ্যুতিক সুইচবোর্ড পুনঃস্থাপন।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের জন্য ০৪টি ডাইনিং টেবিল ও ০৮টি বেঞ্চ ক্রয়করণ।
- বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দো ফেডারেশন এর সহায়তায় শারীরিক শিক্ষা বিভাগের স্টোর ও খেলাঘর এর শেড স্থাপন।
- কলেজের অডিটোরিয়ামের ছাদের সংস্কার কাজ সম্পন্নকরণ।
- অডিটোরিয়াম ও শিক্ষাভবন-৩ এ বৈদ্যুতিক ডুয়েল সোর্স এর সংযোগ প্রদান।
- কলেজের কেন্দ্রীয় মসজিদের বাইরে নামাজের স্থান টাইলসকরণ, অজুখানা ও বাথরুম পৃথক করত আধুনিকায়নকরণ এবং মসজিদের দুপাশে দুটি মানসম্মত নতুন গেইট নির্মাণ।
- কলেজ লাইব্রেরির জন্য স্টোররুম সংস্কারকরণ এবং বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, কলেজবার্ষিকী, বিজ্ঞানস্যুভেনির, Time ও Reader's Digest সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বাঁধাইকরণ।
- প্রশাসনভবনে অধ্যক্ষের পূর্বের অফিসকক্ষকে কনফারেন্সরুমে রূপান্তর করত অধ্যক্ষের নতুন অফিসকক্ষ সজ্জিতকরণ।
- প্রশাসনভবনে উপাধ্যক্ষেরবৃন্দের অফিসকক্ষে এসি স্থাপন ও ওয়াশরুম তৈরিকরণ।

বাবার মুখে শোনা মায়ের গল্প

ফেরদৌস আরা বেগম
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা

আমার মা থাকতেন দাদা-দাদির কাছে গ্রামের বাড়িতে। বাবা শহরে চাকুরি করতেন। আমাদের বয়স পাঁচ বৎসর হলেই বাবা আমাদেরকে তাঁর শহরের বাসায় নিয়ে আসতেন। শুরু হত অক্ষরপরিচয়, ভর্তি করিয়ে দিতেন পাড়ার খাদেমুল ইসলাম ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে শিশুশ্রেণিতে। বাবার ছিল ১০টা-৫টা অফিস। অফিসের বাইরের সময়টায় তিনিই আমাদের বাবা, তিনিই আমাদের মা। ছুটির দিনে বা যেকোনো অবসরে বাবা আমাদেরকে নিয়ে গল্পের আসর বসাতেন। বাবা সবচেয়ে পছন্দ করতেন মাতৃস্নেহের গল্প বলতে। তাঁর মুখে শোনা কয়েকটি গল্প...

গল্প–এক

ছেলেদের স্কুলের সামনে মায়েরা ভিড় করেছেন। টিফিনবিরতিতে বাচ্চারা বের হলে বাচ্চাদেরকে খাবার দেবেন। এক মায়ের খুব তাড়া। তিনি আরেক মাকে বললেন– "আপনি কি কষ্ট করে আমার ছেলেকে এই খাবার দেবেন? আমার একটা জরুরি কাজে চলে যেতে হচ্ছে।" দ্বিতীয় মা বললেন– "আপনার বাচ্চাকে তো আমি দেখি নি কখনো। কেমন করে তাকে চিনে নেব?" প্রথম মা বললেন– "কোনো সমস্যা নেই। সারা স্কুলে আমার ছেলের মতো সুন্দর বাচ্চা একটাও নেই। যে বাচ্চাটাকে আপনার সবচেয়ে সুন্দর মনে হবে, তাকেই খাবারটা দেবেন।" দ্বিতীয় মা বললেন– 'আচ্ছা'। পরদিন টিফিনবিরতিতে আবার দুমায়ের দেখা। প্রথম মা বললেন– "আপনি তো আচ্ছা মানুষ! আমার বাচ্চার খাবারটা তাকে দিলেন না।" দ্বিতীয় মা বললেন– "আমি খুব মনোযোগ দিয়ে সব বাচ্চাকে দেখলাম। তো আমার মনে হল এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বাচ্চা আমার জনি। কী আর করা? খাবারটা ওকেই দিলাম।"

গল্প–দুই

এক তরুণ এক মেয়েকে খুব ভালোবাসে। দেখলেই প্রেম নিবেদন করে। মেয়েটা ওকে পাত্তাই দেয় না। ছেলেটা বলে– "তুমি আমার কাছে যা চাও তা-ই দিব, এমনকি তোমার জন্য আমি প্রাণও দিতে পারি। আমাকে দয়া কর।" একদিন খুব বিরক্ত হয়ে মেয়েটা ওকে বলল– "তুমি কি তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ডটা এনে আমাকে দিতে পারো? তাহলে আমি তোমাকে ভালোবাসার কথা ভাবতে পারি।" প্রেমে অন্ধ ছেলে মাকে খুন করে তাঁর হৃৎপিণ্ড নিয়ে মেয়েটার বাড়ির দিকে পাগলের মতো দৌড়াতে লাগল। পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মায়ের হৃৎপিণ্ড বলে উঠল– "আহা! বাছারে আমার, ব্যথা পেলি?" ছেলে উঠে দৌড়াতে লাগল। মেয়েটার সামনে গিয়ে দুহাতে বাড়িয়ে ধরল মায়ের হৃৎপিণ্ড। বলল– "এই নাও আমার মায়ের হৃৎপিণ্ড, এখন সাড়া দাও আমার প্রেমে।" মেয়েটি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল– "হায় খোদা! তুমি কি মানুষ, না জানোয়ার? নরকের শয়তান তুমি, যাও এখান থেকে।" দুহাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে দৌড়ে পালাল মেয়েটা। মায়ের হৃৎপিণ্ড বুকে চেপে ধরে হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল ছেলেটা। হাহাকার করে উঠল– "মা, মাগো, এ আমি কী করলাম।" শুনল, মায়ের হৃৎপিণ্ড বলছে– "ভেঙ্গে পড়িস না বাছা। শক্ত হয়ে দাঁড়া। আমার আশীর্বাদ তোর জন্য।"

গল্প–তিন

হিমালয়চূড়ায় শিব-পার্বতীর সুখের সংসার। তাঁদের দুই ছেলে কার্তিক আর গণেশ। দুই মেয়ে লক্ষ্মী আর সরস্বতী। কার্তিক দেখতে খুব সুন্দর। হিন্দু মেয়েরা কার্তিকের মতো বরপ্রার্থনা করে। তাঁর বাহন ময়ূর। সেও খুব সুন্দর। এই নিয়ে কার্তিকের খুব অহংকার। গণেশ দেখতে বেঢপ আকৃতির। তার মুখ-মাথা দেখতে হাতির মতো। শরীরটা মানুষের মতো। পেটটা কেমন মোটা-উঁচু। ভাইয়ের প্রতি কার্তিকের খুবই অবজ্ঞার ভাব। মা পার্বতীর মনে খুব কষ্ট। তাঁর কাছে দুছেলেই খুব সুন্দর। ভাইয়ের প্রতি কার্তিকের এ অবহেলা তাঁকে খুব বিঁধে। দুজনের মধ্যে গণেশ বড়। সে ভাইয়ের এ অবজ্ঞা বোঝে। কিন্তু কিছু মনে করে না। ভাবে– থাক, ও ছোট। একদিন মা

পার্বতী দুই ছেলেকে ডাকেন। সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন– "আজ তোমাদের দুভাইয়ের একটা প্রতিযোগিতা– দুজন এখান থেকে যাত্রা করবে, দেখি কে আগে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আমার কাছে আসতে পারে?" গণেশ বলার চেষ্টা করে– "এর দরকার কি মা? দুভাইয়ের মধ্যে...।" কার্তিক ওকে থামিয়ে দেয়– "দরকার আছে দাদা।" মনে মনে বলে, আজ দাদা খুব জব্দ হবে। মায়েরও একটা শিক্ষা হবে। বিচ্ছিরি দেখতে দাদার প্রতি মায়ের ভারি পক্ষপাত। সুযোগ পেলেই তার গুণকীর্তন করেন। আজ বুঝবেন মা। বিশ্রী, বেঢপ দেহ আর ক্ষুদ্র, নীচ প্রাণী ইঁদুর যার বাহন, সে কখনো কোনো কিছুতে কার্তিককে পরাজিত করতে পারবে না। একবারও পিছনে না ফিরে দ্রুতগতি বাহন ময়ূরকে নিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে কার্তিক।

সারা পৃথিবী ঘুরে মায়ের কাছাকাছি এসে কার্তিক তাকিয়ে দেখে গণেশ বসে আছে মায়ের কাছে। সে বিস্মিত! এ কেমন হল? দাদা আগে চলে এল! না, এ অসম্ভব! এদিকে কার্তিককে দেখে মায়ের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে কার্তিকের দিকে এগিয়ে যায় গণেশ। মাকে বলে– "মা, মাগো, তোমার বিজয়ী পুত্র কার্তিককে বরণ করে নাও।" আর কার্তিককে লক্ষ করে বলে– "ভাই কার্তিক, তুমি আমার প্রাণের ভাই। তোমাকে হারিয়ে বিজয়ী হবার চেষ্টা করতেই আমার মনে বাধে। সকল ক্ষেত্রে তোমার সাফল্য আর জয়েই তো আমার আনন্দ। পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে হলে তোমার কাছে জয়ী হবার জন্য পৃথিবী ঘুরতে বের হব কেন? মা যে আমার জগৎজননী। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও মা আমার কাছে বড়। পৃথিবী ঘুরতে হলে মায়ের চরণ স্পর্শ করে বিদায় নিয়ে দেখতে-দেখতে, জানতে-জানতে, বুঝতে-বুঝতে, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ করতে-করতে অনেক দিনে পৃথিবী ঘুরে আসব। এসে বাবা-মা, ভাই-বোনদের কাছে বসে গল্প করব– কী দেখলাম, কী বুঝলাম, কী শিখলাম?" কার্তিকের মাথা নত হয়ে আসে। তিনি উপলব্ধি করেন– যথার্থই জ্ঞানে, বিবেচনায় দাদা তাঁর চেয়ে বড়। মা এবং দাদাকে তিনি ভুল বুঝেছেন। মা পার্বতী দুপাশ থেকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন দুই ছেলেকে। দুজনই তাঁর সমান ভালোবাসার ধন। দুজনই তাঁর কাছে অনিন্দ্যসুন্দর।

গল্প–চার

এক রাজা। নাম তাঁর ভুবনেশ্বর। তাঁর রাজ্যের নাম স্বপনপুর। রাজা খুব হিতৈষী। এই নিয়ে তাঁর মনেও আছে একটু গর্ব। একদিন রাজা স্বপ্নে দেখেন জল-বৃষ্টি-মেঘের দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র স্বপ্নে এসে তাঁকে বলছেন– "তুমি কেমন রাজা হে? তোমার রাজ্যে কোনো বড় জলাশয় নেই।" পরদিনই হুকুম দিলেন রাজা– "রাজ্যের মাঝখানে কাটা হোক মস্ত বড় দিঘি। সেই দিঘির নাম হবে ভুবন সাগর। তার চারপাশ ঘিরে শানবাঁধানো ১২টা ঘাট হবে। রাজ্যের ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেরই সমান অধিকার থাকবে সে দিঘির জলে।" রাজার হুকুম বলে কথা। অল্পদিনেই মস্ত বড় গভীর দিঘি কাটা হল। চারপাশে বানানো হল শানবাঁধানো ১২টা ঘাট। এক-একটা ঘাটে ৪০টি করে সিঁড়ি। প্রতি ঘাটের দুপাশে লাগানো হল বকুল ফুলের চারা। দিঘির চারপাশ ঘিরে লাগানো হল ছায়াতরুর চারা। এত গভীর দিঘি! কিন্তু কই, পাতালপুর থেকে তো জল ওঠে না। রাজা ভাবেন, মন্ত্রী ভাবেন, রাজপুরোহিত ভাবেন। ঘটা করে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা হল জল প্রার্থনা করে। কোনো লাভ হল না।

আবার স্বপ্ন দেখলেন রাজা। ইন্দ্রদেব এসে তাঁকে বলছেন– "ওহে বোকা রাজা, দুধ ঢেলে দাও দিঘিতে।" পরদিন ঘোষণা দিলেন রাজা। রাজ্যের সবাই কাল সকালে নিজ নিজ গাভীর দুধ এনে ঢেলে দিতে লাগল দিঘিতে। কিন্তু কী আশ্চর্য! সব দুধ শুষে নিল দিঘির মাটি। একফোঁটা জলও উঠল না। দুপুর হয়ে এল প্রায়। সারা রাজ্যের লোক চারপাশে ভিড় করছে। একপাশে রাজা, মন্ত্রী আর যত সভাসদ। রাজা মহাভাবনায় পড়লেন। রাজপুরোহিত তো ভোর থেকেই বসে আছেন ইন্দ্রমূর্তির সামনে পূজায়। সূর্য মাথার উপরে। এমন সময় দূরে দেখা গেল সোনার মতো একটা ছোট্ট বিন্দু। বিন্দুটা এগিয়ে আসতে আসতে দেখা গেল এক বুড়ি, পুরানো মলিন কাপড় তার পরনে। তার বাম হাতে ঝকঝকে মাজা পিতলের ছোট্ট ঘটি। ডান হাতে কলাপাতা দিয়ে সে ঢেকে রেখেছে ঘটি। নানা দিক থেকে ঠাট্টা-মস্করা ভেসে এল। অবজ্ঞার হাসি হাসল কতজন। বুড়ির কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এক পা এক পা করে পূর্বের শানবাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে। কলাপাতাসহ ডান হাতটা সরিয়ে তার ছোট্ট ঘটি কাত করে ঘটির দুধটুকু ঢেলে দিল দিঘির তলায়। কী আশ্চর্য! কলকল খলখল করে দিঘির তলা থেকে উঠতে লাগল পানি। উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা– "জয়, বুড়ি মায়ের জয়। জয়, ভুবন সাগরের জয়। জয় রাজা ভুবনেশ্বরের জয়। জয়, ইন্দ্রদেবের জয়।" বুড়ি নির্বিকার। বাড়ির পথ ধরেছে সে। রাজমন্ত্রী এসে বললেন– "বুড়ি মা, তুমি একটু রাজা মশাইয়ের কাছে চল। তিনি তোমার সাথে কথা বলবেন।" বুড়ি কাঁচুমাচু করে। সে দরিদ্র বুড়ি, রাজার সামনে যাওয়া! বলে– "বাড়িতে আমার অনেক কাজ রেখে এসেছি। আমায় ছেড়ে দাও বাছা।" মন্ত্রী শুনলেন না। জোর করে তাকে নিয়ে গেলেন রাজার সামনে। রাজা তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। সম্মানের সাথে বসালেন নিজের পাশে। বললেন– "বুড়ি মা, সারা রাজ্য তোমার কাছে ঋণী। কী মন্ত্রে তোমার ঐটুকু ঘটির দুধে এমন যাদুর জলে ভরে উঠল দিঘি।" বুড়ি বলল– "কোনো মন্ত্র তো নেই বাছা। আমি গরিব মানুষ। ঘরে দুটো হালের বলদ আর একটা মাত্র গাভী। সের তিনেক দুধ পাই। তার এক সের বিক্রি করে জমানো টাকায় আমার বুড়োর আর বাচ্চা-কাচ্চাগুলোর ঔষধ কিনতে হয়। তিনটি জোয়ান ছেলে আমার, সারাদিন খাটে, ওদের এক গ্লাস দুধ খেতে দেই। বড় ছেলের ঘরে নাতি, একটার বয়স চার, আরেকটার ছয়। ওদের দুগ্লাস দুধ খেতে দেই।

মেজ বৌটার কচি বাচ্চা, মায়ের দুধ খায়। ছোট বউটা আবার পোয়াতি, ওদের দুজনকে দুগ্লাস দুধ খেতে দেই। বুড়ো আবার দুধ-ভাত খাবেই। তার জন্যও একটু দুধ রাখতে হয়। বড় বউটাও তো দিন-রাত খাটাখাটুনি করে। ওকেও জোর করে একটু দুধ খাওয়াই। আমি যদি একটু দুধ না খাই ছেলে-বৌগুলো বড় রাগ করে। আহ্ কী করলুম, জানো? সবার ভাগের দুধ রেখে চুপি চুপি আমার ভাগের দুধটুকু নিয়ে এসে তোমার দিঘিতে ঢেলে দিলুম। কোনো মন্ত্র পড়ে তো দুধ ঢেলে দেই নি বাছা।"

রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বড় লজ্জিত হলেন। তাঁর হুকুমে আজ কত শিশু না-জানি দুধ না খেয়ে আছে। না-জানি কত রোগী, কত প্রবীণ দুধ না খেয়ে থাকবেন। যার যা প্রাপ্য তা না দিয়ে কেড়ে নিয়ে দেবতারে দিলে দেবতা তুষ্ট হন না, বরং রুষ্ট হন। ভুল পথে কোনো বড় কাজ, কোনো মহৎ কাজও করা যায় না। তিনি বুড়িকে বললেন– "বুড়ি মা, তুমি আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে দিলে। তোমার জন্যই রাজ্যের জলকষ্ট দূর হচ্ছে। তুমি আমার কাছে কিছু চাও, তোমার সব চাওয়া আমি পূর্ণ করব।" বুড়ি বলে– "আমার কিছু দরকার নেই গো রাজা। ছেলে-পুলে, নাতি-পুতি আর আমার বুড়োকে নিয়ে আমি বড় ভালো আছি গো।" রাজা তাকে কিছু দেবেনই। কী বিপদ! কিছু না চাইলে তাকে যে এরা বাড়ি যেতে দিচ্ছে না! শেষে বুড়ি বলল– "আচ্ছা গো রাজা, এবার কোজাগরী লক্ষীপুজোর দিন তোমার রাজ্যে মাঝরাতে শুধু আমার বাড়িতে প্রদীপ জ্বলবে; আর কারও বাড়িতে জ্বলবে না। তুমি কি এমন ব্যবস্থা করতে পারবে?" রাজা বললেন– "তাই হবে।" বুড়ি চলে গেল বাড়ি।

রাজা, মন্ত্রী, রাজপুরোহিত, রাজ্যের সাধারণ লোকজন ভারি বিস্মিত। কী বোকা বুড়ি! কত কি চাইতে পারত! তার জীর্ণ দরিদ্র কুটির আলো ঝলমলে প্রাসাদ হতে পারত, চাইতে পারত জমিদারি। তার বাড়ির কাছের গৃহস্থটিও ভাবে– কী বোকা! কী বোকা! যাই হোক, কোজাগরী লক্ষীপূর্ণিমার মধ্যরাতে মা লক্ষী তাঁর বাহন পেঁচাকে নিয়ে বের হলেন পৃথিবী ভ্রমণে। নিজের আশীর্বাদে আর আনুকূল্যে বসুন্ধরা ধন-ধান্যে-পুষ্পে পূর্ণ করবেন। প্রথমেই চোখে পড়ল– তাঁর এক রাজ্যে একটি ছোট্ট কুটিরে কেবল প্রদীপ জ্বলছে। আর সব অন্ধকার। এমনকি রাজবাড়িও অন্ধকার। তাঁর খুব কৌতূহল হল। অন্তরীক্ষ থেকে তিনি সোজা নেমে এলেন সেই কুটিরে। গ্রামের বধূর বেশে দাঁড়ালেন দরজায়। মৃদু ধাক্কা দিলেন বাঁশের বেড়ার মতো দরজাটিতে। বুড়ি মা বেরিয়ে এলেন, হাতে তাঁর মাটির কলস। বললেন– "কার ঘরের বউ গো তুমি, কার ঘরের ঝি? তুমি তো মা দেখছি সাক্ষাৎ লক্ষী। আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত তুমি মা আমার ঘর-সংসার সন্তান-সন্ততি দেখে-শুনে রেখো। আমি না-আসা পর্যন্ত যেও না কিন্তু।" মা লক্ষী ভাবলেন– আচ্ছা, ঠিক আছে। বেচারির খাবার জল ফুরিয়ে গেছে মনে হয়। জল নিয়ে ফিরে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে? কিন্তু বুড়ি মা সেই যে গেল আর ফিরল না। রাত গিয়ে সকাল হল। ছেলে, বউরা কত খোঁজাখুঁজি করল।

ভুবন সাগর দিঘি এখন কানায় কানায় ভরা। রাজ্যের লোকের আর জলকষ্ট নেই। দলে দলে লোক আসে, ঘাটে ঘাটে কলরব। আজ সকালে এসেই তারা দেখে– দিঘিতে ভেসে উঠেছে সবুজ শাড়িপরা বুড়ি মা। কলসির সাথে মা নিয়ে এসেছিলেন এক টুকরো দড়ি। মা লক্ষীকে ঘর-সংসার, সন্তান-সন্ততির কল্যাণের জন্য অধিষ্ঠাত্রী রেখে বিসর্জন দিলেন নিজের প্রাণ। মায়ের কাছে যে তাঁর নিজের প্রাণ তেমন মূল্যবান কিছু নয়।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স) এর দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন— আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? রাসুলুল্লাহ (স) বললেন— তোমার মা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন— তারপর কে? রাসুলুল্লাহ (স) বললেন— তারপরও তোমার মা। ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করেন— তারপর কে? রাসুলুল্লাহ (স) এবারও বললেন— তোমার মা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন— তারপর? রাসুলুল্লাহ (স) বললেন— তারপর তোমার পিতা। (বোখারি)

একদিন স্বপ্নের দিন

জেহিন বেগম
সহযোগী অধ্যাপক ও
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হবে ২০১০ সালের ২৩ ডিসেম্বর। চারদিকে সাজ সাজ রব। বিশেষ করে আমরা যারা হাউসের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের নাভিশ্বাস। অনুষ্ঠানের একমাস আগে থেকেই প্রতিদিন ভোরে ফজরের নামাজ পড়েই হাউসের ছাত্রদের নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে হয়। নির্বাচিত হাউসকন্টিনজেন্ট কুচকাওয়াজ করে। ছোটরা মাঠের চোরকাঁটা বাছে। একটু বড়রা হাউসের সামনের ঘাসপাতা বাছে। কর্মচারীরা যন্ত্র দিয়ে ঘাস কাটে। সকল হাউসের হাউসমাস্টার, হাউসটিউটর উপস্থিত। ক্রীড়া ডিপার্টমেন্ট উপস্থিত। অধ্যক্ষ অনবরত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তদারক করছেন। আমি জয়নুল আবেদিন হাউসের এবং রানী নাছরীন কুদরত-ই-খুদা হাউসের হাউসমাস্টার। আমরা দুজন তেমাথার আইল্যান্ডে উঠে ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ দেখি– কার হাত মিলছে না, কার পদক্ষেপ দৃঢ় হচ্ছে না ইত্যাদি। ইনস্ট্রাকশন দেই পাশ দিয়ে যাবার সময়। দিন এগিয়ে আসে। উৎসাহের আতিশয্যে একদিন ছাত্র-কর্মচারীদের নিয়ে হোসপাইপ দিয়ে লাল ইটের দালানটা ধুয়ে ফেললাম। সামনের ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাউসটিউটর জাহেদুল হকের অর্থায়নে সেটি নির্মিত হল হাউসকালার হলুদ রঙের টাইলস দিয়ে। আমি তার নাম রাখলাম 'নীলাভস্পর্শী'। অনুষ্ঠানের দিন পতপত করে উড়বে হাউসপতাকা।

দেখতে দেখতে নির্ধারিত দিনটি এসে গেল। দুপুরে লাঞ্চের পর ছাত্ররা কলেজইউনিফর্ম পরে মাঠে নামল। কী কারণে যেন হাউসএন্ডার রাইসুল ইসলাম অভিমান করে বসলেন। সম্মানসূচক দস্তানা সোর্ড-স্যাশ সব ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি হাউসের নেতৃত্ব দেবেন না। এক্ষেত্রে বকাঝকায় কাজ হবে না। টিন এজ। বাবা-চাচা বলে পিঠে হাত বুলিয়ে বহু কষ্টে তাকে মাঠে নামালাম। এবার নিজের পালা। কোরা জমিনের ওপর লাল-কালো জামদানি পরে বের হবার মুখে দেখি বাগানের পথে আমার বাসার যে খিড়কি দরোজা সেখানে সুবেশধারী মহিলাদের ভিড়। ব্যাপার হল– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসছেন, তাই নিরাপত্তা কড়াকড়ি।

ব্যাগ-পার্স-ওয়ালেট-ক্যামেরা-মোবাইল কিচ্ছু সঙ্গে নেয়া যাবে না। প্যান্ডেলের সবচেয়ে কাছে আমার বাসা বলে অভ্যাগতরা এখানেই শরণ নিয়েছেন। হুইল চেয়ারে বসা আমার মায়ের সামনে বিছানার ওপর স্তূপীকৃত হল জিনিসগুলো; আর অনুরোধ– খালাম্মা, একটু দেখবেন। শুধু নিমন্ত্রণপত্রখানা হাতে নিয়ে মেটাল ডিটেক্টরের ভেতর দিয়ে অভ্যাগতরা ঢুকলেন অনুষ্ঠানস্থলে। এ উৎসবের মূল উদ্যোক্তা ওল্ড রেমিয়েন্স। তাই উৎসবের দিন যেন তাদেরই একটু কর্তৃত্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সন্ধ্যেবেলার প্রদীপ জ্বালানোর আগে সকালবেলার সলতে পাকানোর' যে নীরব ইতিহাস তা বোধকরি নেপথ্যেই রয়ে গেল। হঠাৎ যেন একটু ছন্দপতন। একমাস ধরে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তৈরি করা নবীন ঘোষকের হাত থেকে মাইক্রোফোন চলে গেল প্রাক্তন তুখোড় ধারাবর্ণকের হাতে। কিন্তু প্র্যাকটিস বলে তো একটা কথা আছে। পদে পদে তিনি আটকে যেতে থাকলেন কুচকাওয়াজরত ছাত্রদের নাম উচ্চারণে। বহুযত্নে চয়ন করা হাউসগুলোর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক কবিতার পংক্তিগুলো যথাযথ আবেগে উচ্চারিত হল না তাঁর কণ্ঠে।

যাই হোক, একসময় শেষ হল বহুপ্রতীক্ষিত সেই উৎসব। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আগত দুই প্রাক্তন সহকর্মী দিলারা আপা, মাহবুবা পান্না আর আত্মীয় এক অভিভাবক দম্পতি অনুষ্ঠানশেষে আমার বাসায় এলেন। তাঁদের নামাজ এবং চায়ের ব্যবস্থার ফাঁকে ফাঁকে হাউসেও দু মারছি সব ছাত্র ঠিকমতো ফিরছে কি-না দেখতে। হঠাৎ দেখি মাঝবয়সী জনাসাতেক মানুষ হাউসের আঙিনায়। সবিনয় প্রশ্ন– "আপনিই কি হাউসমাস্টার?" 'হ্যাঁ' বলতেই হাতের খাবারের বাক্সটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন– "আমি কি আপনাকে টিচার বলে ডাকতে পারি?" এবং সঙ্গে সঙ্গে 'বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। মুহূর্তে সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল'। মনে হতে লাগল– এই পূর্ণবয়স্ক মানুষগুলো যেন আমার ছাত্র। আমার হাউসের এক-একজন শিশু বোর্ডার।

সেই ক্ষুদ্র জনতার মধ্যে কুদরতেরও কয়েকজন ছিলেন। শুরু হয়ে গেল নিজ নিজ হাউসের গুণকীর্তন আর ঝগড়া– "টিচার, উই আর গ্রেট। বিকজ দিস হাউস ইজ অলওয়েজ গ্রেট।" অপরপক্ষও তখন থেমে নেই। শুধু হাতাহাতিটাই বাকি। আমার তখন ইরশাদ আহমেদ শাহীন স্যারের সেই কাহিনি মনে পড়ল। কুদরত-জয়নুল দুই হাউসে তুমুল প্রতিযোগিতা চিরকাল। এমনকি হাউসের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকে যে কুকুর-বেড়াল, তাদের মালিকানা নিয়েও প্রতিযোগিতা। একটি নাদুস-নুদুস তৈলচিক্কণ কুকুরের মালিকানা দাবি করে এক হাউস। অন্য হাউসের কুকুরটির চেহারা তেমন চকচকে নয়। কুছ পরোয়া নেহি। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে বাবার 'কারশাইনার'টা নিয়ে এল একজন। যে জিনিস গাড়ি চকচকে করতে পারে তা নিশ্চয় 'ডগি'র চেহারাও চকচকে করে তুলতে পারবে। তো সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা দিবসের আগের রাতে কুকুরটির গায়ে আচ্ছামতো মাখানো হল সেই শাইনার। তারপর বহু প্রতীক্ষার সকাল। দেখা গেল ঘেয়ো কুকুরের মতো শরীরের সব লোম ঝরে গেছে সেই 'ডগি'র।

ওল্ড জয়নুলদের মধ্যে প্রথমোক্ত ভদ্রলোক পেশায় আইনজীবী। বললেন– "টিচার, আমরা কি ডাইনিং এ বসে এককাপ চা খেতে পারব?" 'অবশ্যই' বলে তাঁদের ডাইনিং হলের দিকে যেতে দিয়ে বাবুর্চি নূর ইসলামকে ডেকে চা দিতে বললাম। সে বিরস বদনে স্যান্ডেল ফটফটিয়ে বাবুর্চিখানার দিকে চলল বেশি করে দুধ আর একগাদা চিনি দিয়ে ছাত্রদের প্রিয় সেই স্পেশ্যাল চা বানাতে।

আরেক ওল্ড রেমিয়েন শুধু এই উৎসবে যোগ দেবার জন্যই সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন। তাঁর মোবাইলের চার্জ শেষ, তাই আমার বাসায় সেটি চার্জ করতে দিয়ে এবং নিজের বালকপুত্রকে রেখে ক্যাম্পাস পরিভ্রমণে গেলেন। ছেলেকে ইংরেজিতে বললেন– ইনি উত্তরাধিকারসূত্রে আমার টিচার, সে হিসেবে তোমার গ্র্যান্ড মা। পুনরায় 'বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। মুহূর্তে সে পিতামহীর পদ অধিকার করিয়া বসিল'। প্রিয়দর্শন বালকটি কিছুই খেতে রাজি হয় না, শেষে খানিকটা চা আর কয়েকটা টোস্ট বিস্কুট দিয়ে বললাম– এগুলো খাবে? সে বিস্ফারিত চোখে প্লেটের ওপর সঞ্চরণশীল অদ্ভুতদর্শন বিস্কুটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তাকে আহারপ্রণালি শিখিয়ে দিলাম। খানিক বাদে দেখি সে দিব্যি চায়ে ভিজিয়ে টোস্ট বিস্কুট খাচ্ছে।

পুরোনো দিনের গন্ধভরা স্মৃতিজাগানিয়া ডাইনিং হলে বহুক্ষণ গল্পগুজব করে বুকভরে সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে ওল্ড রেমিয়েনরা চলে গেলে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি আর দুই হাতে পাঁচশত টাকার দুখানা নোট নিয়ে বাবুর্চি নূর ইসলামের আবির্ভাব– 'আফা, আঁরে বকশিশ দি গেছে'।

পরদিন দেখা গেল এতবড় কর্মযজ্ঞের এত মানুষের পদচারণার কোনো চিহ্নই যেন আর অবশিষ্ট নেই কোথাও। শুধু সুসজ্জিত বিশাল মাঠটার বসন-ভূষণ খুলে নেয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে।

জানি না একশত বৎসর পূর্তির সৌভাগ্য এ প্রতিষ্ঠানের হবে কি-না। হলেও যাত্রার সময় থেকে এ পর্যন্ত আসতে যে পরিবর্তন ঘটেছে, একশত বৎসর পূর্তিতে সেটুকুও অবশিষ্ট থাকবে কি-না! তবু প্রার্থনা করি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ যেন পরিবর্তনের স্রোতে পা না-ভাসায় কোনোদিন। কোনোদিন যেন তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি না দেয়।

ধ্বনিতত্ত্ব এবং বাংলা শব্দে ধ্বনির উচ্চারণ

মুহম্মদ হায়দার আলী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ভাষাকে আমরা সাধারণত দুভাবে ব্যবহার করে থাকি–মৌখিক ও লৈখিক। মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান ধ্বনি আর লৈখিক ভাষার ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান বর্ণ। বাংলাদেশে লৈখিক ভাষার শুদ্ধতার ব্যাপারে ইদানীং কিছুটা সচেতনতা লক্ষ করা গেলেও মৌখিক ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তেমন সচেতনতা লক্ষ করা যায় না। এদেশের স্কুল পর্যায়ে কোনো কোনো শ্রেণিতে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে 'ধ্বনিতত্ত্ব' পাঠ্যভুক্ত হলেও বাস্তবে এর ব্যবহারিক অনুশীলনের ব্যবস্থা নেই। তবে অনেক দেরিতে হলেও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির শুদ্ধ উচ্চারণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'বাংলা উচ্চারণের নিয়ম' নামে একটি অধ্যায় পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়টি পড়াতে গিয়ে এবং পরীক্ষার উত্তরপত্রে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ক উত্তর মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে বিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, আমার এ লেখার প্রেরণাউৎস সেখানেই।

ভাষার ক্ষুদ্রতম মৌলিক উপাদান ধ্বনি। ধ্বনিই ভাষার মূল ভিত্তি। ধ্বনি ছাড়া শব্দ তৈরি হয় না, আর শব্দ ছাড়া গঠিত হয় না বাক্য। ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের সমন্বিত রূপই হল ভাষা। ধ্বনির উচ্চারণবিধি না জানার জন্য কথা বলার সময় যেমন অনেকেরই উচ্চারণ ভুল হয়, তেমনি ভুল হয় শব্দের উচ্চারণ লিখে দেখানোর পদ্ধতি। এ দুধরনের ভুলের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি এ লেখায় বাংলা ধ্বনিসমূহের উচ্চারণের নিয়ম উল্লেখের পাশাপাশি উদাহরণ হিসেবে দৈনন্দিন কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দের উচ্চারণ ব্রাকেটে লিখে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশাকরি শিক্ষার্থীরা এ লেখা পড়ে বাংলা শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ ও লিখনের নিয়ম সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করতে পারবে।

ধ্বনি ও বর্ণ : মানুষের বাকপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়– স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। ধ্বনির প্রতীক বা চিহ্নকে বর্ণ বলে। ধ্বনি অদৃশ্য, আর বর্ণ দৃশ্যমান। স্বরধ্বনির চিহ্নকে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জধ্বনির চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। প্রত্যেক ধ্বনির জন্য একটি করে বর্ণ নির্দিষ্ট থাকলেও কোনো কোনো ধ্বনির রয়েছে একাধিক বর্ণ। তাই ভাষায় ধ্বনির সংখ্যার চেয়ে বর্ণের সংখ্যা বেশি। বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি বর্ণ রয়েছে।

স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ : যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখের ভেতরে কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনিমূল ৭টি, যথা– অ আ ই উ এ ও অ্যা। স্বরধ্বনিমূল ৭টি হলেও স্বরবর্ণ মোট ১১টি, যথা– অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ : যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখের ভেতরে বাধা পায়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা সীমিত হলেও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি, যথা– ক খ গ ঘ ঙ; চ ছ জ ঝ ঞ; ট ঠ ড ঢ ণ; ত থ দ ধ ন; প ফ ব ভ ম; য র ল; শ ষ স হ; ড় ঢ় য় ৎ; ং ঃ ঁ।

স্বরধ্বনির উচ্চারণপ্রক্রিয়া

উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরধ্বনিগুলো স্বনির্ভর। ফুসফুসতাড়িত বাতাস এবং জিহ্বা ও ঠোঁটের বিশেষ সহায়তায় স্বরধ্বনিগুলো বাধাহীনভাবে উচ্চারিত হয়। স্বরধ্বনিগুলোর মধ্যে অ ই উ ঋ হ্রস্বস্বর; আ ঈ ঊ এ ও দীর্ঘস্বর এবং ঐ ঔ যৌগিকস্বর। এছাড়া ই্ উ্ এ্ ও্ ধ্বনি শব্দে অর্ধস্বর হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ মৌখিক ও নাসিক্য উভয়ই হয়ে থাকে। মৌখিক ও অনুনাসিক স্বরধ্বনির পৃথক ব্যবহারে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়।

জিহ্বার বিভিন্ন অবস্থান ও ঠোঁটের আকৃতির ওপর স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নির্ভরশীল। স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখবিবরের সামনে, পেছনে বা মাঝামাঝি স্থানে এবং উপরে, মাঝে বা নিচে অবস্থান করে। এছাড়া ঠোঁটের আকৃতিও বিস্তৃত, স্বাভাবিক বা গোল হয়ে থাকে। এ উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিগুলোকে সম্মুখ (ই এ অ্যা), পশ্চাৎ (উ ও অ), কেন্দ্রীয় (আ); উচ্চ (ই উ), উচ্চমধ্য (এ ও), নিম্নমধ্য (অ্যা অ) ও নিম্ন (আ) এবং প্রসৃত (ই এ অ্যা), বিবৃত (আ) ও বর্তুল (উ ও অ) স্বরধ্বনি বলা হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণপ্রক্রিয়া

উচ্চারণের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো সম্পূর্ণ স্বনির্ভর নয়; স্বরধ্বনির সহায়তার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাক্প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাক্প্রত্যঙ্গের যে স্থানে বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয় সেই স্থানই হল সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান। উচ্চারণস্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– কণ্ঠ্যধ্বনি (ক খ গ ঘ ঙ), তালব্যধ্বনি (চ ছ জ ঝ ঞ শ য য়), মূর্ধন্যধ্বনি (ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়), দন্ত্যধ্বনি (ত থ দ ধ ন স) ও ওষ্ঠ্যধ্বনি (প ফ ব ভ ম)।

উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বিভিন্ন বাক্প্রত্যঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে স্পর্শধ্বনি (ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম), নাসিক্যধ্বনি (ঙ ঞ ণ ন ম ং), অঘোষধ্বনি (ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ শ ষ স), ঘোষধ্বনি (গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ ধ ন ব ভ ম র ল হ), অল্পপ্রাণধ্বনি (ক গ ঙ চ জ ঞ ট ড ণ ত দ ন প ব ম), মহাপ্রাণধ্বনি (খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ), উষ্মধ্বনি (শ ষ স হ), পার্শ্বিকধ্বনি (ল), কম্পনজাতধ্বনি (র), তাড়নজাতধ্বনি (ড় ঢ়), অন্তঃস্থধ্বনি (য় র ল) ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়।

শব্দে স্বরধ্বনির উচ্চারণ

'অ' ধ্বনি : শব্দে 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ দুরকম হয়ে থাকে– বিবৃত ও সংবৃত।

'অ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ : শব্দে 'অ' ধ্বনি যখন স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়, তখন তাকে 'বিবৃত অ' বলে। যেমন– অনেক (অনেক্), অংশ (অংশো) ইত্যাদি। 'অ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণের কয়েকটি ক্ষেত্র লক্ষণীয় :

ক) শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন– অমর (অমর্), অসীম (অশিম্) অটুট (অটুট্), অধর্ম (অধর্‌মো), অন্যায় (অন্‌ন্যায়্), অসাম্য (অশাম্‌মো), অকথ্য (অকোত্‌থো) ইত্যাদি।

খ) শব্দের আদিতে 'অ' ধ্বনির পর 'অ' বা 'আ/া' থাকলে আদি 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন– অজ (অজো), কত (কতো), কথা (কথা), অনন্য (অনোন্‌নো), অমাবস্যা (অমাবোশ্‌শা) ইত্যাদি।

গ) শব্দের আদিতে 'স' উপসর্গের 'অ' সর্বদা বিবৃত উচ্চারিত হয়। যেমন– সরস (শরশ্), সচিত্র (শচিত্‌ত্রো), সতীর্থ (শতির্‌থো), সশ্রদ্ধ (শস্‌স্রোদ্‌ধো), সস্ত্রীক (শস্‌ত্রিক্) ইত্যাদি।

ঘ) একাক্ষর শব্দ ও ধাতুর আদি 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন– কর্ (কর্), পড়্ (পড়্), জল (জল্) ইত্যাদি।

'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ : শব্দে 'অ' ধ্বনি যখন 'ও/ো' এর মতো উচ্চারিত হয়, তখন তাকে 'সংবৃত অ' বলে। যেমন– অদ্রু (ওদ্রু), অভ্যাস (ওব্‌ভ্যাশ্), অগ্নি (ওগ্‌নি) ইত্যাদি। 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণের কয়েকটি ক্ষেত্র লক্ষণীয় :

ক) পরবর্তী স্বর সংবৃত (ই/ঈ,উ/ঊ) হলে শব্দের আদি 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– অধীত (ওধিতো), অভিনন্দন (ওভিনন্‌দোন্), অনুকূল (ওনুকুল্), অশ্রু (ওস্‌স্রু), সচিব (শোচিব্), চরিত্র (চোরিত্‌ত্রো), নতুন (নোতুন্) ইত্যাদি।

খ) শব্দে র-ফলা যুক্ত 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– গ্রহ (গ্রোহো), প্রত্যয় (প্রোত্‌তয়্), প্রশান্ত (প্রোশান্‌তো), প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর্) ইত্যাদি। এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন– ক্রয়-(ক্রয়্), ত্রয় (ত্রয়্) ইত্যাদি।

গ) তর, তম, তন প্রত্যয়ত্রয়ের অন্ত 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– অধিকতর (ওধিক্‌তরো), গুরুতর (গুরুতরো), প্রিয়তম (প্রিয়োতমো), ন্যূনতম (নুনোতমো), সর্বোত্তম (শর্‌বোত্‌তমো), ঊর্ধ্বতন (উর্‌ধোতনো) ইত্যাদি।

ঘ) শব্দের আদিতে 'অ' ধ্বনির পর য-ফলা (্য) যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে আদি 'অ' এর উচ্চারণ প্রায়ই সংবৃত হয়। যেমন– কথ্য (কোত্‌থো), তথ্য (তোত্‌থো), শয্যা (শোজ্‌জা), পদ্য (পোদ্‌দো), কন্যা (কোন্‌না), কল্যাণ (কোল্‌ল্যান্), অভ্যাগত (ওব্‌ভাগতো), অধ্যক্ষ (ওদ্‌ধোক্‌খো), অধ্যাপক (ওদ্‌ধাপক্), অধ্যবসায় (ওধ্‌ধোবশায়্), অত্যন্ত (ওত্‌তোন্‌তো) ইত্যাদি।

ঙ) শব্দের আদিতে 'অ' এর পর 'ক্ষ' অথবা 'জ্ঞ' থাকলে আদি 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– কক্ষ (কোক্‌খো), দক্ষ (দোক্‌খো), অক্ষর (ওক্‌খোর্), লক্ষণ (লোক্‌খোন্), রক্ষা (রোক্‌খা) ইত্যাদি। এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন–অজ্ঞ (অগ্‌গোঁ), যক্ষ্মা (জক্‌খাঁ) ইত্যাদি।

চ) শব্দের আদিতে 'অ' ধ্বনির পর ঋ-কার (ৃ) যুক্ত বর্ণ থাকলে আদি 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– বক্তৃতা (বোক্‌তৃতা), মসৃণ (মোস্‌সৃন্), কর্তৃপক্ষ (কোর্‌তৃপোক্‌খো) ইত্যাদি।

ছ) শব্দে 'অ' ধ্বনির পর রেফযুক্ত 'য' (র্য) থাকলে 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– চর্যাপদ (চোর্‌জাপদ্), মর্যাদা (মোর্‌জাদা), ঐশ্বর্য (ওইশ্‌শোর্‌জো), সৌন্দর্য (শোউন্‌দোর্‌জো) ইত্যাদি।

জ) শব্দের মাঝে প্রায় সর্বত্রই 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– জননী (জনোনি), অসভ্য (অশোব্‌ভো), অদম্য (অদোম্‌মো), সৌজন্য (শোউজোন্‌নো) ইত্যাদি।

ঝ) কতগুলো সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদের শেষের 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– দেশপ্রেম (দেশোপ্‌প্রেম্), দেশবাসী (দেশোবাশি), জীববিদ্যা (জিবোবিদ্‌দা), পথচারী (পথোচারি), পথশিশু (পথোশিশু), পথভ্রষ্ট (পথোব্‌ভ্রোশ্‌টো) ইত্যাদি।

ঞ) কিছু দ্বিরুক্ত শব্দের মাঝে ও শেষে 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– কলকল (কলোকলো), ছলছল (ছলোছলো) ইত্যাদি। এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন– তরতর (তর্‌তর্), খলখল (খল্‌খল্), টলমল (টল্‌মল্) ইত্যাদি।

ট) শব্দের শেষে যুক্তবর্ণ থাকলে শেষ 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– প্রশ্ন (প্রোশ্‌নো), জন্ম (জন্‌মো), দ্বন্দ্ব (দন্‌দো), পুষ্প (পুশ্‌পো), বিত্ত (বিত্‌তো) ইত্যাদি।

'আ' ধ্বনি : শব্দে 'আ' ধ্বনির উচ্চারণ দুরকম হয়ে থাকে–হ্রস্ব ও দীর্ঘ।

ক) একাক্ষর শব্দে 'আ/া' এর উচ্চারণ কিছুটা দীর্ঘ হয়, যেমন– আম (আ-ম্), জাম (জা-ম্) ইত্যাদি। কিন্তু দুই বা ততোধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে 'আ/া' এর উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যেমন– আমার (আমার্), জামা (জামা) ইত্যাদি।

খ) শব্দের আদিতে 'জ্ঞ' এবং য-ফলা (্য) যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে আ-কার (া) সংযুক্ত হলে উক্ত আ-কারের উচ্চারণ প্রায়ই 'অ্যা' হয়ে থাকে। যেমন– জ্ঞান (গ্যাঁন্), জ্ঞাতি (গ্যাঁতি), ব্যাখ্যা (ব্যাক্‌খা) ইত্যাদি।

'ই/ঈ' ধ্বনি : 'ই' এবং 'ঈ' ধ্বনি দুটির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। শব্দের বানানে ঈ/ী থাকলেও উচ্চারণ লিখে দেখাতে হয় ই/ি দিয়ে। একাক্ষর শব্দে ই, ঈ উভয় ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন– ইট (ই-ট্), ঈদ (ই-দ্), দিন/দীন (দি-ন্) ইত্যাদি। কিন্তু দুই বা ততোধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে উভয় ধ্বনির উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যেমন–ইটের (ইটের্), ঈদের (ইদের্), দিনের/দীনের (দিনের্), ঈশ্বর (ইশ্শর্), ঈপ্সিত (ইপ্সিতো) ইত্যাদি।

'উ/ঊ' ধ্বনি : 'উ' এবং 'ঊ' ধ্বনি দুটির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। শব্দের বানানে ঊ/ূ থাকলেও উচ্চারণ লিখে দেখাতে হয় উ/ু দিয়ে। একাক্ষর শব্দে উ, ঊ উভয় ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন– উট (উ-ট্), কুল (কু-ল্), কূল (কু-ল্), দূর (দু-র্) ইত্যাদি। কিন্তু দুই বা ততোধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে উভয় ধ্বনির উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যেমন–উটের (উটের্), কুলা (কুলা), কূলের (কুলের্) দূরে (দুরে), উর্ধ্ব (উর্ধ্বো), ভূতপূর্ব (ভুতোপুর্বো) ইত্যাদি।

'ঋ' ধ্বনি : শব্দের আদিতে 'ঋ' ধ্বনির উচ্চারণ 'রি' এর মতো হয়। যেমন–ঋণ (রিন্), ঋতু (রিতু), ঋষি (রিশি) ইত্যাদি। তবে ঋ-কার (ৃ) এর উচ্চারণ অনেকটা ই-কার যুক্ত র-ফলা (ি্র) এর মতো হয়। যেমন– তৃণ ত্রিনো), বৃষ্টি (ব্রিশ্টি) ইত্যাদি।

'এ' ধ্বনি : শব্দে 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ দুরকম হয়ে থাকে– সংবৃত ও বিবৃত।

'এ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ : শব্দে 'এ' ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণকে 'সংবৃত এ' বলে। 'এ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়। 'এ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণের কয়েকটি ক্ষেত্র লক্ষণীয় :

ক) সংস্কৃত শব্দের শুরুতে এ/ে এর উচ্চারণ প্রায়ই সংবৃত হয়। যেমন– এবং (এবং), একত্র (একোত্রো), মেঘ (মেঘ্), দেশ (দেশ্), শেষ (শেশ্), মেরু (মের্), কেতন (কেতোন্), শেখর (শেখোর্) ইত্যাদি।

খ) শব্দের আদি এ/ে এর পর 'া' যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে আদি এ/ে এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– এশা (এশা), একাদশ (একাদশ্), একাধিক (একাধিক্), একান্ত (একান্তো), ইত্যাদি। এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন– একা (অ্যাকা) ইত্যাদি।

গ) শব্দের আদিতে এ/ে এর পর ই/ি, ঈ/ী, উ/ু, ঊ/ূ, এ/ে, ও/ো, য়, র, ল, শ, হ বা যুক্তবর্ণ থাকলে আদি এ/ে এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– একি (একি), একুশ (একুশ্), এখুনি (এখুনি), একটি (একটি), একটু (একটু), একত্রিশ (একোত্রিশ), এহেন (এহেনো, দেশি (দেশি), বেলুন (বেলুন্), চেষ্টা (চেশ্টা), দেহ (দেহো), তেল (তেল্) ইত্যাদি।

ঘ) শব্দের শেষে এ/ে এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– গ্রামে (গ্রামে), দেশে (দেশে), শেষে (শেশে) ইত্যাদি।

ঙ) একাক্ষর সর্বনাম পদের আদিতে এ/ে এর উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– এ, সে, যে, কে ইত্যাদি।

'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ : শব্দে 'এ' ধ্বনির 'অ্যা' এর মতো উচ্চারণকে 'বিবৃত এ' বলে। 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মাঝে বা শেষে পাওয়া যায় না। শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণের কয়েকটি ক্ষেত্র হল :

ক) শব্দের আদিতে এ/ে এর পরে 'অ' বা 'আ' থাকলে এ/ে এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন– এখন (অ্যাখোন্) এমন (অ্যামোন্), কেমন (ক্যামোন্), যেমন (জ্যামোন্), কেন (ক্যানো, যেন (জ্যানো, হেন (হ্যানো) ইত্যাদি।

খ) কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দের শুরুর এ/ে এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন–এক (অ্যাক্), এগারো (অ্যাগারো) তের (ত্যারো), একচল্লিশ (অ্যাক্চোল্লিশ্) একান্ন (অ্যাকান্নো), একাত্তর (অ্যাকাত্তোর্), একাশি (অ্যাকাশি) ইত্যাদি।

গ) শব্দের আদিতে এ/ে এর পরে ঙ, ং ঁ থাকলে আদি এ/ে এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন- বেঙ (ব্যাঙ্), লেংড়া (ল্যাঙ্ড়া), চেংড়া (চ্যাঙ্ড়া), নেংটা (ন্যাংটা) ইত্যাদি।

ঘ) খাঁটি বাংলা শব্দের আদিতে এ/ে এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন– তেনা (ত্যানা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা), খেমটা (খ্যামটা), চেপসা (চ্যাপ্সা) ইত্যাদি।

ঙ) বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদের আদি এ/ে এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন– দেখ্ (দ্যাখ্), দেখ (দ্যাখো), খেল (খ্যাল্), খেল (খ্যালো) ইত্যাদি।

চ) সাধিত ধাতুর আদিতে এ/ে এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন– খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা), হেলা (হ্যালা), তেলা (ত্যালা), বেচা (ব্যাচা), খেদা (খ্যাদা), ফেনা (ফ্যানা) ইত্যাদি।

'ঐ' ধ্বনির উচ্চারণ : 'ঐ' একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ+ই এর যুগ্মধ্বনি হিসেবে 'ঐ' ধ্বনিটির উচ্চারণ 'ওই্' হয়। যেমন– ঐক্য (ওইক্কো), ঐকমত্য (ওইকোমোত্তো), ঐকতান (ওইকোতান্), ঐশ্বর্য (ওইশ্শোর্জো), ঐচ্ছিক (ওইচ্ছিক্), বৈশ্বিক (বোইশ্শিক্), বৈধ (বোইধো), বৈচিত্র্য (বোইচিত্ত্রো), কৈশোর (কোইশোর্) ইত্যাদি।

'ও' ধ্বনির উচ্চারণ : 'ও' ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। এক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দে 'ও' ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যেমন-ওর (ও-র্), জোর (জো-র্), বোন (বো-ন্) ইত্যাদি। কিন্তু দুই বা বহু অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে ও/ে া এর উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যেমন–ওরা (ওরা), জোরের (জোরের্), বোনেরা (বোনেরা) ইত্যাদি।

'ঔ' ধ্বনির উচ্চারণ : 'ঔ' একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ+উ এর যুগ্মধ্বনি হিসেবে 'ঔ' ধ্বনিটির উচ্চারণ 'ওউ্' হয়। যেমন– ঔষধ (ওউশধ্), ঔদার্য (ওউদার্জো), ঔচিত্য (ওউচিত্তো), ঔপন্যাসিক (ওউপোন্নাশিক্), কৌতুক (কোউতুক্) ইত্যাদি।

শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

স্বরধ্বনির তুলনায় ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত জটিল ও বৈচিত্র্যময়। কারণ কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির যেমন একাধিক বর্ণ রয়েছে, তেমনি রয়েছে যুক্তবর্ণের বিচিত্র ব্যবহার। শব্দে অর্ধস্বরবর্ণ, স্বরধ্বনিহীন ব্যঞ্জনবর্ণ এবং যুক্তবর্ণের প্রথম বর্ণের নিচে হসন্ত চিহ্ন (্) ব্যবহার করতে হয়। যেমন– বই (বোই্), বউ (বোউ্), জয় (জয়্/জএ্), হও (হও্), মন (মোন্), মঙ্গল (মোংগোল্) আনন্দ (আনোন্দো), ইত্যাদি। নিচে বিশেষ কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণপদ্ধতি লক্ষণীয় :

ঙ, ং ধ্বনির উচ্চারণ : 'ঙ' এবং 'ং' অভিন্ন ধ্বনি। উভয়েরই উচ্চারণ 'অঙ্'। যেমন– রঙ/রং (রঙ্), রঙিন (রোঙিন্), অঙ্ক (অংকো), অঙ্কুর (অংকুর্), কঙ্কন (কংকন্), সঙ্গীত (শোংগিত্) ইত্যাদি।

'ঞ' ধ্বনির উচ্চারণ : 'ঞ' এর উচ্চারণ 'ইঁঅ'। আর যুক্তব্যঞ্জনরূপে 'ঞ' এর উচ্চারণ 'ন' এর মতো। যেমন–চঞ্চল (চন্চল্), লাঞ্ছনা (লান্ছোনা), বাঞ্ছনীয় (বান্ছোনিয়ো), ব্যঞ্জন (ব্যান্জোন্), ঝঞ্ঝা (ঝন্ঝা) ইত্যাদি। 'জ্ঞ' যুক্তব্যঞ্জনে 'ঞ' এর উচ্চারণ শব্দের আদিতে 'গ্যাঁ' এবং শব্দের মাঝে ও শেষে 'গ্+গঁ' হয়ে থাকে। যেমন–জ্ঞানী (গ্যাঁনি), জ্ঞাপন (গ্যাঁপন্), বিজ্ঞ (বিগ্গোঁ), বিজ্ঞান (বিগ্গ্যাঁন্), প্রজ্ঞা (প্রোগ্গাঁ) ইত্যাদি। অন্যত্র 'ঞ' এর উচ্চারণ 'য়ঁ' হয়। যেমন–মিঞা (মিয়াঁ), ভূঞা (ভুয়াঁ) ইত্যাদি।

ণ, ন ধ্বনির উচ্চারণ : ণ, ন উভয় নাসিক্য ধ্বনির উচ্চারণ 'ন'। শব্দের বানানে 'ণ' থাকলেও উচ্চারণ লিখে দেখাতে হয় 'ন' দিয়ে। যেমন– ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্), কল্যাণ (কোল্ল্যান্), অন্তর (অন্তর্), গ্রন্থ (গ্রোন্থো), বন্ধু (বোন্ধু) ইত্যাদি।

জ, য ধ্বনির উচ্চারণ : বাংলায় জ, য উভয় ধ্বনির উচ্চারণ 'জ'। শব্দে 'য' থাকলেও উচ্চারণ লিখে দেখাতে হয় 'জ' দিয়ে। যেমন– যদি, (জোদি), যুদ্ধ (জুদ্ধো), যুগ্ম (জুগ্মো), সূর্য (শুর্জো), যৌবন (জোউবন্), যাচ্ঞা (জাচ্না) ইত্যাদি।

ত, ৎ ধ্বনির উচ্চারণ : ত, ৎ অভিন্ন ধ্বনি। 'ৎ' মূলত হসন্ত 'ত্'। তাই শব্দে 'ৎ' এর উচ্চারণ লিখে দেখাতে হয় 'ত্' দিয়ে। যেমন– সৎ (শত্), মহৎ (মহোত্), উৎসব (উত্শব্), উৎপত্তি (উত্পোত্তি), কুৎসিত (কুত্শিত্) ইত্যাদি।

র, ড়, ঢ় ধ্বনির উচ্চারণ : র, ড় ঢ় ধ্বনির উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্রুত কম্পিত হয়ে 'র' উচ্চারিত হয়। 'ড়' এর উচ্চারণ ড্+র এর মাঝামাঝি ও 'ঢ়' এর উচ্চারণ ড্+হ এর মাঝামাঝি হয়ে থাকে। যেমন– রক্ষা (রোক্খা), রবীন্দ্র (রবিন্দ্রো), বড় (বড়ো), বাড়ি (বাড়ি), রূঢ় (রুঢ়ো), নিগূঢ় (নিগুঢ়ো) ইত্যাদি।

শ, ষ, স এর উচ্চারণ : শ, ষ, স এ তিনটি ধ্বনিরই উচ্চারণ 'শ' (sh) এর মতো। যেমন– ষষ্ঠ (শশ্ঠো), সবিশেষ (শবিশেশ্), ষড়ঋতু (শড়্রিতু), জনসংখ্যা (জনোশোঙ্খা) ইত্যাদি। তবে ত, থ, ন, র, ল এর সাথে 'শ' ও 'স' যুক্ত হলে উভয় ধ্বনির উচ্চারণ 'স' (s) এর মতো হয়। যেমন– সৃষ্টি (সৃশ্টি), শৃঙ্খলা (সৃংখলা) অস্রুষা (অস্স্রুশা), মস্তক (মস্তক্), শ্রবণ (স্রোবোন্), সুস্থ (শুস্থো), স্নেহ (স্নেহো), স্রোত (স্রোত্), শ্রদ্ধা (স্রোদ্ধা), শ্লোক (স্লোক্) ইত্যাদি।

'ঃ' (বিসর্গ) এর উচ্চারণ : 'ঃ' এর উচ্চারণ অনেকটা 'হ' ধ্বনির মতো। যেমন– আঃ (আহ্), উঃ (উহ্)। কোনো শব্দের মাঝে 'ঃ' থাকলে 'ঃ' এর পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন– নিঃস্ব (নিশ্শো), দুঃসাহস (দুশ্শাহোশ্), অতঃপর (অতোপ্পর্), প্রাতঃকাল (প্রাতোক্কাল্), ইতঃপূর্বে (ইতোপ্পুরবে) ইত্যাদি।

'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু) এর উচ্চারণ : 'ঁ' একটি অনুনাসিক ধ্বনি। শব্দে চন্দ্রবিন্দুর সাধারণ ব্যবহার ছাড়াও কোনো কোনো নাসিক্য ধ্বনির পরিবর্তিত বর্ণরূপে 'ঁ' এর ব্যবহার হয়ে থাকে। শব্দে স্বরবর্ণ বা কার-চিহ্নের উপর 'ঁ' লিখতে হয়। যেমন– আঁতাত (আঁতাত্), ইঁদুর (ইঁদুর্), ভুঁই (ভুঁই), অঙ্কন>আঁকা, অঞ্চল>আঁচল, কণ্টক>কাঁটা, চন্দ্র>চাঁদ, অন্ধকার>আঁধার, কম্পন>কাঁপন ইত্যাদি।

শব্দে ফলাযুক্ত ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলায় ফলা বর্ণগুলো (ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা) বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। নিচে ফলাযুক্ত কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ লক্ষণীয় :

ব-ফলার উচ্চারণ : শব্দের আদিতে ব-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত হলেও 'ব' এর উচ্চারণ হয় না। যেমন– স্বর্গ (শরগো), শ্বাপদসংকুল (শাপদ্‌শংকুল্), স্বৈরাচার (শোইরাচার্) ইত্যাদি। তবে শব্দের মাঝে বা শেষের ব্যঞ্জনবর্ণে ব-ফলা যুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন– বিশ্ব (বিশ্‌শো), শাশ্বত (শাশ্‌শতো) ইত্যাদি। এর কয়েকটি ব্যতিক্রমও আছে, যেমন– উৎ/উদ্ উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে উপসর্গের শেষ বর্ণের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না, ব-এর নিজস্ব উচ্চারণ বহাল থাকে। যেমন– উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্), উদ্বৃত্ত (উদ্‌বৃত্‌তো), ন্যুব্জ (নুব্‌জো) ইত্যাদি।

ম-ফলার উচ্চারণ : শব্দের আদিতে ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ সামান্য নাসিক্য হয়। যেমন– স্মৃতি (সৃঁতি), স্মরণীয় (শঁরোনিয়ো) ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মাঝে বা শেষের ব্যঞ্জনবর্ণে ব-ফলা যুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় এবং শেষ ধ্বনিটি নাসিক্যপ্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন– আত্মা (আত্‌তাঁ), আত্মীয় (আতর্তিয়ো), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ), বিস্ময় (বিশ্‌শঁয়্) ইত্যাদি। এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন– গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম, ল এর সাথে ম-ফলা যুক্ত হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না, ম-এর নিজস্ব উচ্চারণ বহাল থাকে। যেমন– বাগ্মী (বাগ্‌মি), বাঙ্ময় (বাঙ্‌ময়্) হীনম্মন্যতা (হিনোম্‌মোন্‌নোতা) ইত্যাদি। এছাড়া যুক্তব্যঞ্জনের সাথে ম-ফলা সংযুক্ত হলে ম-এর উচ্চারণ হয় না। যেমন– লক্ষ্মী (লোক্‌খি), লক্ষ্মণ (লক্‌খোন্) ইত্যাদি।

য-ফলা (্য) এর উচ্চারণ : শব্দের আদিতে '্য' এর উচ্চারণ সাধারণত 'অ্যা' হয়ে থাকে। যেমন– ব্যয় (ব্যায়্), ব্যথা (ব্যাথা), ব্যবসায় (ব্যাবোশায়্) ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের আদিতে '্য' এর পরে ই/ি, ঈ/ী থাকলে '্য' এর উচ্চারণ সংবৃত এ/ে হয়। যেমন– ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যতীত (বেত্তিতো), ব্যতিক্রম বেতিক্‌ক্রোম্) ইত্যাদি। শব্দের মাঝে বা শেষে '্য' যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন– অন্য (ওন্‌নো), পণ্য (পোন্‌নো), উদ্যোগ (উদ্‌দোগ্) ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শুরুতে, মাঝে বা শেষে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে '্য' থাকলে এর উচ্চারণ হয় না। যেমন– ব্যূহ (বুহো), স্বাস্থ্য (শাস্‌থো), সৌহার্দ্য (শোউহারদো) ইত্যাদি।

র-ফলা (্র) এর উচ্চারণ : শব্দের মধ্যে বা শেষে '্র' যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন– ছাত্র (ছাত্‌ত্রো), নম্র (নম্‌ম্রো), ভদ্র (ভদ্‌দ্রো), বিদ্রোহী (বিদ্‌দ্রোহি) ইত্যাদি। এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন– কৃচ্ছ্র (কৃচ্‌ছ্রো) ইত্যাদি।

ল-ফলা এর উচ্চারণ : শব্দের আদিতে ল-ফলা এর উচ্চারণ স্বাভাবিক থাকে। যেমন– প্লাবন (প্লাবোন্), ক্লেশ (ক্লেশ্) ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মাঝে বা শেষে ল-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন– অশ্লীল (অশ্‌শ্লিল্) ইত্যাদি।

হ-যুক্ত ধ্বনির উচ্চারণ : 'হ' এর সাথে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হলে উচ্চারণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। হ-এর সাথে 'ৃ' যুক্ত হলে উচ্চারণ 'hri' হয়, যেমন– হৃদয় (hriদয়্), সুহৃদ (শুhriদ্), হৃৎপিণ্ড (hriত্‌পিন্‌ডো) ইত্যাদি। হ-এর সাথে '্র' যুক্ত হলে উচ্চারণ 'hr' হয়, যেমন– হ্রদ (hrদ্), হ্রস্ব (hrশ্‌শো), হ্রাস (hraশ্) ইত্যাদি। হ-এর সাথে 'ণ' বা 'ন' যুক্ত হলে উচ্চারণ 'nh' হয়, যেমন– চিহ্ন (চিন্‌nho), পূর্বাহ্ণ (পুর্‌বান্‌nho), মধ্যাহ্ন (মোদ্‌ধান্‌nho), অপরাহ্ণ (অপোরান্‌nho) ইত্যাদি। হ-এর সাথে 'ম' যুক্ত হলে উচ্চারণ 'mh' হয়, যেমন– ব্রাহ্ম (ব্রাম্‌mho), ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌mhoন্), ব্রহ্মাণ্ড (ব্রোম্‌mhaন্‌ডো) ইত্যাদি। হ-এর সাথে 'ব' যুক্ত হলে উচ্চারণ 'ভ' হয়, যেমন– আহ্বান (আও্‌ভান্), বিহ্বল (বিউ্‌ভল্), জিহ্বা (জিউ্‌ভা) ইত্যাদি। হ-এর সাথে '্য' যুক্ত হলে উচ্চারণ 'জ্ঝ' হয়, যেমন– উহ্য (উজ্‌ঝো), সহ্য (শোজ্‌ঝো), বাহ্য (বাজ্‌ঝো), গ্রাহ্য (গ্রাজ্‌ঝো), ঐতিহ্য (ওইতিজ্‌ঝো) ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে আমার এ লেখায় বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয় এবং শব্দে ধ্বনিমালার উচ্চারণ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি– বাংলা ভাষার মৌখিক ও লৈখিক উভয় রীতির শুদ্ধতার ব্যাপারে আমাদের আরো সচেতন হওয়া দরকার। এ সচেনতার অংশ হিসেবে বাঙালির ঘরে ঘরে যেমন বাংলা বানান অভিধান ও উচ্চারণ অভিধান থাকা অপরিহার্য, তেমনি এগুলোর নিয়মিত চর্চা করাও অত্যাবশ্যক। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের মতো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়েও বাংলা দ্বিতীয় পত্রে 'বাংলা উচ্চারণের নিয়ম' শীর্ষক আলাদা অধ্যায় পাঠ্যভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর ব্যবহারিক অনুশীলনের কার্যকর ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

যুগান্তরের রূপকথা

ড. রুমানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ইদানীং অনেক নস্টালজিয়ায় ভুগছি। জীবনের জটিলতা আর ব্যস্ততায় এত বেশি হাঁপিয়ে উঠেছি যে, মনে হয় আগের দিনগুলো কতই-না মধুর ছিল! আমি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে শিক্ষকতা করছি প্রায় দশ বছর। পাকিস্তান সরকার যখন একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাদ দিয়ে দেশের বাকি ১০টি প্রতিষ্ঠানকে ক্যাডেট কলেজে রূপদান করেছিল, তখনই সম্ভবত বিধাতা আমার ললাটে লিখে দিয়েছিলেন যে, আমি চিরকাল এই সবুজ-শ্যামল পরিমণ্ডলেই বেড়ে উঠব। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছি অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে, যেখানে পেয়েছি বিশাল বড় খেলার মাঠ, সবুজ প্রাঙ্গণ। সপ্তম শ্রেণিতে যখন Mymensing Girls' Cadet College (MGCC) এ গেলাম তখন প্রথম প্রথম বাসার জন্য, আম্মুর জন্য খুব কান্না পেলেও ক্যাডেট কলেজের সবুজ-শ্যামলিমা, বিস্তৃত অঙ্গন, প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা আর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী অল্প সময়ের ভেতরেই আমার সেই Home Sickness এর বেদনাকে ভুলিয়ে দেয়। ক্যাডেট কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে ভর্তি হলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম যেদিন ফর্ম তুলতে যাই সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি আমি এই প্রকৃতির মাঝেই থাকব, এই নীরব-শান্ত-স্নিগ্ধ-সবুজ-শ্যামলিমাই আমার ভালোবাসা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা যখন বিসিএস ক্যাডার হওয়ার স্বপ্নে আচ্ছন্ন, আমি তখন ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখি। সৃষ্টিকর্তা আমার স্বপ্ন পূরণ করেছেন। আবার সেই একই সবুজ প্রাঙ্গণ। প্রথমবারের চেষ্টাতেই সৃষ্টিকর্তা আমার স্বপ্ন পূরণ করেছেন। প্রথমবারের চেষ্টাতেই সৃষ্টিকর্তা আমাকে DRMC এর শিক্ষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন।

কিন্তু DRMC এর প্রতিটি কর্মকাণ্ড, প্রতিটি অনুষ্ঠান আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমার কৈশোরের স্মৃতিগুলোকে। ক্যাডেট কলেজের সেইসব স্মৃতি কোনোভাবেই ভুলতে পারি না; এ যে ভোলার নয়!

DRMC তে Night Study হয়। ক্যাডেট কলেজে একে বলে Night Prep। কলেজে Night Study তে এলেই আমার ক্যাডেট কলেজের কথা মনে পড়ে যায়। ছাত্রদের যখন ঝিমাতে বা ঘুমাতে দেখি তখন মনে পড়ে যায় পুরোনো সেইসব স্মৃতি। Night Study-তে কতরকম কায়দা-কানুন করে যে বন্ধুরা ঘুমাত– যাতে ধরা না পড়ে যায় শিক্ষকদের হাতে। আমি তো এসব কায়দা-কানুনে সিদ্ধহস্ত। তাই আমার ছাত্ররা কোনোভাবেই আমার কাছে কিছু লুকাতে পারে না।

পরীক্ষার হলে গেলেও একই অবস্থা। ক্যাডেটদের মতো Discipline Way তে দুষ্টুমি কী আর কেউ করতে পারে? তাই পরীক্ষার হলেও ছাত্ররা রেহাই পায় না আমার হাত থেকে।

যখন সন্ধ্যায় হাউসের আবাসিক ছাত্ররা নামাজে যায়, তখন আমারও ক্যাডেটের মাগরিব Prayer এর কথা মনে পড়ে যায়। বিভিন্ন হাউস Competition এর সময় ফিরে যাই সেইসব দিনে– যে দিনগুলোতে হাউসের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আমি প্রতিযোগী, আর সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ফলাফলের জন্য।

DRMC এর হাউসের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির আবাসিক ছাত্রদের দেখে মাঝে মাঝে ভাবি– ওদের কত মনোবল, কত সাহস আর বিশ্বাস! এত ছোট বাচ্চারা কীভাবে Home Sickness কাটিয়ে নিজেদেরকে Self Dependent করে তৈরি করছে। আজ যখন আমার সন্তানের পোশাক, বইখাতা, খেলনা সব আমাকে গুছিয়ে রাখতে হয়, সেই একই Platform এ দাঁড়িয়ে House Boy রা নিজেদের কাপড় গোছানো, বইখাতা সংরক্ষণ, নিজেদের যত্ন নিজেরা নিচ্ছে, উপরন্তু হাউসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও অবদান রাখছে। চোখ বন্ধ করে ভাবলে তুলনা করে দেখতে পাই– এই ছেলেরাই একদিন দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আর আমার বাড়িতে, আমার ছায়ায় বেড়ে ওঠা সন্তান তুলনামূলকভাবে একটু হলেও হয়ত পিছিয়ে থাকবে আত্মনির্ভরশীলতার দিক থেকে। এটাই বাস্তবতা। হোস্টেল জীবনের এটাই সবচেয়ে বড় উপকার।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি। পরীক্ষার হলে আমার ছাত্রদের কিছু আচরণ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুব কষ্ট দেয়। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি–

ছাত্ররা তাদের নিজ নিজ পরীক্ষা সংক্রান্ত উপকরণগুলোকে আনতে প্রায়ই অনীহা দেখায়। এটা তাদের অভ্যাস, নাকি অনিচ্ছা, নাকি অজ্ঞতা, নাকি ভিক্ষাবৃত্তির সূচনা আমি ঠিক বুঝি না। প্রায়ই দেখা যায় এ-সে এটা-ওটা একজন আরেকজনের কাছ থেকে ধার নিচ্ছে। This is of course a very very very bad habit। কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় পরীক্ষার আগের রাতেই আমরা পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কিছু গুছিয়ে রেখেছি। পরীক্ষার হলে নিজের জিনিস ব্যবহার করেছি। কখনো কারো কাছে কিছু চাই নি। আর কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে অনেক আগে থেকেই মাকে বলে সেটা আনিয়ে রেখেছি। এ যুগের ছাত্রদের ভেতর এই বোধ দেখি না। মাকেই পরীক্ষার আগের রাতে খুঁজে দেখতে হয় সবকিছু ঠিক আছে কি-না। কিংবা পরীক্ষার আগের রাত ১১টার সময় হয়ত ছেলে বলছে- 'মা, কালকে আমার পরীক্ষায় এটি... লাগবে'।

ছাত্ররা যত বড় বা ছোট ক্লাসেরই হোক না কেন পরীক্ষার খাতার মলাটে বা কোড স্লিপে ঠিকমতো সব তথ্য সবসময় সবাই লেখে না। নিয়ম হচ্ছে তথ্যগুলো সব English এ লিখতে হবে। বিশেষ করে কলেজ নম্বর।

আজকাল ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানের বাইরে শিক্ষকদের দেখলে এড়িয়ে যায়, সালাম দেয় না, কাছে আসা তো দূরের কথা। কিন্তু আমরা এখনও আমাদের পুরোনো শিক্ষকদের দেখা পেলে পা ছুঁয়ে সালাম করি। এটা আসলে সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অর্থ কী এই– আমরা সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি অর্জনে ব্যর্থ?

এবার একটু ভালো কিছু বলি। এত যে বদনাম করলাম আমাদের ছাত্রসমাজের। এ বদনামের ভাগীদার আবার সব ছাত্র নয়–কেউ কেউ। অনেক ছাত্র আছে অনেক অনেক ভালো। শিক্ষকের একটা ইশারায় তারা জীবনও দিয়ে দিতে পারে। তারা পরীক্ষার হলে সবকিছু ঠিকমতো নিয়ে আসে। শিক্ষকদের সব জায়গায় সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। আসলে ভদ্রতা, সভ্যতা, দায়িত্ব, কর্তব্য, নৈতিকতা এগুলোর প্রথম শিক্ষা মানুষ নেয় পরিবার থেকে। দ্বিতীয়বার শিক্ষা নেয় বিদ্যালয় থেকে।

শিক্ষা যদি হয় জাতির মেরুদণ্ড, তাহলে শিক্ষক কী হবেন? অতএব নিজেকে একজন প্রকৃত Remian হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন, প্রয়োজন চেষ্টার এবং নিষ্ঠার। প্রয়োজন শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন।

যা লিখব বলে লেখা শুরু করেছিলাম সেই প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে এসেছি। বাংলাদেশে DRMC এর মতো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বৃহৎ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোধ হয় আর নেই। এত বিশাল পরিসরের একটা পরিবেশে, এত অনিন্দ্যসুন্দর সবুজের মাঝে যারা বেড়ে ওঠে, যাঁরা শিক্ষা দান করেন, তাদের হৃদয়টাও হওয়া উচিত এই প্রকৃতির মতোই বিশাল। বিশালত্বের সংজ্ঞা কী? ন্যায়-নীতিবোধ, মানবিকতা, উদারতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মায়া-মমতা, স্নেহ, জ্ঞানের আলো ইত্যাদি নিয়ে যে হৃদয় পরিপূর্ণ সেই হৃদয়ই তো বিশাল। শুধু লেখাপড়ায় ভালো হলে, ভালো রেজাল্ট করলেই ভালো মানুষ হওয়া যায় না। ভালো মানুষ হতে হলে জ্ঞান ছাড়াও উপরের গুণগুলোকেও ধারণ করতে হবে নিজের ভেতরে।

আমরা মোটামুটি সবাই এ কথাগুলো জানি ও মানি। কিন্তু মেনে নেয়া আর মনে নেয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। কথাগুলোকে মনে নেয় কয়জন? জীবনের পলে পলে আমরা পরিকল্পনা করি। কখনো ভালো কিছুর, কখনো মন্দ কিছুর। সবার কাছে এবং আমার কাছেও প্রত্যাশা রইল ভালো কাজগুলো যেন আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী এক একটি করে সফল করে তুলি। আর মন্দ কাজগুলোর পরিকল্পনার পরি যেন উড়ে যায়, পরে থাকে যেন শুধু কল্পনা–যা হৃদয়ের অন্ধকার চাদরে আবৃত করে রাখব আমরা সবাই।

> *"আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা–পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন–শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে–শিক্ষা ছেলেদের দেহ–মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।" – কাজী নজরুল ইসলাম।*

নজরুলের 'আল্লা পরম প্রিয়তম মোর'

আবদুল কুদ্দুস
প্রভাষক, যুক্তিবিদ্যা বিভাগ

স্কুলজীবন শেষ না-করা নজরুল এর কবিতা, গান, ছন্দ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশি-বিদেশি, বাঙালি-অবাঙালি গবেষক, লেখক ও সমালোচকদের গবেষণা-পর্যালোচনা এখনো চলছে এবং বাংলা সাহিত্য যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন হয়ত সেই ধারাও অব্যাহত থাকবে। তাঁর কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও যথেষ্ট হয়েছে এবং তিনি 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় সেটা বলেছেনও। যেমন– "বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বাবু বড় দুখে!/ অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!" শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা এবং সাথে সাথে যৌক্তিক মননের সচেষ্ট কিন্তু অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস থেকে তাঁর এক অনবদ্য অমূল্য কবিতা 'আল্লা পরম প্রিয়তম মোর' সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে কিছু বলার চেষ্টা করব।

কবিতাটিতে আছে ভাবের এক অতুলনীয় রূপমাধুর্য। পার্থিব ভালোবাসার বিভিন্ন চিত্র আমরা গল্প, কবিতা, নাটক, সিনেমায় দেখি, কিন্তু অপার্থিব, আধ্যাত্মিক প্রেম-ভালোবাসার উচ্চতম অভিব্যক্তি খুব কমই নজরে পড়ে। তারই এক জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত এই কবিতা। কবি মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টাকে এখানে আধ্যাত্মিকভাবে আলিঙ্গন করেছেন। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তথা মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে ভালোবাসার না ভিক্ততার? নৈরাশ্যবাদীগণ বলবেন– এই ভালোবাসা অর্থহীন, কিন্তু 'আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান' তিনি মনে করেন একমাত্র আল্লাহর প্রেমই পরম আরাধ্য। আমার মনের মধ্যে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, প্রেমিকত্বের যে প্রেম সেই প্রেমীয় 'জলপ্রপাতের' স্বচ্ছতম উৎস আল্লাহ। নজরুল তাঁর অসংখ্য গানে ও কবিতায় তাই বোঝাতে চেয়েছেন।

নজরুল-রচনাবলির প্রথম সংকলনকারী ও সম্পাদক কবি আব্দুল কাদিরের 'নজরুল রচনাবলি'র ৪র্থ খণ্ডে 'আল্লা পরম প্রিয়তম মোর' কবিতাটি স্থান পেয়েছে। আব্দুল কাদির এই সংকলনের ভূমিকায় যে কথাটি লেখেন তা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নজরুলের কাব্যজীবনকে ৪টি ভাগে ভাগ করেন। তাঁর ভাষায়– "নজরুলের কবি জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয় সঙ্গীত (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে।" এরপর তিনি 'আল্লা পরম প্রিয়তম মোর' কবিতার কয়েকটি চরণ উপস্থাপন করেন। এই কবিতার ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য হল– "আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এসকল কথা বলেছেন, তার গূঢ় রস-রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সুফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন, সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্ম সংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে। জনমন-ব্যঞ্জনের পরম উপযোগী, অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহৃত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে, সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।" তাঁর এ মূল্যায়নে নজরুলের আধ্যাত্মিক চিন্তা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। কবিতাটি ১৯৩৯-৪২ সালের মধ্যে লেখা হতে পারে। কবিতাটি নজরুল শুরু করেছেন এভাবে–

"আল্লাহ্ পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়।
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান-জ্ঞান তনুমন-প্রাণ, আমার পরম গতি।
প্রভু বলি' কভু প্রণত হইয়া ধুলায় লুটায়ে পড়ি,
কভু স্বামী বলে কেঁদে প্রেমে গলে তাঁরে চুম্বন করি।"

এখানে তিনি আল্লাহকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বা পরম প্রিয়তম বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যদি পরম প্রিয়তম বলে কেউ গ্রহণ করেন, তাহলে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য, সব ঐশ্বর্যের চেয়ে, স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবার চেয়ে, মাতৃভূমি-পিতৃভূমির চেয়ে, প্রিয় নেতার চেয়ে, নিজের পার্থিব যশ-খ্যাতির চেয়ে এককথায় সবকিছুর চেয়ে তাঁকেই তিনি উর্ধ্বে স্থান দেবেন। আমাদের প্রিয়নবী (স) এর জীবনে দেখা

যায় লোকেরা তাঁকে সম্পদ, নারী, ক্ষমতা, নেতৃত্ব সব দিতে চেয়েছে আল্লাহকে বাদ দেয়ার শর্তে; তিনি তখন দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন– "তোমরা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রকে এনে দিলেও আল্লাহর পথ থেকে আমি বিচ্যুত হব না।" এরই নাম আল্লাহর প্রেম। নবিজির সঙ্গীদের জীবনেও আমরা অতুলনীয় আল্লাহপ্রেম দেখেছি। নজরুল সে কথাই এখানে ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহর সাথে কবি কথা বলতে চান। কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর বিশাল সৃষ্টিজগতের অজানা রহস্যে ভয় পান তিনি। তাই গভীর রজনীতে, অন্ধকারে তাঁর সব ভয় চলে যায়। 'বাসর' রাতের কল্পনায় তিনি চলে যান। কথা শুরু হয় তাঁর সাথে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রিয়তমের কথা শুনেন, কিন্তু কিছু তার বুঝেন আর কিছু বুঝেন না। মনে মনে আল্লাহর রূপ-সৌন্দর্য দেখে তাঁকে কাছে পেতে শুরু হয় ক্রন্দন, কথা ভুলে যান, বুকে জড়িয়ে ধরতে পরম ইচ্ছে জাগে তখন। তিনি বুঝতেই পারেন না কেমন করে এই প্রেম এল। চাতক পাখি আকাশে মেঘের বিন্দু থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু জানে না কোথা হতে আসে এই পানি। তেমনি কবিও জানেন না কোথা হতে এল এই প্রেম-ভালোবাসা। কখনো তাঁকে নিয়ে তিনি খেলেন, খেলতে খেলতে কখনো আল্লাহ তাঁকে ছেড়ে যেন দূরে চলে যান। দুঃখে-কষ্টে-অভিমানে তখন বাসর ঘরের সাজানো সবকিছু তিনি ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেন। উত্তাল নদীর বিরাট বন্যার মতো বিরহ-ব্যথা ফুঁপিয়ে ওঠে। সময় চলে যায়। কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে যখন ভেঙ্গে পড়েন তখন তাঁর বক্ষে এসে তিনি হাজির, যেন 'দিনের বন্ধু' ও গভীর রাতের 'প্রিয়তম' আবার ফিরে এসেছে। কবির ভাষায়–

"দিন গুনে কত দিন যায় হায়, কত নিশি যায় জেগে!
চমকিয়া হেরি কখন অশ্রু-ধৌত বক্ষে মম
হাসিতেছে মোর দিনের বন্ধু, নিশীথের প্রিয়তম।"

অনেক দিনের না-পাওয়া বন্ধুকে হঠাৎ পেয়ে আনন্দে যেন কান্না আরো বেড়ে যায়। কল্পনায় আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথা শুরু করেন তিনি– "প্রভু, তুমি কত বড়, কত মহান, দয়াময়, তুমি কেন আমার কাছে আস? আমি গুনাহগার, পাপী, আমাকে ভালোবাসার এত মধু দিয়েছ। তুমি অতি পবিত্র, আমার প্রিয়তম বঁধু; এই ভালোবাসার কারণে শাস্ত্রবিদেরা যদি তোমাকে আবার দোষারোপ করে।" কবির ভাষায়–

"নিত্য পরম পবিত্র তুমি, চির প্রিয়তম বঁধু,
কেন কালি মাখ পবিত্র নামে, মোরে দিয়ে এত মধু!
মোরে ভালোবাস বলে তব নামে এত কলংক রটে,
পথে ঘাটে লোকে কয়, যাহা রটে, কিছু ত সত্য বটে!"

উল্লেখ করা প্রয়োজন, পারস্যের বিখ্যাত সুফি কবি জালালুদ্দিন রুমি তাঁর 'মসনবী' ও 'দিওয়ানে শামস-এ-তাবরিয' কাব্যগ্রন্থেও আল্লাহকে 'বঁধু' বলে সম্বোধন করেছেন। নজরুলের উপরিউক্ত সম্বোধনের পর কল্পনায় আল্লাহ তাঁকে জবাব দেন- "আমার ভালোবাসার স্পর্শ যে পায় সে তখন সোনা হয়ে যায়, তার অতীত ধর্ম, পাপ সব মুছে যায়। সে জন্য তাকে তারা নিন্দাও করে।"

এবার নজরুল আরেক ধরনের গভীর ধর্মীয় উপলব্ধির জগৎ তৈরি করেন। তিনি আল্লাহর 'কান্না' শুনতে পান। সেই কান্নার অদৃশ্য অশ্রু তার চোখে, বুকে এসে পড়ে। নিজের প্রেমিক বান্দার বেদনা-কষ্টে তিনি কাঁদেন। বিরহ-মেঘলা রাতে যে ঝড় ওঠে আকাশে, সেখানেই তিনি আল্লাহর ক্রন্দন শুনেন। এমনি এক বিশেষ আকাশে আল্লাহকে তিনি প্রশ্ন করেন– "তুমি দয়াময়, ক্ষমাসুন্দর, তাহলে কেন মানুষের জীবনে এত দুঃখ কষ্ট?" আল্লাহ বলেন– "আমি চাইলেও ওরা আমার সাথে ভালোবাসা চায় না, 'আড়ি' করে আছে ওরা আমার সাথে, সেজন্যই এত অভাব। আমি প্রতিদিন ওদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকি, ঘরে ঢুকতে কাঁদি, কিন্তু ওরা আমাকে ভয়ংকর ভেবে ঘরে আশ্রয় দেয় না। অথচ আমিই ওদের ঘরদোর দিয়ে থাকি। মানুষের পরমাত্মীয় আমি, অথচ ওরা আমাকে পর ভাবে। কাছে ডাকে না, আমাকে ভয় করে, ওরা ভীরু হচ্ছে। অথচ যে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায় তাকে আমি বুকে তুলে নিই; সমস্ত পাপ, তাপ, ক্রোধ আমার স্পর্শে মুছে যায়। আমি তখন আর তার বিচার করি না।" কবির ভাষায়–

"ভিখারির মত নিত্য ওদের দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকি,
আমাকে বাহিরে রেখো না বলিয়া কত কেঁদে কেঁদে ডাকি।
আমারে তাহারা ভাবে, আমি অতি ভয়াল ভয়ংকর;
আমি উহাদের ঘর দিই, হায়, আমারে দেয় না ঘর।...
জড়ায়ে ধরিতে চায় যে আমারে, তারে বুকে তুলে নিই।
সব মালিন্য, সব অভিশাপ, সব পাপ তার
আমার পরশে ধুয়ে যায়, আর করি না তার বিচার।"

নজরুল মনে করেন, প্রতিটি মানুষ আল্লাহর স্পর্শে পূর্ণতা লাভ করতে পারে, অন্যথায় তা সম্ভব নয়। সুফি কবি জালালুদ্দিন রুমির প্রেমদর্শনে দেখা যায়– ফুলের ঘ্রাণে, আকাশে, বাতাসে, ঝর্ণাধারায়, নদী, সাগর সবকিছুতেই আল্লাহর প্রেম এবং প্রেমের কারণেই এগুলো এত সুন্দর, গতিময়, ছন্দময়। নজরুলও তাই মনে করেন। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোতে তাঁরই ভালোবাসা ঝরে পড়ে, আকাশে ফিরোজা নক্ষত্র তাঁরই গভীর ভালোবাসা ছড়ায়, তাঁরই প্রেমের ক্ষুদ্র কণিকার স্পর্শে আমরা একে-অপরকে ভালোবাসি। আল্লাহর চাওয়া– আমরা তাঁরই মতো সুন্দর ও প্রেমময় হই। সেজন্য অবশ্য চেষ্টা-সাধনা করতে হয়। নজরুল বলেন–

"তাঁহারি প্রেমের আবছায়া এই ধরণীর ভালোবাসা,
তাঁহারি পরম মায়া যে জাগায় তাঁহার পাওয়ার আশা।
নিত্য মধুর সুন্দর সে যে নিত্য ভিক্ষা চায়,
তাঁহারি মতন সুন্দর যেন করি মোরা আপনায়।"

কিন্তু আল্লাহর সে প্রেম আমরা কী করে পেতে পারি সেটাও এখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেন। আমরা যখন তাঁর পথ ছেড়ে আমাদের কল্যাণ করতে ছুটি, তখন ভুল পথে চলে যাই এবং তার সুন্দর সৃষ্টিতে অসুন্দরের ছায়া পড়তে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অজ্ঞান-মূর্খ। এজন্যই তিনি আমাদের কাজ দিয়েছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী যদি আমরা চলি, তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর হবে। কিন্তু আমরা তা শুনি না। কবির ভাষায়–

"মোরা অজ্ঞান তাই তিনি চান, তাঁর নির্দেশে চলি;
তাঁহার আদেশ তাঁরি পবিত্র গ্রন্থে গেছেন বলি।"

আল্লাহর পথ সুনির্দিষ্ট, সুনির্মল, পরিচ্ছন্ন, শংকাহীন। সেই পথ ছেড়ে যারা অন্য পথ অনুসরণ করে তারা নিশ্চিতভাবে বিপদের অতল গহ্বরে পড়ে, প্রতি পদে পরাজিত হয়। বিষাক্ত শ্বাপদসংকুল পথ অনুসরণ করার কারণে নেমে আসে যন্ত্রণা, দুর্দশা, কষ্ট। তখন শুরু হয় আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিন্দাবাদ। কবির ভাষায়–

"সে কথা শুনি না, পথ চলি মোরা আপন অহংকারে,
তাই এত দুখ পাই, এত মার খাই মোরা সংসারে।
চলে না তাঁহার সুনির্দিষ্ট নির্ভয় পথে যারা,
অন্ধকারের গহ্বরে পড়ে মার খেয়ে মরে তারা।
তাঁর সাথে যোগ নেই যার, সেই করে নিতি অভিযোগ;
তাঁর দেওয়া অমৃত ত্যাগ করে বিষ করে তারা ভোগ।"

শেষ পর্যায়ে কবি আবার আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁরই করুণায় পৃথিবীতে ফুল-ফসল হাসে, বর্ষায় বৃষ্টি নামে, জ্ঞানের উন্নতি হয়। তবে জ্ঞানের যতই উন্নতি হোক না কেন, তাঁর মতে আমরা কোথা থেকে এলাম এর জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। আল্লাহকে যারা অবিশ্বাস করে, সন্দেহ করে তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন– আল্লাহর সাথে যার ভালোবাসা তৈরি হয় তার কোনো অভাব থাকে না, তাকে যে পেয়েছে, তার আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। আর কবি তাঁরই দয়ায় তাঁকে ভালোবাসতে শিখেছেন। তাই নিখিল মানবের উদ্দেশে তিনি দুঃখের সাথে বলেন–

"আর বলিব না। তাঁরে ভালোবেসে ফিরে এসে মোরে বলো
কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হলো।"

এই হল কবিতাটির সারসংক্ষেপ। সম্পূর্ণ কবিতাটি ভক্তি ও মনোযোগসহ পড়লে এর রস-সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যাবে, অন্যথায় তা সম্ভব নয়। আজ সব জায়গায় যখন আল্লাহকে বাদ দেয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত অপপ্রয়াস চলছে, সেখানে আমরা আল্লাহর পথকে অনুসরণ করে কি একটু তৃপ্ত হতে পারি না? নজরুল বাস্তবজীবনে কতটুকু ধর্ম পালন করতেন সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু তিনি যেভাবে আল্লাহ সম্পর্কে বুঝেছেন ও বলেছেন, আমাদের অনেকেরই হয়ত সেই উপলব্ধি নেই। ইসলামি তাসাওউফ অনুযায়ী যেসব আল্লাহপ্রেমিক সাধক সাধনার উচ্চস্তর 'ফানা ফিল্লাহ' বা 'বাকা বিল্লাহ' এ উপনীত হন তাঁরা সরাসরি আল্লাহর কাছে যেতে জ্ঞান লাভ করেন যাকে বলা হয় 'কাশফ' (gnosis)। এই জ্ঞান স্বচ্ছ জ্ঞান। খুব সম্ভব এমনি কিছু জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন নজরুল। আর সেই জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই শৈল্পিক অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর 'আল্লা পরম প্রিয়তম মোর' কবিতায়।

এমন মানুষ চাই

মোঃ আমিনুর রহমান
প্রভাষক, বাংলা (খণ্ডকালীন)

চাই এমন একটা মানুষ-
আছে যার জ্ঞানসহ হুঁশ;
স্বার্থের মোহে যে নয় বেহুঁশ;
মনে নেই দ্বন্দ্ব, লোভে নহে অন্ধ,
সব যার বন্ধ, তবু নেই সন্দেহ
অন্তর-মঞ্জিল ভরা শুধু স্নেহে;

ক্ষমতার দাপটে, কিপটে ও বখাটে,
বাগাতে বা বাকিতে অথবা ঠকাতে,
কোনোটাই নয় যার কাম্য,
হোক সে শহুরে অথবা গ্রাম্য;
হিংসার আগুনে নহে মন দগ্ধ,
শোকের তুষারে নহে স্তব্ধ;

মমতার কোমলে, ক্রোধের অনলে,
রটনার শিকারে, নাহি ভোগে বিকারে,
সকালে-বিকালে, সফলে বা বিফলে,
সদা থাকে অটলে, স্রষ্টার লিখনে,
আপদে-বিপদে, দুঃখ ও খুশিতে,
সুস্থ ও রোগীতে, আগু-পিছু ভাবিতে,
আত্ম-পর বাছিতে, বাধে যার বিবেকে;

নাহি খেদ, নাহি ভেদ উঁচু-নিচু নারীতে,
আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-মুচিতে;
সৃজিতে বা নাশিতে, আদিতে বা ইতিতে,
থাকে শুধু 'হিতে'তে, 'কু'কে খেদাতে,
'অপ'কে কাঁদাতে, 'সু'কে হাসাতে,
সৃষ্টির মাঝেতে, নিজেকে বিলাতে;

স্রষ্টার রঙেতে, জীবনকে রাঙাতে,
সুপ্তিত জাতিকে, সুপ্তি ভাঙাতে;
হক কথা বলিতে, এক পা হটিতে,
প্রাণ বাজি ধরিতে, তৈরি সর্বক্ষণ,
ধরাকে বাঁচাতেই হবে এই যার পণ।

ইসলামে সালামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মোহাম্মদ মশিউর রহমান
নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। মানবজীবনে এমন দিক নেই যা কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে পাওয়া যাবে না। **আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম** (সুরা মায়িদা, আয়াত-০৩)।

ইসলামি জীবনবিধান বা শরিয়াত এর প্রথম ভিত্তি ও উৎস হল আল কুরআন, আর দ্বিতীয় ভিত্তি ও উৎস হল হযরত মুহম্মদ (স) এর সুন্নাত। আমরা সবাই একথা স্বীকার করি যে, রাসুলুল্লাহ্ (স) হলেন মানবজাতির পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম আদর্শ। মানবজীবনের সকল দিকের সুস্পষ্ট পথনির্দেশ রাসুলের সুন্নাত হতে লাভ করা যায়। নবিজির আদর্শ চিরন্তন ও পরিপূর্ণ আদর্শ বিধায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বকালে তা অনুসরণীয়। তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের সমন্বয়ে গঠিত সুন্নাহ্ এক চির উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বৈবাহিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারস্পরিক লেনদেন, সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপন, আত্মীয়তা-শত্রুতা, শিক্ষা-দীক্ষা, রাষ্ট্রপরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও সন্ধি সবকিছু সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে রাসুলুল্লাহ্ (স) এর

পবিত্র জীবনাদর্শে। তাই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানের উপর চলতে হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথেই চলতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমের যেকোনো এবাদত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী করা একান্ত কর্তব্য। প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নির্দিষ্ট নিয়ম করে দিয়ে মহান **আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন : আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি, যা তারা অনুসরণ করে** (সুরা-হাজ্জ, আয়াত-৬৭)।

'আসসালামু আলাইকুম' অর্থাৎ 'আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' অভিবাদনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সামাজিক উপকারিতা ও উপযোগিতা অশেষ। বিশেষভাবে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে পরিচিত হওয়া, ভাবের আদান-প্রদান এবং তাকে খুব সহজেই আপন করে নেয়ার জন্য সাক্ষাতের সাথেই প্রথম সম্ভাষণ হিসেবে সালামই যথেষ্ট। আর পরিচিত ব্যক্তির সাথে সালাম বিনিময়ে হৃদ্যতা আরো সুদৃঢ় হয়। সালামের দ্বারা পারস্পরিক শত্রুতা দূর হয় এবং বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল সালাম ইসলামের প্রতীক। সালাম দেয়া-নেয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে সালাম দিল তখন সে যেন তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকার কামনা করল। কিন্তু যদি কেউ সালামের জবাব না দেয় তাহলে তার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার অনিষ্টকর কিছু প্রকাশ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কাজেই সালামের সাথে সাথে জবাব দিয়ে উক্ত ধারণা দূর করে দেয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। এ বিষয়ে **আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন করবে অথবা অনুরূপ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী** (সুরা নিসা, আয়াত-৮৬)। আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, কোনো মুসলমানকে সালাম দেয়া হলে তার জবাব দেয়া ওয়াজিব; শরিয়াতসম্মত ওজর ব্যতীত জবাব না দিলে সে গুনাহ্গার হবে।

মুসলমানদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হলে কোন্ বাক্যের মাধ্যমে কথোপকথন শুরু করতে হবে বা কীভাবে সালাম আদান-প্রদান করতে হবে তার শিক্ষা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আমাদের আদি পিতা আদম (আ)-কে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, **নবি (স) বলেছেন–আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন : তুমি যাও, উপবিষ্ট ফিরিশ্তাদের এই দলকে সালাম কর এবং তুমি মনোযোগ সহকারে শুনবে তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়। কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা)। তাই তিনি গিয়ে বললেন–'আস্সালামু আলাইকুম', তাঁরা জবাবে বললেন–'আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্'। তারপর নবি (স) আরও বললেন–'যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম (আ) এর আকৃতিবিশিষ্ট হবে'। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশ হ্রাস পেয়ে আসছে** (বুখারি, হাদিস-৫৭৯৪)।

মুসলমানদের পরস্পরের সাক্ষাতে সালাম দ্বারা অভিবাদন জানানো সুন্নাত, আর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। 'আস্সালামু আলাইকুম' বাক্য দ্বারা সালাম দিতে হয়, জবাবে ন্যূনতম 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম' বলতে হয়। তবে সালামে ও জবাবে 'ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্' ও 'ওয়া বারাকাতুহ্' ইত্যাদি ব্যবহার করাও উত্তম। দুজন একত্রে সালাম দিলে উভয়ের উপরই জবাব দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে (মেশকাত, নবম খণ্ড)।

সালাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও দোয়া। মুমিন হতে হলে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে হলে পরস্পরের মধ্যে বেশি সালাম বিনিময় করতে হবে। সালাম বিনিময় ছাড়া পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না এবং পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীকে সালাম দ্বারা অভ্যর্থনা জানাবেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- **রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না, যতক্ষণ না মু'মিন হবে আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন এক কাজ বাতলে দেব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে? তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাবে** (ইবনে মাজাহ্, হাদিস-৩৬৯২)।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরে কিছু-না-কিছু অহংকার নামক ব্যাধি রয়েছে। আর সালাম হল সেই দুষ্ট ব্যাধির প্রতিষেধক। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (স) এর নিকট প্রথমে সালাম দেয়া ব্যক্তি উত্তম। তাই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য– অহংকার ভুলে গিয়ে প্রথমে অন্য মুসলমানদেরকে সালাম দেয়া। রাসুলুল্লাহ্ (স) শিশু, বালক, মহিলাসহ সবাইকে প্রথমে সালাম দিয়েছেন। প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি যে উত্তম এ বিষয়ে আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, **রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন : মহান আল্লাহ্র কাছে সে ব্যক্তি শ্রেয় যে আগে সালাম দেয়** (আবু দাউদ, হাদিস- ৫১০৭)। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– **রাসুলুল্লাহ্ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল : ইয়া রাসুলুল্লাহ্, দুই ব্যক্তি সামনাসামনি হলে কে প্রথমে সালাম দিবে? তিনি বললেন– যে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার (রহমতের) অধিক নিকটবর্তী সে** (তিরমিযী, হাদিস-২৬৯৪)। আব্দুল্লাহ্ ইবনে সামিত বলেন, আমি একদা হযরত আবু যারকে বললাম– আমি আবদুর রহমান ইবনে উম্মুল হিকামের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের কোনো জবাব দিলেন না। জবাবে তিনি বললেনঃ ভাতিজা, তোমার তাতে কী আসে যায়? তোমার সালামের জবাব দিয়েছেন তাঁর চেয়েও উত্তম জন, তিনি হচ্ছেন তাঁর ডান পার্শ্বের ফেরেশতা (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০৫১)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্র ইবনুল আস (রা) বলেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি–যে শপথ করে মিথ্যা বলে, কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের ব্যাপারে কার্পণ্য করে এবং সবচেয়ে বড় চোর ঐ ব্যক্তি যে নামাযে চুরি করে (অর্থাৎ নামাযের রুকন ইত্যাদি আদায়ে ফাঁকি দেয়) আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০৫৪।

একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের অনেক হক রয়েছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল কর্তৃক নির্ধারিত। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন : মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক ছয়টি। সেগুলো কী জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন, সেগুলো হল– ১) তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দেবে, ২) তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩) সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দেবে, ৪) সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললে তার জন্য তুমি রহমতের দোয়া ('ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলে) করবে, ৫) সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬) সে মারা গেলে তার (জানাযার) সঙ্গে যাবে (মুসলিম, হাদিস-৫৪৬৬)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন : পাঁচটি বিষয় মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের ব্যাপারে ওয়াজিব : ১) সালামের জবাব দেয়া, ২) হাঁচিদাতাকে (তার 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলার জবাবে) রহমতের দোয়া করা, ৩) দাওয়াত কবুল করা, ৪) অসুস্থকে দেখতে যাওয়া এবং ৫) জানাযার সাথে গমন করা (মুসলিম, হাদিস-৫৪৬৫)। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ (স)-কে জিজ্ঞাসা করল- ইসলামের কোন্ কাজ উত্তম ? তিনি বললেন : তুমি ক্ষুধার্তকে খাবার দেবে, আর সালাম দিবে যাকে তুমি চেন এবং যাকে তুমি চেন না। (বুখারি, হাদিস-৫৮০২)। ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–একদা এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ (স) এর কাছে এসে বলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। রাসুলুল্লাহ্ (স) তার সালামের জবাব দিলে সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেন : সে দশটি নেকি পেয়েছে। এরপর এক ব্যক্তি এসে বলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ'। তিনি তার সালামের জবাব দিলে সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেন : সে বিশটি নেকি পেয়েছে। এরপর লোকটি বলে 'ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু'। রাসুলুল্লাহ্ (স) তার সালামের জবাব দিলে সে বসে পড়ে। তখন তিনি বলেন : সে ত্রিশটি নেকি পেয়েছে (আবু দাউদ, হাদিস-৫১০৫)। হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন : কোনো মুসলমানের উচিত নয় যে, সে তার ভাইকে তিনদিনের অধিক পরিত্যাগ করে। এরপর যখন সে তার সাথে দেখা করবে, তখন তাকে তিনবার সালাম দেবে। যদি সে একবারও সালামের জবাব না দেয়, তখন সে সমস্ত গুনাহের ভাগী হবে (আবু দাউদ, হাদিস-৪৮৩৩)। উক্ত হাদিসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেয়া এবং সালাম গ্রহণ করা একটি পুণ্যময় হক এবং এ হক আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য।

সালাম প্রদান ও গ্রহণের নিয়মাবলি

গৃহে প্রবেশকালে সালাম প্রদান : শুধু পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎকালে নয়, নিজ গৃহে বা অন্যের গৃহে প্রবেশকালেও সালাম দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদেরকে সালাম দেবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহ্‌র নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার (সুরা আন্-নূর, আয়াত-৬১)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমাকে রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন : হে বৎস, যখন পরিবার-পরিজনের নিকট প্রবেশ করবে তখন সালাম দেবে। এতে তোমার এবং তোমার গৃহবাসীর জন্য বরকত হবে (তিরমিযী, হাদিস-২৬৯৮)। হযরত কাতাদাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন : যখন তোমরা কোনো গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম দেবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ করবে (মেশকাত, হাদিস-৪৪৪৬)। অর্থাৎ নিজের ঘর হোক বা অন্যের ঘর হোক, প্রবেশ করার ও বের হওয়ার সময় সালাম দেয়া সুন্নত।

বাহক মারফত সালাম পৌঁছানো এবং তার জবাব দান : গালিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–একদা আমরা হযরত হাসান বসরী (র) এর দরজায় বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার পিতা আমার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন–একদিন আমার পিতা আমাকে রাসুলুল্লাহ্ (স) এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন তাঁকে আমার সালাম জানাবে। আমার দাদা বলেন–আমি তাঁর খেদমতে এসে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি বললেন– তোমার উপর এবং তোমার পিতার উপর আমার সালাম (মেশকাত, হাদিস-৪৪৫০)। হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–রাসুলুল্লাহ্ (স) তাঁকে বলেছিলেনঃ জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম করেছেন। তখন তিনি বললেন– ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু (তিরমিযী, হাদিস-২৬৯৩)। উক্ত হাদিসদুটি থেকে বোঝা যায়–কারো নিকট বাহক মারফত সালাম পাঠালে সে লোক গিয়ে বলবে 'অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছে'। সালামের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে, 'আসসালামু আলাইকুম' বলার প্রয়োজন হবে না। আর জবাবদাতা বলবে 'আলাইকা ওয়া আলাইহিস্ সালাম'।

মজলিসে পৌঁছানোর পর এবং মজলিস থেকে উঠার সময় সালাম প্রদান : কোনো মজলিসে পৌঁছানোর পর সালাম দেয়া, বসার প্রয়োজন হলে বসা এবং সেখান থেকে উঠে আসার সময় সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ করা ইসলামি আদব। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন মজলিসে যাবে তখন সালাম দেবে। আর যখন সে উঠে আসবে, তখনও সালাম দেবে। কেননা প্রথমবার সালাম দেয়া দ্বিতীয়বার সালাম দেয়ার চাইতে অধিক জরুরি নয় (অর্থাৎ উভয় সালামই জরুরি) (আবু দাউদ, হাদিস-৫১১৮)।

দলের মধ্য থেকে একজন সালামের জবাব প্রদান : একদল লোকের পক্ষ হতে যেকোনো একজন সালাম দিলে সেই সালাম যেমন পুরো দলের পক্ষ হতে দেয়া হয়, তেমনি উপবিষ্ট মজলিসের পক্ষ হতে একজন ব্যক্তির জবাবই পুরো মজলিসের পক্ষ হতে জবাব প্রদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এ প্রসঙ্গে **আলী ইবনে আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–যখন কোনো দল কোথাও যায় তখন তাদের একজনে সালাম দিলেই যথেষ্ট হবে। আর বসা লোকদের মধ্য থেকে একজন সালামের জবাব দিলেই যথেষ্ট** (আবু দাউদ, হাদিস-৫১২০)। যেহেতু সালাম হল সুন্নতে কেফায়া এবং জবাব দেয়া ওয়াজিবে কেফায়া, সেহেতু একজন আদায় করলেই সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। তবে কেউই আদায় না করলে সকলেই গুনাহ্গার হবে।

বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় মিলিত হলে সালাম প্রদান : ইসলামে পরস্পরের মধ্যে বেশি বেশি সালাম বিনিময় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে মিলবে, তখন তাকে সালাম দেবে। এরপর যদি উভয়ের মাঝে কোনো গাছ, দেয়াল বা পাথরের আড়ালের পরে আবার দেখা হয়, তখন পুনরায় তাকে সালাম দেবে** (আবু দাউদ, হাদিস-৫১১০)।

যে মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ই আছে সেখানে সালাম প্রদান : আল্লামা নববি বলেন, কোনো মজলিসে মুসলমান ও অমুসলমান মিশ্রিত থাকলে তখন সালাম দেয়ার সুন্নত তরিকা হল– মুসলমানদের নিয়ত করে সালাম দেবে (মেশকাত, হাদিস-৪৪৩৪)। উসামা ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (স) একবার এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে মুসলমান ও ইয়াহুদী লোকজন মিশ্রিত ছিল। তিনি তাদের প্রতি সালাম দিলেন (তিরমিযী, হাদিস-২৭০২)।

ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্টকে, আরোহী পথচারীকে, অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম প্রদান : আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেনঃ ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে** (বুখারি, হাদিস-৫৭৯৮)। তবে বড় ছোটকে, বসা ব্যক্তি পথচারীকে, বেশি সংখ্যক লোক অল্প সংখ্যক লোককে, আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে সালাম দিতে পারে (মুয়াত্তা, সালাম অধ্যায়)। মহানবি (স) শিশু-কিশোরদেরও সালাম দিতেন। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্ (স) কিশোরদের কাছ দিয়ে (পথ) অতিক্রম করলেন, তখন তিনি তাদের সালাম দিলেন** (মুসলিম, হাদিস-৫৪৭৮)। **আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি একদল শিশুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করে বললেন–রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা করতেন** (বুখারি, হাদিস-৫৮১৩)।

পুরুষ কর্তৃক মহিলাকে এবং মহিলা কর্তৃক পুরুষকে সালাম প্রদান : আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্ (স) একদিন মসজিদের ভিতর হেঁটে যাচ্ছিলেন। একদল মহিলা সেখানে উপবিষ্ট ছিল। তখন তিনি সালামের সঙ্গে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলেন** (তিরমিযী, হাদিস-২৬৯৭)।

সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা : উলামাদের অনেকেই বলেন, সালাম করলেই প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হল। তবে সালামের সাথে অনুমতি চাওয়া উত্তম। স্বয়ং উমর (রা) রাসুলুল্লাহ্ (স) এর নিকট সালাম করার পর প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–**একদা উমর (রা) রাসুলুল্লাহ্ (স) এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, 'আস্সালামু আ'লা রাসুলিল্লাহ্। আসসালামু আলাইকুম। উমর কি ভেতরে আসতে পারে?'** (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০৮৫)। হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, **নবি (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম (দ্বারা অনুমতি গ্রহণ) না করে তোমরা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না** (মেশকাত, হাদিস-৪৪৭১)।

প্রবেশের অনুমতির জন্য তিনবার পর্যন্ত সালাম প্রদান : আবুল আলানিয়া বলেন, একদা আমি হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু অনুমতি পেলাম না। আমি পুনরায় সালাম দিলাম কিন্তু আমি এবারও অনুমতি পেলাম না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার সালাম দিলাম এবং উচ্চৈস্বরে বলে উঠলাম: "আস্সালামু আলাইকুম" হে গৃহবাসী। কিন্তু এবারও আমাকে অনুমতি দেয়া হল না। তখন আমি এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লাম। এমন সময় একটি বালক বের হয়ে এসে বলল: ভিতরে আসুন। তখন আবু সাঈদ (রা) আমাকে লক্ষ করে বললেন–ওহে, যদি তুমি এর বেশি সংখ্যকবার অনুমতি প্রার্থনা করতে তবে তোমাকে আদৌ অনুমতি দেয়া হত না (অর্থাৎ আমি আড়ালে থেকে লক্ষ করলাম, অনুমতি প্রার্থনার ঠিক নিয়ম সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি-না এবং সেই অনুযায়ী কাজ কর কি-না!) – আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০৯১।

কথাবার্তা শুরুর আগে সালাম প্রদান : আনাস ইবনে মালিক (রা) উমর (রা) হতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম দেয়ার পর তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন– কেমন আছ? লোকটি বলল– আল্লাহ্র শোকর (ভালো আছি)। উমর (রা) বললেন– আমি তোমার কাছে এটাই কামনা করেছিলাম (মুয়াত্তা, অধ্যায়-৫৩, রেওয়াত-৫)।

নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দিলে জবাব না দেয়া : আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমরা রাসুলুল্লাহ্ (স) কে তাঁর সালাতরত অবস্থায় সালাম দিতাম, তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। পরে যখন আমরা নাজাশির নিকট থেকে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে (সালাতরত অবস্থায়) সালাম দিলে তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না এবং পরে ইরশাদ করলেন– সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে (বুখারি, হাদিস-১১২৫)।

হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী বলেন–মসজিদের ভেতরে জোরে সালাম দেয়া, কুরআন তিলাওয়াতরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া, একাধিক লোকের মধ্যে নির্দিষ্ট করে কাউকে সালাম দেয়া ও সালাম দেয়ার সময় কপালে হাত ঠেকানো বা ঝুঁকে যাওয়া উচিত নয়। অপরিচিত ব্যক্তি যদি 'আস্সালামু আলাইকুম' বলেন তাতেই তার মুসলিম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তবু যদি সন্দেহ প্রবল হয় যে, তিনি একজন অমুসলিম তাহলে 'ওয়া আলাইকুম' বলে তার সালামের জবাব দিতে হবে।

অনাত্মীয় বা গাইরে মাহরম নারী/পুরুষের ক্ষেত্রে সালাম বিনিময় : ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মালিক (র) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল যে, পুরুষ স্ত্রীলোককে (কিংবা স্ত্রীলোক পুরুষকে) সালাম করবে কি? তিনি উত্তর দিলেন– বৃদ্ধের জন্য এটা খারাপ না, তবে যুবক (যুবতী) এর জন্য ভালো নয়। এ হাদিসে গাইরে মাহরমের কথা বলা হয়েছে। মাহরম হলে যুবক-যুবতী উভয়ের পরস্পরের সালাম দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই (মুয়াত্তা, অধ্যায়-৫৩, রেওয়াত-২)।

ইশারা-ইঙ্গিতে সালাম প্রদান : হযরত আসমা (রা) বলেন, নবি করিম (স) তাঁর হাত দ্বারা মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিতে সালাম করেন (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০১৫)। মুখে সালাম দেয়ার সাথে সাথে হাত উঠানো ইসলামি রীতি নয়। তবে দূর হতে সালাম দিলে তা বুঝাবার জন্য হাত উঠানোতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সালামের বাক্য উচ্চারণ না করে শুধু হাত বা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলে এতে সালাম আদায় হবে না। তাই জবাব দেয়াও ওয়াজিব নয়। আর এরূপ করা নিষিদ্ধ, কারণ এটা অমুসলিমদের রীতি।

শুনিয়ে সালাম দেয়া : সাবিত ইবনে উবায়দ বলেন, আমি এমন এক মজলিসে উপনীত হই–যেখানে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন– যখন তুমি সালাম দাও, তখন শুনিয়ে দিবে। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে একটি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র সম্মান (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০১৮)।

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান : হযরত মিকদাম ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, নবি করিম (স) রাত্রে এসে এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত ব্যক্তিরা এতে জেগে উঠত না অথচ জাগ্রতরা তা শুনতে পেত (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০৪১)।

নির্জন গৃহে প্রবেশকালে সালাম প্রদান : নাফি' বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেছেন: কেউ কোনো নির্জন গৃহে প্রবেশ করলে তার বলা উচিত–**'আসসালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন'** অর্থাৎ আমার ও আল্লাহর সমস্ত নেক্কার বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হউক (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০৬৮)।

মজলিস হতে প্রস্থানকালে সালাম প্রদানকারীর হক : মু'আবিয়া ইবনে কুররা বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে লক্ষ করে বললেন: হে বৎস, তুমি যদি কোনো মজলিসে উপকার লাভের আশায় বসে থাক, আর কোনো প্রয়োজন তোমাকে সেখান হতে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে বাধ্য করে তবে (প্রস্থানকালে) বলবে– সালামুন আলাইকুম। তাহলে সেই মজলিসে অংশগ্রহণকারীগণ যে কল্যাণ লাভ করবে তুমিও তা পাবে। আর যারা কোনো মজলিসে অংশগ্রহণের পর আল্লাহ্কে স্মরণ করা ছাড়াই মজলিস ভঙ্গ করে উঠে যায়, তারা যেন একটা মৃত গাধা হতে উঠে গেল (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস-১০২২)।

রাস্তায় বসার হক সালামের জবাব প্রদান : রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা, মজলিস ও বৈঠক পরিহার করা উচিত। তবে যদি একান্তই করতে হয় তবে রাস্তার হক আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, **রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন– তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকবে। তাঁরা বললেন– ইয়া রাসুলুল্লাহ্, রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের উপায় নেই, সেখানে আমরা কথাবার্তা বলি। রাসুলুল্লাহ্ (স) বললেন: একান্তই যদি তোমাদের বসতে হয়, তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন– রাস্তার হক কী ? তিনি ইরশাদ করলেন: দৃষ্টি অবনত রাখা, (কাউকে) কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ করা ও মন্দকাজের নিষেধ করা** (মুসলিম, হাদিস-৫৪৬৩)।

অতএব আসুন, আমরা সালামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করি, সালাম প্রদান ও জবাবদানের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে এর হক আদায় করি এবং ব্যাপকভাবে সালামের প্রচার ও প্রসারে আন্তরিক হই।

Change My Style

তিমথী পেনাপেল্লী সবুজ
ক্লিনার (সেন্ট্রাল)

মাদকাসক্তি একটি অত্যন্ত জটিল, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা। এটি একদিকে যেমন ব্যক্তির সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা তথা স্বাভাবিক জীবনপ্রণালিকে তিলে-তিলে ধ্বংস করে অকাল মৃত্যু ডেকে আনে, তেমনি অন্যদিকে পরিবারকে করে তোলে হতাশাগ্রস্ত, আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন। নেশার পঙ্কিলতায় জর্জরিত অভিশপ্ত জীবন হতে রক্ষা পেতে সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রাথমিকভাবে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে– এ সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য জেনে রাখা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এটি মোকাবেলার কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত হওয়া। মাদকদ্রব্য গ্রহণের কুফল, ভয়াবহতা ও পরিণতি সংক্রান্ত কিছু তথ্য Change My Style থেকে জেনে রাখি :

- মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।
- মানসিক সপ্রতিভতা ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয় ও চিন্তাশক্তি লোপ পায়।
- নিদ্রাহীনতা, উগ্রমেজাজ, খিটুনি ও আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- ক্ষুধামন্দা ও পাকস্থলির গোলযোগ দেখা দেয়।
- হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি যেমন– রক্তচাপ, হার্ট ব্লক, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন জাতীয় রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়।
- ফুসফুসের ক্ষতি যেমন–যক্ষা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের প্রদাহ, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হতে পারে।
- জন্ডিস, হেপাটাইসিস বি, সিরোসিস অব লিভার ইত্যাদি রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- মাংসপেশীর শৈথিল্য ও সমন্বয়ে ঘাটতি দেখা দেয়।
- চর্মরোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- রক্তশূন্যতা ও অপুষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- রোগ প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পায়।
- এইডস্ রোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- মূত্রথলির প্রদাহ ও বৃক্কযন্ত্রের (কিডনি) কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।
- যৌনস্পৃহা এবং পুরুষত্বহীনতা ও সন্তান জন্মদান কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।
- মাদকদ্রব্যে আসক্ত মায়েদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মায়েদের কাছ থেকে আসক্তি ও রোগ সংক্রমণ লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাছাড়া বিকৃত সন্তান জন্মদানের ঝুঁকি বেশি থাকে।
- সামাজিক অস্থিরতা, অবক্ষয়, বিবাহবিচ্ছেদ ও আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- সমাজে অপরাধপ্রবণতা ও দুর্ঘটনার প্রকোপ বেড়ে যায়।
- বেকারত্বের হার বেড়ে যায়, কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।
- সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও প্রগতি ব্যাহত হয়।

অতএব আসুন, আমরা সকল প্রকার মাদকদ্রব্য থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখি এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি।

স্টুডেন্টস কর্নার

বাংলা লিখন

ছড়া ও কবিতা

ইচ্ছে করে

মাহমুদ জিলানি
কলেজ নম্বর : ১৫৩০১৬৭
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-ক (প্রভাতি)

ইচ্ছে করে হতাম যদি
নিজের মনের মতো,
আমি হতাম বাংলাদেশে
জাতীয় কবির মতো।
ইচ্ছে করে হতাম যদি
দূর আকাশের তারা,
কাজ করতাম তাদের জন্য
দুঃখে আছে যারা।
ইচ্ছে করে যখন যেমন
হতাম যদি তাই,
মা কি আমায় চিনতে পারত
আমি যে তার বাবাই।

মনে পড়ে

সাদ বিন কামাল
কলেজ নম্বর : ১৩৯৭৪
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-ক (প্রভাতি)

এখন সে ছোটে
ফুল হয়ে ফোটে
রোজ ভোরে ওঠে।
এখন সে হাঁটে
বিকেলের মাঠে
দিঘিটির ঘাটে।
করে কিছু ভুল
থাকে মশগুল
যেন এক ফুল।
এখনও সে ডাকে
মনে ছবি আঁকে
ভালোবাসে মাকে।

দুষ্টামি

তাহমিদ আহমেদ স্বপ্ন
কলেজ নম্বর : ১৫১০০০৯
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-গ (প্রভাতি)

লক্ষ্মী ছেলে, পক্ষী ছেলে, বলেন আমায় মা,
সেটা শুধুই পড়ার সময় অন্য সময় না।
বাবা এসে বলেন যখন কখন খাবে তুমি?
ভালো লাগে না এসব কথা দুষ্টামি চাই আমি।
আমার মনের কথাগুলো কেউ বুঝে না হায়,
বাধ্য হয়ে পড়তে বসি, খেতেও আবার হয়।
পড়ালেখা বুঝতে পারলে অনেক মজা পাই,
পরের দিনই মনের সুখে স্কুলেতে যাই।
ভালো ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, হব আমি জানি,
বড় হলে থাকবে না আর এসব দুষ্টামি।

ছয় ঋতু

আহনাফ ফুয়াদ খান
কলেজ নম্বর : ৮০৫৩
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-ক (দিবা)

গ্রীষ্মে গরম
বর্ষায় বৃষ্টি,
শরতের রোদ আহা
লাগে কী যে মিষ্টি।
হেমন্তে পাকে ধান
শীতে পিঠা খাই রে,
বসন্তে ফুল ফোটে
তুলনা যে নাই রে।

আষাঢ়

সাইদ আব্দুল্লাহ আস-সামি
কলেজ নম্বর : ১৩৬১১
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-ক (প্রভাতি)

আষাঢ় মানে টাপুর টুপুর,
আষাঢ় মানে বৃষ্টি।
আষাঢ় মানে কালো মেঘের,
অনন্য এক সৃষ্টি।
আষাঢ় মানে চারিদিকে,
কদম-কেয়ার গন্ধ।
আষাঢ় মানে রাস্তাঘাটে,
চলাফেরা বন্ধ।

দোসরা মার্চ

আর-রাহিকুল মাখতুম
কলেজ নম্বর : ৭৪২৯
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-ক (দিবা)

মুজিব দিলেন আন্দোলনের
নতুন কর্মসূচি,
দেশ বাঁচাতে এগিয়ে আসুন
সবাই যেন বাঁচি।
দোসরা মার্চ হরতাল হল
ঢাকা শহর জুড়ে,
তিন তারিখে সারা বাংলায়
নগরে বন্দরে।
ছাত্ররা সব এগিয়ে গেল
আর একধাপ আগে,
স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে
উঠল তারা জেগে।
দোসরা মার্চ গভীর রাতে
কারফিউ জারি করে,
পাকসেনারা গুলি করে
পথচারীদের মারে।

একটি শিশু

ইশতিয়াক হোসেন মাহমুদ
কলেজ নম্বর : ১৩০৫৬
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-খ (প্রভাতি)

একটি শিশুর কোমল ছবি
পিতামাতার চোখের আলো,
একটি শিশুর কোলাহলে
ঘুচায় সকল দুঃখের কালো।
একটি শিশু মগ্ন থাকে
কথায়-কাজে, হাসি-গানে।
একটি শিশু চপলমতি
দুষ্ট ভীষণ খেলার কাজে,
দুষ্টুমি আর খেলাধুলায়
মুখর থাকে সকাল-সাঁঝে।
একটি শিশুর চোখে-মুখে
অনেক দাবি অনেক আশা,
একটি শিশুর জন্য লাগে
স্নেহ-শাসন-ভালোবাসা।

পরীক্ষা

মোহাম্মাদ রাকিবুল হাসান
কলেজ নম্বর : ১২৫৩১
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-গ (দিবা)

পরীক্ষা তো এসেই গেল
কি যে করি ভাই!
কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা পড়ি
ভেবেই আকুল তাই!
সারা বছর দিলাম ফাঁকি
বুঝি এখন মজা!
পরীক্ষাতে করলে খারাপ
পেতেই হবে সাজা।

তুলনাহীন বাংলা

আফজাল মাহমুদ
কলেজ নম্বর : ৭৬৭৬
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-গ (দিবা)

বাংলা আছে ধানের শীষে
বাংলা আছে বনে,
বাংলা আছে মায়ের মনে
একাকারে মিশে।
বাংলা আছে পদ্মার জলে
বাংলা আছে শিশুর বোলে,
বাংলা আছে মায়ের কোলে
অবিরত দোলে।
বাংলা আছে নীল আকাশে
মুক্ত পাখির ডানায়,
বাংলা আছে গভীর জলে
মেঘনার কানায় কানায়।
বাংলা আছে রমণীর চোখে
নীল দরিয়ার মাঝে,
বাংলা আছে শীতল দিনের
নিঝুম শীতের সাঁঝে।
বাংলা আছে সবুজ প্রকৃতির
আবেগময়ী কায়ায়,
বাংলা আছে জ্যোৎস্না রাতের
বটবৃক্ষের ছায়ায়।
বাংলা আছে মধুসূদনের
কপোতাক্ষের ঘাটে,
বাংলা আছে জসীমউদ্‌দীনের
নকশী কাঁথার মাঠে।

জীবন

টি.এম রিফাত
কলেজ নম্বর : ১৫১০১৬২
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-গ (প্রভাতি)

জীবনতো নয় ঠেলাগাড়ি
ঠেলা দিলেই চলবে,
যেমন খুশি তেমন করে
পায়ের নিচে দলবে।
জীবন মানে স্বর্গীয় সুখ
অমূল্য যার দাম,
যোগ-বিয়োগে ভুল করলে
পথের ছেঁড়া খাম।
তাইতো বলি হিসেব করে
চলতে হবে পথ,
তা না হলে সবই বৃথা
বিফল মনোরথ।

আমার কলেজ

দাউদ ইব্রাহীম হাসান
কলেজ নম্বর : ১৪১৪৯
শ্রেণি ও শাখা : দশম-ঘ (প্রভাতি)

আমার কলেজ জ্ঞানের মশাল,
জ্ঞানের ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ পাঠশালা।
বিশাল মাঠ তার বিশাল প্রান্তর,
জ্ঞানে ভরা তার বৃহৎ অন্তর।
নিই যদি একটু কুড়িয়ে,
কোনোদিন যাবে না তা ফুরিয়ে।
এমন সৌভাগ্য সবাই কি পায়?
গৌরবে বুক ফুলে পরিপূর্ণতায়।
নেই কোনো সংঘাত, নেই হানাহানি,
যেন গোছানো পুষ্পদানি।
লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতিও আছে
পিতামাতার স্নেহ পাই টিচারদের কাছে,
প্রাণপ্রিয় এ কলেজের নাম জানো ভাই?
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
এদেশে যার কোনো তুলনা নাই।

পহেলা বৈশাখ

সাদমান ফুয়াদ মাহী
কলেজ নম্বর : ১৩৫১৩
শ্রেণি ও শাখা : দশম-খ (প্রভাতি)

চৈত্র গেল বৈশাখ এল
এল নতুন বছর,
একটি দিনেই করি মোরা
পান্তাভাতের কদর।
পান্তা খাব, ইলিশ খাব
আরও খাব পায়েশ,
চড়ব হরেক নাগরদোলায়
করব কত আয়েশ।
পায়জামা আর পাঞ্জাবিটা
পরব দেশি ঢঙে,
একতারাটি ধরব হাতে
ধরব মনের রঙে।

এই মাটিতে

তানজিরুল ইসলাম রাফি
কলেজ নম্বর : ৮১৬৩
শ্রেণি ও শাখা : দশম-খ (দিবা)

এই মাটিতে যতন করে
ফসল ফলায় চাষি,
এই মাটিতে মনের সুখে
রাখাল বাজায় বাঁশি।
এই মাটিতে নানা রঙের
কত যে ফুল ফোটে,
এই মাটিতে পাখ-পাখালির
নিত্য আহার জোটে।
এই মাটিতে বীর শহিদের
রক্ত মিশে আছে,
এই মাটিটা সবার থেকে
প্রিয় আমার কাছে।

আমরা নবীন

রিয়াজুল আজম
কলেজ নম্বর : ১৫১০৭১১
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-খ (প্রভাতি)

আমরা সবাই নতুন কুঁড়ি
ফুল হয়ে একদিন ফুটব,
আমরা আকাশের নতুন ঘুড়ি
অনেক উঁচুতে একদিন উঠব।
আমরা হব ন্যায়পরায়ণ
সততার সাথে বাঁচব,
আলো হোক বা আঁধার কালো
সত্যের পথে হাঁটব।

ভালোবাসি মা তোমায়

মোঃ জসীম উদ্দীন
কলেজ নম্বর : ১৫২০৮৫৯
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ক (দিবা)

ভালোবাসি মা তোমায়
তোমার দেশের মাটি,
সবুজ শ্যামল বাংলা
সোনার চেয়ে খাঁটি।
পেয়েছি কত আদর
খেয়েছি কত অন্ন,
তোমায় ভালোবেসে মাগো
হয়েছি আমি ধন্য।

তুমি আমার মা

যোবায়ের আহম্মেদ
কলেজ নম্বর : ১৫২০৮০৪
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ঘ (দিবা)

মা, এখনো মনে পড়ে সেদিনের কথা
যখন আমার বয়স ছিল ছয়
তখন ছিল আমার খুব ভূত-পেত্নীর ভয়।
সব মানুষের ঈর্ষাভরা চোখের সামনে
তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাতাম,
সেই রাত ছিল পূর্ণিমার রাত
আমার পৃথিবী শুধু তোমায় জানত মা।
আজ আমার বয়স আঠারো ছুঁই ছুঁই
তোমার থেকে অনেক দূরে মা
মা, তুমি আমার মা।

জীবন

অনির্বাণ বাড়ৈ
কলেজ নম্বর : ১৫২১১১৩
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ঘ (দিবা)

জীবন এক উপন্যাস, এক অগোছালো বিন্যাস,
কিছু ঘটনার মিলনমেলা।
কিছু স্বপ্নিল আশা, কিছু রঙিন ভালোবাসা,
কিছু তেতো, কিছু মিষ্টি, কিছু বর্ণিল ঘটনার কৃষ্টি
চরে প্রায় বেলা-অবেলা।
কিছু দুঃখ, কিছু সুখ, কিছু হাসি, কিছু কান্নার মুখ,
এটাই জীবনমেলা।

মা

ফেরদৌস আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৪২৮৯
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-চ (প্রভাতি)

ত্রিভুবনে মায়ের মতো
দরদি কেউ নাই,
মায়ের বুকে রাখলে মাথা
স্বর্গ খুঁজে পাই।
মা-জননী থাকলে পাশে
ঝরে পড়ে সুখ,
থাকে না আর দুঃখ-ব্যথা
শীতল হয় যে বুক।
মা হল বেহেস্তের চাবি
সর্বশাস্ত্রে কয়,
মায়ের আশিস পেলে জীবন
হয় যে মধুময়।

গল্প নয়তো সত্য

মোঃ রায়হানুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৮২৫৬
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ঘ (দিবা)

গল্প নয়তো সত্যরে ভাই, গল্প নয়তো সত্য–
বিশালাকার মাঠ যে তাহার,
পাখপাখালির হরেক বাহার,
তারি মাঝে কিশোর শিশুর,
মেলা বসে নিত্য,
গল্প নয়তো সত্যরে ভাই, গল্প নয়তো সত্য।
এমন বিশাল আকাশ তুমি কোথায় পাবে ভাইরে,
বাগানঘেরা এমন নিবাস, আর যে কোথাও নাইরে।
দূর্বাঘাসের সবুজ চাদর, জুড়াবে তোমার আঁখি,
সকাল-সাঁঝে মন রাঙাবে, হরেক রঙের পাখি।
দেখলে তুমি অবাক হবে, মৃগশাবকের নৃত্য,
গল্প নয়তো সত্যরে ভাই, গল্প নয়তো সত্য।
হরিৎ ঘাসের বক্ষ চেরা, মেঠো পথের বাঁকে,
কয়েক যুগের সোনালি অতীত, উঠবে তোমায় ডেকে।
সেই সে এমন কলেজ বল, কার না হবে ব্রত?
গল্প নয়তো সত্যরে ভাই, গল্প নয়তো সত্য।

সোনার বাংলাদেশ

নাহিয়ান হাবিব
কলেজ নম্বর : ৬৩৮১
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-গ (দিবা)

বসন্ত এসে গেছে এনেছে নতুন প্রাণ,
সবার কণ্ঠে শুনতে পাই নতুনেরই গান।
চারিদিকে নানান রঙ, নানান কোলাহল,
নতুন কিছুর আহ্বানে সবাই মিলে চল।
হতে হবে ভালো কিছু, খারাপ কিছু নয়,
ভালো জিনিস দিয়েই আমরা করব বিশ্বজয়।
দেখবে বিশ্ব, জাগবে দেশ, এটাই আমরা চাই,
এর জন্য পরিশ্রমের বিকল্প কিছু নাই।
চল সবাই মিলেমিশে গড়ি মোদের দেশ,
তবেই হবে আমাদের সোনার বাংলাদেশ।

স্মৃতিরেখায় ফাল্গুন

মোঃ সাঈদ হাসান রিফাত
কলেজ নম্বর : ৮২৯৯
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ঙ (দিবা)

ফাল্গুন যখনই ফিরে আসে
মনের ক্যানভাসে তখন
ভেসে ওঠে কিছু ছবি।
রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার
সেদিন ছিনিয়ে এনেছিল বাংলাকে।
তাদের তাজা রক্তের ছোপ
এখনও লেগে আছে পতাকায়
ফাল্গুনে মনে পড়ে যায়।

দুরন্ত পথিক

শুভ্র বিশ্বাস
কলেজ নম্বর : ৮২৯০
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-চ (দিবা)

দুরন্ত পথিক চলল আবার
দুর্গম পথ দিয়ে,
যে পথে খেলল কত না খেলা
বিভীষিকা তাকে নিয়ে।
তবু ভয় নাই দুরন্ত পথিকের
সামনে আগাতে যায়,
মরার মতো মরতে পারলে
হবে নতুন জীবনে ঠাঁই।
নিজের জীবন দিয়ে অন্যের জীবন
গড়া হল তার কাজ,
আসুক যতই বিপদ সামনে
আছে অকুতোভয়ের তাজ।

আর্টিস্ট: আহমাদ আব্দুল্লাহ
কলেজ নম্বর : ৭৯৬৭ শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-খ (দিবা)

গল্প ও ভ্রমণকাহিনি

একটি গরিব ছেলে

এইচ. এম. ফাহাদ আবির
কলেজ নম্বর : ১৫১০০০৩
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-গ (প্রভাতি)

এক ছিল খুব গরিব ছেলে। সে একটি স্কুলে কাজ করত। কোনোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকত সে। কিন্তু গরিব হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল সৎ। একদিন ছেলেটির বাবা তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে খবর দিল যে, তার মা মারা গেছে। ছেলেটি সব কাজকর্ম ছেড়ে তার গ্রামের বাড়ি চলে গেল।

মায়ের সৎকার করে সে আবার শহরে ফিরে এল। কিন্তু যখন সে ফিরে এল তখন দেখল যে, তার চাকরিটা চলে গেছে। সে মনে খুব দুঃখ পেল। মনের দুঃখে সে রাস্তায় হাঁটতে লাগল। ছেলেটি জানে না সে কোথায় যাবে, কী করবে? হঠাৎ সে রাস্তায় একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেল। ব্যাগ খুলে দেখল তার ভিতরে অনেক টাকা। সে ভাবল– যার ব্যাগ হারিয়ে গেছে সে অনেক দুশ্চিন্তায় আছে। তাই সে ব্যাগটা নিয়ে থানায় গেল। ব্যাগের যিনি মালিক তিনিও এ পুলিশস্টেশনেই ছিলেন। তিনি তাঁর হারানো ব্যাগ পেয়ে গেলেন। পুলিশ ছেলেটির সততা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন– তুমি কেন টাকার ব্যাগ ফেরত দিলে? ছেলেটি জবাব দিল– আমার মা সবসময় বলতেন– অন্যের জিনিসে লোভ করতে নেই। তাই ব্যাগটি ফেরত দিলাম। ব্যাগের মালিক খুশি হয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলেন ও বললেন– তুমি অনেক সৎ। আজ থেকে তুমি আমার অফিসে কাজ করবে। ছেলেটি বলল– ধন্যবাদ। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সেই থেকে ছেলেটি সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করতে লাগল। তাকে আর কোনোদিন দুঃখ পেতে হয় নি।

শত্রু থেকে বন্ধু

আব্দুল নুর খান ওয়াসি
কলেজ নম্বর : ১৫২০০২২
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-গ (দিবা)

এক শহরে একটি বিখ্যাত স্কুল ছিল। সেই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে দুজন ছাত্র ছিল। তাদের একজনের নাম হল মিঠু আরেকজনের নাম টিটু। তারা ছিল খুব দুষ্টু। তারা একজন আরেকজনকে একদম পছন্দ করত না। সবসময় ঝগড়া করত। শিক্ষকদের কাছে একজন আরেকজনের নামে অভিযোগ দিত। একজন ক্লাসে শাস্তি পেলে অপরজন হাসত, মজা পেত। টিফিন পিরিয়ডে মারামারি করত।

একদিন হঠাৎ মিঠু স্কুলে আসল না। টিটু চিন্তায় পড়ে গেল। ক্লাসে তার মন বসল না। টিফিন পিরিয়ডেও সে কারো সাথে খেলা করল না। পরের দিনও যখন মিঠু আসল না তখন টিটু আরো চিন্তায় পড়ে গেল। তার কিছুই ভালো লাগে না, একা একা লাগে। দুদিন পর যখন মিঠু স্কুলে এল, তখন টিটু দেখল মিঠুকে খুব অসুস্থ লাগছে। কিন্তু লজ্জায় সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। টিফিন পিরিয়ডে মিঠু মাঠে নামতে গিয়ে পড়ে যেতে লাগল। টিটু দৌড়ে এসে তাকে ধরে উঠিয়ে দিল। মিঠু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল, কিছু বলল না। ক্লাসের ছুটির সময় টিটু নিজ ডায়েরি থেকে মিঠুকে দুদিনের পড়া তুলে দিল। মিঠু মুচকি হেসে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

পরের দিন ক্লাসে দুজন আর ঝগড়া করল না, একসঙ্গে বসল, তাদের বন্ধুত্ব হল। এভাবে তারা একজন আরেকজনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হয়ে গেল।

বোকা জোয়ান ও বুদ্ধিমান বৃদ্ধ

মেহেদী ইমাম শিবলী
কলেজ নম্বর : ৮১৪৫
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-ক (দিবা)

একদিন এক বৃদ্ধ লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক দুর্বল, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে এক জোয়ান লোকের দেখা হল। জোয়ান লোকটি ছিল অনেক শক্তিশালী, কিন্তু বোকা। জোয়ান বৃদ্ধকে বলল– "এই বৃদ্ধ, তোর চেয়ে আমার শক্তির জোর হাজার গুণ বেশি। আমার সাথে বাজি লাগবি?" বৃদ্ধ লোকটি শান্তভাবে বললেন– "হ্যাঁ, অবশ্যই আমি বাজি লাগব, কিন্তু মনে রেখো শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর সবসময় অনেক বেশি হয়।" জোয়ান লোকটি বলল– "বেশ, দেখা যাক, তোর বুদ্ধির জোর কতটা বেশি।"

এরপর বৃদ্ধ লোকটি বললেন– "তোমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এই রুমালটি রাস্তার ওপারে ঢিল দিয়ে পাঠাও তো দেখি।" বোকা জোয়ান লোকটি অনেকবার চেষ্টা করল, কিন্তু সে প্রত্যেকবারই বিফল হল। তখন সে হার মেনে নিল। বৃদ্ধ লোকটি তখন নিচ থেকে একটি পাথর কুড়িয়ে নিলেন। তারপর রুমালটির সঙ্গে পাথরটি পেঁচিয়ে নিলেন। এরপর তিনি প্রথম ঢিল দিয়েই রুমালটি ওপারে পাঠিয়ে দিলেন। সেই বোকা জোয়ান লোকটি বৃদ্ধের সামনে খুব অপমানিত ও লজ্জিত হল। সে তখন বুঝল– শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর অনেক বেশি।

পাখির বাচ্চা

আহনাফ তাহসিন
কলেজ নম্বর : ৮০৪০
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-গ (দিবা)

একদিন এক ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। সে যাওয়ার সময় একটি পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনল। সে সেই আওয়াজের পিছনে পিছনে গেল। সে দেখল– একটি গাছের নিচে একটি পাখির বাচ্চা পড়ে আছে। পাখির মা তার বাচ্চাকে না পেয়ে অনেক ছটফট করছে। সে ভাবল– এ পাখির বাচ্চাকে গাছে উঠে তার মায়ের কাছে দিয়ে না এলে বিড়াল খেয়ে ফেলবে। সে কিন্তু গাছে উঠতে পারে না। গাছে উঠতে গেলে আবার বাড়ি যেতে দেরি হবে। তবু সে ভাবল– মা রাগ করলে করবে, পরে বুঝিয়ে বলব।

সে পাখির বাচ্চাকে তার পকেটে ঢুকিয়ে অনেক কষ্ট করে গাছে উঠল এবং পাখির বাসায় রেখে দিল। এরপর সে গাছ থেকে নেমে বাড়ি ফিরল। মা একটু রাগ করে বললেন– এত দেরি করেছিস কেন? ছেলে বলল– মা, আমি ফেরার পথে একটি গাছের নিচে একটি পাখির বাচ্চা পড়ে ছিল। আমি পাখির বাচ্চাকে পাখির বাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছি। তাই আমার দেরি হয়েছে। এ ভালো কাজের কথা শুনে ছেলেটির মা অনেক খুশি হলেন।

গল্প

চোরের সাজা

সাফায়েত সিদ্দিকী
কলেজ নম্বর : ১২৯৯০
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-খ (প্রভাতি)

এক ছিল বুড়ি। বুড়ির ছেলেপুলে কিছুই ছিল না। সারাদিন দাওয়ায় বসে চরকায় সুতা কাটত। হাটের দিনে সেই সুতা লোকেরা কিনে নিয়ে যেত। এমনি করে তার দিন কাটত। পাড়াপড়শিরা বলত– বুড়ির অনেক টাকা-পয়সা, সোনা-দানা আছে। থাকলে কী হবে, বুড়ি ছিল দারুণ হাড়কিপটে। একটি পয়সাও খরচ করত না। কোনো ভালো খাবারও কিনে খেত না। কোথায় যে তার সোনা-দানা, টাকা-কড়ি রেখেছে, তা কেউ জানত না। অনেক রাত অবধি বুড়ি সুতা কাটত। চরকার 'ঘটর ঘটর' আওয়াজ অনেক দূর থেকে শোনা যেত।

একদিন রাতে সুতা কাটার সময় নানান কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ির চোখদুটি ঘুমে জড়িয়ে এল। হঠাৎ বাইরে 'ঘট' করে একটা আওয়াজ হল। বুড়ির ঘুমের ভাবটা ছুটে গেল। সে চোখ মেলে তাকাল। ঘরের মাঝে ঘুটঘুটে আঁধার। সে কান পেতে চুপ করে রইল। ঘরের পেছনে চোর দাঁড়িয়ে আছে– বুড়ি তা বুঝতে পারল। সে মেনি বিড়ালটাকে ডেকে বলল– "হ্যাঁ রে মেনি, আজ কুটুমবাড়ি থেকে যে নতুন গুড়ের হাঁড়ি এসেছে সেটা তো ঘরে আনতে ভুলে গেছি। ওটা রান্নাঘরে ফেলে এসেছি। হায় রে, কি যে ভুলো মন আমার।" নতুন গুড়ের কথা শুনে চোরদের জিভে পানি এল। গুড়ের হাঁড়ি তারা সাবাড় করে ছাড়বে। চোর দুজন তাড়াতাড়ি ছুটল। হেঁসেল ঘরের কানাচে যে মোটা হাঁড়িটা ছিল তাতে থাকত ঘর নিকানোর মাটি ও গোবর। চোর দুজন গিয়ে সেই গোবর আর মাটি মুখে দিয়ে ওয়াক থু, ওয়াক থু করে উঠে দাঁড়াল। ছি ছি গোবর আর মাটি! উঃ কী ঠকামি!! কী ভীষণ বোকা তারা !!!

চোর দুজন আবার বুড়ির ঘরের পেছনে এসে দাঁড়াল। তারা শুনতে পেল বুড়ি তার মেনি বিড়ালটাকে বলছে– "হ্যাঁ রে মিনি, গুড়ের হাড়িটা যে সাঁঝের বেলায় ঘরে এনে রেখেছি। সে কথা একেবারেই মনে ছিল না। তবে ভুল একটা করেছি বটে, আজ টাকার থলিটা কোথায় যে রেখে এসেছি কিছুই তো মনে পড়ছে না। ও ঘরে মাটির যে বড় গামলাটা রয়েছে তার মধ্যে রেখে আসি নি তো। হু, হু, তাই তো বটে– রেখেই এসেছি! ইশ্! কি ভুলটা যে করেছি। আজকাল চোরের দাপট। হঠাৎ থলিটা যদি নিয়েই যায়, গরিবের যা-কিছু ছিল সবই গেল।" বুড়ির কথা শুনে চোরেরা ছুটল মাটির গামলাটা খুঁজতে। হেঁসেল ঘরের কোণে গামলাটা দেখতে পেয়ে তারা এবার ভারি খুশি। বুড়ির টাকাকড়ি সব তার থলের মাঝে। সেই থলেটা রয়েছে কি-না ওই মাটির গামলায়। এবারে ভারি মজা। আজ অনেক টাকা দুজন পেয়ে যাবে। আজ থেকে তাদের অভাব-দুঃখ আর থাকবে না। দুজনে বগল বাজাবে আর খুব ঘটা করে খরচ করবে। দুজন একসঙ্গে গামলায় হাত দিল। গামলায় ছিল কৈ আর শিং মাছ। হাত দিতেই মাছগুলো কাঁটা বিঁধিয়ে দিল। চোর দুজনে তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিল। উঃ! কাঁটার যাতনায় তারা যে কী করবে ভেবে পেল না। চোর দুজন লাফালাফি ছুটোছুটি শুরু করে দিল। উঃ! বুড়িটা কী শয়তান– তাদের দুজনকে কী হয়রানিই না করছে! তাদের এমন রাগ হতে লাগল যে, বুড়ির মাথাটা তারা চিবিয়ে খেতে ইচ্ছা করল।

এবার বুড়ি তার মেনি বিড়ালটাকে ডেকে বলল– "হ্যাঁ রে মিনি, তোর সঙ্গে আর আমি পেরে উঠছি না। টাকার থলিটা কাপড়ের পুঁটলির সঙ্গে লেবুগাছের ঝোপের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিস তা তো আমাকে আগে বলিস নি। সেই থেকে আমি ভেবে মরছি। যা দিনকাল হয়েছে– চোর-ডাকাতরা চারদিকে ঘুরছে। কখন যে কী হয় বলতে পারা যায় না।" চোর দুজন হাতের যাতনা ভুলে গেল। তারা এবারে ছুটল লেবুগাছের দিকে। লেবুগাছের গোড়ার দিকে একটা ভিমরুলের চাক ছিল। সেই চাকটাকে তারা আঁধারের মাঝে মনে করল কাপড়ের পুঁটলি। এই পুঁটলির সাথে টাকার থলেটা আলবত আছে। টাকাকড়ি তারা যা পাবে তা দুজনে ভাগাভাগি করে নেবে। কেউ কাউকে একটি পয়সাও ঠকাবে না। বড় চোর আর ছোট চোর দুজনে কাপড়ের পুঁটলি ভেবে যেই ভিমরুলের চাকটায় দিল হাত ঢুকিয়ে, আর যায় কোথায়। ভিনভিন করে ভিমরুল বের হয়ে দুজনকে হুল ফুটাতে আর কামড়াতে শুরু করল। হাতে, পায়ে, কপালে, মুখে, পিঠে, পেটে কোথাও ফাঁক রইল না। চোর দুজন লাফাতে লাফাতে চিৎকার করতে করতে পাড়া ছাড়ল। এমন ঠকা কোনোদিন তারা ঠকে নি– এমন বোকা কোনোদিন তারা হয় নি।

জামু

মুন্সি আল আরাফাত
কলেজ নম্বর : ৬৫০৭
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-গ (দিবা)

কুমিল্লা জেলার লাজের গ্রামের এক ছেলের নাম ছিল জামু। তার অবশ্য একটা ভালো নাম ছিল। গ্রামের কোনো মানুষই তাকে তার আসল নামে ডাকে না। এমনকি তার মা-বাবাও না। কারণ গ্রামের কেউই তার এই নামটি জানত না। অনেক খুঁজে একজন বৃদ্ধলোককে পেলাম, যিনি আমাদের বললেন যে, জামুর আসল নাম হচ্ছে জামাল। এই বৃদ্ধ লোকটি জামুর বাবার বন্ধু। তবে এখন আর তাদের দুজনের মধ্যে তেমন কোনো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

আসলে জামুর এই নামের পেছনে লুকিয়ে আছে এক বিশাল রহস্য। ছোটবেলা থেকেই সে নাকি জাম্বুরা খেতে খুব ভালোবাসত। জামুর বাড়ির সামনে ছিল ৩টি জাম্বুরা গাছ। জামু জাম্বুরা খেতে পছন্দ করে বলে তার বাবা আরও ১টি জাম্বুরা গাছ কিনে এনে লাগায়। এই ৪টি গাছের ৪-৫টি জাম্বুরা পায় তার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন। বাকি সব খায় জামু। আর এসব দেখে জামুর এক প্রতিবেশী বন্ধু তার নাম দেয় জাম্বু। ধীরে ধীরে জাম্বু থেকে তার নাম হয় জামু।

জামু ছিল খুবই চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে। সে মানুষকে ভয় দেখাতে ও মজা করতে খুব ভালোবাসত। এছাড়া যে কথা একবার বলত সে তা করেই ছাড়ত। জামু লেখাপড়ায় ভালো না থাকলেও সৃজনশীল কার্যকাণ্ড খুব ভালোই করতে পারত। এতে সে আমাদের হারিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করত। এবার জামুর কয়েকটা সৃজনশীল কাজের কথা বলি।

ছোটবেলা থেকেই জামুর নিশানা ছিল প্রখর। একদিন জামু আমাদের সাথে বাজি ধরল যে, আমরা কেউই এক চেষ্টায় একটি মাছি মারতে পারব না। কিন্তু সে এক চেষ্টাতেই একটি মাছি ধরতে পারবে। বাজি ছিল পাঁচ টাকা। আমরা ছিলাম সাতজন। তার মানে আমরা জিতলে জামু ৩৫ টাকা দিবে আর সে জিতলেও সমান পাবে। তার কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল। আমরা কেউই একটি মাছিও ধরতে পারলাম না, মারা তো দূরের কথা। তবে জামু একবারেই দুটি মাছি ধরে একটিকে মেরে অন্যটি রেখে দিল। আমরা টাকা দিতে গেলে সে বলে– ছেড়ে দে, মজা করেছি। তখন আমরা চলে গেলাম।

আধ ঘণ্টা পর জামু আমাদের ডেকে নিয়ে গেল কী একটা দেখাবে বলে। আমরাও গেলাম তার সাথে। দেখলাম– একটি কাচের বাক্সের ভেতরে একটি বালুর উড়োজাহাজ তৈরি করা। আমরা দেখে তো অবাক। বালু দিয়ে আবার কিছু তৈরি করা যায়? তখন জামু বলল, এর ভেতরে নাকি ঐ মাছিটি আছে। আমার তখন বিশ্বাসই হল না। তখন জামু বলল, এর কাছে কান দে। কান দেয়ার পর জামু বলল, কিছু শুনতে পাচ্ছিস। আমি উত্তরে যখন না বললাম। তখন জামু বাক্সটি খুলে আমাকে কান দিতে বলে। কান দিতেই আমি মাছির ডানা থেকে উৎপন্ন শব্দ শুনতে পেলাম। এটাতো মোটামুটি অসম্ভব। কিন্তু জামু যে এটা কীভাবে করেছে তা বুঝতেই পারি নি। এরপর উঠে আমি বাক্সের উপর ২-৩টি টোকা মেরে বাক্স খুলে কান দিতেই আবার মাছির শব্দ শোনা গেল। আমি ভাবলাম জামু আমাদের সাথে চালাকি করেছে। বায়ু ছাড়া প্রাণী বাঁচে না। আর বালু দিয়ে কিছু বানানো যায় না। নিশ্চয়ই বালুর নিচে কোনো প্লাস্টিক আছে। এই ভেবে আমি সেই বালুর নিচে উড়োজাহাজে হাত দিতেই তা ভেঙে পড়ল ও মাছিটি বেরিয়ে এল। এটা অবশ্যই সৃজনশীল কাজ।

একবার জামু তার মায়ের কাছে পাঁচশত টাকা চাইলে তার মা তাকে একশত টাকা দেন। পরে জামু কান্নাকাটি করে আরও একশত টাকা পায়। পরে সে তার বাবার কাছে তিনশত টাকা চাইলে তার বাবা তাকে দুইশত টাকা দেন। এখন তার চাহিদার বাকি মাত্র একশত টাকা। আমরা বন্ধুরা জামুকে মোট পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি। বাকি পঞ্চাশ টাকা জামু তার প্রতিবেশী মতিন চাচার কাছে ধার নেয়। এই পাঁচশত টাকা দিয়ে জামু কতগুলো ব্যাটারি, রঙিন কাগজ, ছোট ছোট বাল্ব ও প্লাস্টিক কিনল। এইসব মিলিয়ে জামু পঞ্চাশটি অদ্ভুত খেলনা বানায়। ঐসব খেলনায় পাখা চলত, লাইট জ্বলত, আবার হাঁটত। তার খেলনাগুলো সবারই প্রিয় ছিল। তাই খুব শীঘ্রই জামুর বানানো খেলনাগুলো বিক্রি হয়ে যায়। বাকি ছিল একটা। জামু তা একটি অনাথ বাচ্চাকে দিয়ে দিল।

আত্মব্যবচ্ছেদ

রাওভিল নাসিফ
কলেজ নম্বর : ৭৬৮৯
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-খ (দিবা)

হুমায়ূন আহমেদের গল্প 'মি' পড়ছিলাম। এমন সময় ম্যাসেজ নোটিফিকেশন এল। ম্যাসেজটা ফেইসবুকে এসেছে। হোয়াটস অ্যাপের শব্দ এটা নয়। গল্পটা প্রায় শেষের দিকে। রাখতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু মাথার মধ্যে ঘুরছে ম্যাসেজটা কে পাঠাল। বই রেখে মোবাইল তুললাম। 'আত্মহত্যা করব ঠিক করেছি, বুঝেছ'। পাঠককুলের ভালো বোঝার কথা কারা কোন্ অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত নেয়। আমি শকড্ হলাম। কিছু বলা দরকার, কিন্তু মাথায় কিছু আসছে না।

আত্মহত্যা কী? জানেন তো? এর যেমন ভালো দিক আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। এগুলো নিয়ে ভাবুন। নাহলে কেমনে হবে। জীবনতো প্রায় শেষ। এখন না ভাবলে...। প্রথমে দেখতে হবে আপনার সাহসের পরিমাণ কত সের? আপনার আত্মহত্যার ফলে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং কারা লাভবান হচ্ছে? আর আপনার লাভ বা ক্ষতি কতটুকু? যদি ইন্টিগ্রেশন করে দেখেন আপনার লাভের পরিমাণ বেশি তবে করে ফেলুন। কারণ মানুষ যদি নাই মারা যেত তবে পৃথিবীর পক্ষে সম্ভব হত না সৃষ্টির শুরু থেকে যত মানুষ এসেছে তাদের স্থান দেয়া। সেই দিক দিয়ে আত্মহত্যা করা ভালো। কিন্তু প্রকৃতি খুব ভালোভাবে জানে কীভাবে নিজেকে সাম্যাবস্থানে রাখতে হয়। সেই মতো আপনার মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই নিয়ম ভঙ্গ করলে তা আপনার জন্য ভালো হবে না।

- কেন এই ডিসিশন নিলেন?

- শিক্ষক পরীক্ষার হল থেকে বের করে দিয়েছেন, অপমান করেছেন, খাতায় কিচ্ছু লিখি নি। নির্ঘাত ফেইল।

- এইটাতো এখন ভেবে লাভ নেই। বাদ দিন। ধরি, আপনি আত্মহত্যা করলেন। জীবন একেবারে তামা তামা। কিন্তু টিচারের কী আসল গেল?

- এমন কিছু করেন যেন একদিন টিচারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিতে পারেন। এর থেকে বেশি আর কী আশা করতে পারেন?

- আমি যে অত ভালো ছাত্র নই। জীবন নিয়ে একরকম হতাশ।

- হতাশা ভেঙে ফেলুন। ভালো করতে হলে গোল্ডেন লাগবে কে বলল? গল্প শুনবেন?

- নাহ্, মুড নেই।

- শুনেই দেখুন না। যোগ্য প্রার্থী পেয়েছি কি-না। আপনারই খোঁজ করছিলাম।

- ঠিক আছে। বল।

- মন দিয়ে শুনুন। মাথায় অ্যাবজর্ব করে রাখুন। জীবনে কিছু করতে পারবেন না– মনে হলেই গল্পটা মাথায় আওড়াবেন।

গল্প:

বাংলাদেশি ছাত্র সাজ্জাদুল ইসলাম। উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া। গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাস্টার অব ইনফরমেশন টেকনোলজি'তে এমএস করছিলেন। এমএসের শেষ ইয়ারে একটা প্রজেক্ট ও সফটওয়্যার প্রদর্শনী হত। সাজ্জাদকেও প্রজেক্ট দিতে হবে। তিনমাস খাটাখাটুনি করে তিনি একটি প্রজেক্ট তৈরি করলেন। প্রদর্শনীর দিন এল। গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটির হলরুমে সমস্ত শিক্ষক আর সিলেকশন বোর্ডের সামনে একে একে সমস্ত গ্রুপের প্রজেক্ট প্রদর্শন করা হচ্ছিল। সাজ্জাদও তাঁর প্রজেক্ট প্রদর্শন করেন। তাঁর প্রজেক্ট এত ভালো হয় যে, তাঁকে শিক্ষকরা ১০০ তে ৯৭ মার্কস দেন। আর এটা ছিল ঐ ইউনিভার্সিটির গত ৪৭ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মার্কস। আনুষ্ঠানিকভাবে ইতিহাস ভাঙার ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলরুমে সেদিন বাজানো হল বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। হাতে লাল-সবুজ পতাকা আর বুকে সমগ্র সবুজ বাংলাকে ধারণ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গর্বিত সাজ্জাদ। নিজেকে সফল করার জন্য নয়– এই কান্নায় ছিল দেশকে উপরে তুলে ধরার এক অপার্থিব আনন্দ। আর এখানেই বিজয়গাথা শেষ হয়ে যায় নি। অস্ট্রেলিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে প্রথম স্থান অধিকার করে সাজ্জাদের প্রজেক্ট। সেদিন কী হয়েছিল জানেন? হাজার হাজার সফটওয়্যার নির্মাতার সামনে পুরস্কার গ্রহণের সময় অস্ট্রেলিয়ার উপর উড়ছিল বাংলাদেশের পতাকা। কল্পনা করুন তো দৃশ্যটা? সাজ্জাদের স্থানে নিজে থাকলে সহ্য হত এই দৃশ্য? সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন? যদি তিনি কোনো কারণে কলেজে আত্মহত্যা করতেন, তবে কী দেখতে পারতেন এই দৃশ্য?

Mind it, You never know what comes next...

পুনশ্চঃ সুইসাইড করার মতো সাহস যদি হয়েই যায় আপনার, একবার ভেবে দেখবেন– আপনি না হয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, কিন্তু আপনার মা। তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। নিশ্চয়ই কুলখানির আয়োজন করে খেতে বসবেন না। ভাবুন, দেখবেন কেমন লাগে। কারণ সময়শেষে কিছুই করার থাকবে না।

আধুনিকতা

মোঃ সামিউল হক
কলেজ নম্বর : ১৫১১০১৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ঙ (প্রভাতি)

আজ হাসাবের চোখ দিয়ে আর পানি পড়ে না। সব পানি শুকিয়ে গেছে। তাকে সমবেদনা দেয়ার মতো আর কেউই নেই। অথচ কয়েক বছর আগের কথা। ধনী বাবার একমাত্র সন্তান হাসাবের মানসিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তার বাবা হাসেম দেশে-বিদেশে একাধিক শিল্প-কারখানার মালিক। সবাই তাঁকে এক নামে চিনত। হাসাবের মা মোটামুটি সহজ সরল মানুষ। তাঁর স্বামীর ব্যবসার এত প্যাঁচ তাঁর মাথায় ঢোকে না। তাঁর আবার হাঁপানীর সমস্যা ছিল। যার জন্য ইনহেলার ব্যবহার করতে হত। যাই হোক সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো হাসাবকে কখনই কষ্ট সহ্য করতে হয় নি। প্রায় সবসময় গাড়িতে চলাফেরা করে। তাই তার পা জোড়াও খুব কমই মাটির স্পর্শ পেয়েছে। ছোটকাল থেকেই তার বেড়ে ওঠা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে। চুল বড় রাখা, কানে রিং পরা, হাতে ব্যান্ড লাগানোর মত বদ অভ্যাস তো ছিলই। তাছাড়া সিগারেটও টানত মাঝে-মধ্যে বন্ধুদের সাথে। প্রথমে ঢাকার নামকরা স্কুলে ভর্তি হলেও এ কুস্বভাবের জন্য তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। কিন্তু তার আচরণের পরিবর্তন হয় নি।

পরে সে একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হয় যার গভর্নিং বডির প্রধান তার বাবা। তাই শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ কেউ তাকে কখনো কিছু বলতেন না। তার অসৎ কাজগুলোতে আর কেউ বাধা দেয়ার থাকল না। তার অবস্থা এমন পর্যায়ে গেল যে, ইভটিজিং এর মতো অপরাধে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তার পরিচয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

ইতোমধ্যে এই ঘটনা জানাজানি হলে তার বাবার মানসম্মান নষ্ট হয়। কেননা তার বাবার বন্ধু-ব্যবসায়ী যাঁরা আছেন তাঁদের সন্তানরা মোটামুটি ভদ্র। কিন্তু হাসেম সাহেবের মতো ব্যক্তির ছেলের এ অবস্থা দেখে সবাই বিস্মিত। তাই এবার হাসেম সাহেব ছেলেকে অনেক কড়া শাসনে রাখলেন। কিন্তু সে কি শাসন মানে? কথায় আছে– দড়ি দিয়ে গরু-ছাগল আটকানো যায়, মানুষ না। তাই হাসাব তার বাবার আচরণে ভীষণ রুষ্ট হত। কিন্তু কিছু বলতে পারত না। তার মা তাকে জ্ঞান দিতে আসলে উল্টো তাঁকেই কথা শুনিয়ে দিত। এভাবেই চলছিল তার সবকিছু। বন্ধু-বান্ধবরা তাকে বলত যে, তার বাবা-মা না থাকলে সেই এই বিশাল সম্পত্তির মালিক। তাই সম্পত্তি ও অতিরিক্ত স্বাধীনতার লোভে সে তাঁদের বিয়োগ কামনা করত।

একদিন রাতের বেলা ঘরে হাসেম সাহেব ছিলেন না। তাই মা হাসাবকে তাঁর নিজের রুমে শুতে বললেন। কেননা ছেলে একা থাকলে রাতে হেডফোনে গান শুনবে কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। হাসেম সাহেব অবশ্য প্রায়ই ছেলের সাথে থাকতেন। রাতে হাসাব নিজের ঘরে ঘুমাতে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল যেন মা তার রুমে আসতে না পারেন। যথারীতি সে সারারাত হেডফোন দিয়ে গান শুনে কাটিয়ে দিল। ঘুম থেকে সে উঠল দুপুর ১২টায়। ঘুম ভাঙার পর দেখল– চারদিকে কেমন পিনপতন নীরবতা। নিচতলায় রহিমা খালার কাজ করার শব্দ এ রুম থেকে শোনা যাচ্ছে। পরে তার মনে পড়ল– সে দরজা লাগিয়ে

ঘুমিয়েছিল। দরজা খুলে দেখল যে, মায়ের ঘরেও কেমন সুমসাম নীরবতা। মেঝেতে ভাঙা ফুলদানি, ভাঙা গ্লাস। অ্যাকুরিয়ামের উপরও কিছু ছুঁড়ে মেরে ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে। বালিশগুলো মেঝেতে পড়া। বিছানার চাদর অর্ধেক উপরে অর্ধেক নিচে। সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। চারপাশ দেখার পর সে বিছানার ঐপাশ দেখে আঁতকে উঠল। দেখল– উল্টো হয়ে নিচে পড়ে আছেন তার মা। মুখ নীলবর্ণ ধারণ করেছে। হাতে মুষ্টিবদ্ধ বিছানার চাদর। সে চিৎকার দিয়ে রহিমা খালাকে ডাকল। রহিমা তাঁকে বিছানায় তুললেন। আবুল চাচা পরিস্থিতি দেখে ডাক্তার নিয়ে আসলেন। ডাক্তার সব পরীক্ষা করে বললেন– "শী ইজ ডেড। শ্বাস আটকে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।"

যেন পুরো আকাশটা হাসাবের ওপর ভেঙ্গে পড়ল। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হল না। চোখ দিয়ে কেবল বোবা মানুষের মতো পানি পড়তে লাগল। সে তখন বুঝতে পারল যখন তার মায়ের হাঁপানির টান উঠেছিল তখন ইনহেলার ব্যবহার করার জন্য তার দরজায় নক করেছিল। অবস্থা চরমে পৌঁছালে জিনিসপত্র ছুঁড়ে শব্দ করেছিল। কিন্তু কানে হেডফোন থাকায় সে কিছুই আঁচ করতে পারে নি।

এরপর হয়তো হাসাব শুধরে যাবে, কিন্তু সে যা হারাল তা তো আর কখনই ফিরে পাবে না। আধুনিকতা আমাদের অনেক কিছু দিলেও অনেক মূল্যবান কিছু কেড়েও নিয়েছে। হাসাবের মতো যারা এর অপব্যবহার করছে তাদের জন্য এটা অভিশাপ।

সাফেল্যের চূড়ায়

ফায়েদ রায়হান
কলেজ নম্বর : ৬৬৩১
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-চ (প্রভাতি)

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। রাজীবের আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। আনন্দ হবারই কথা। তার জীবন যে আর আগের মতো দুঃখ নেই। এখন আছে ভরসা আর বিশ্বাস। খুব বেশি দিন হবে না। কয়েক মাস আগেও সে ভাবছিল কী করে কাটবে তার জীবন। না আছে চাকরি, না চলছে তার পরিবারের দিন। এই বৃষ্টির দিনে তার এ আনন্দ শোভা পায় না। হয়তো তাই লোকাল বাসের কাচে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দেখতে দেখতে খুব কষ্টের মুহূর্তগুলো ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে তার। এই এয়ারপোর্ট রোডেই সে কতবার যাওয়া-আসা করেছে। সে তার ট্যাক্সিতে করে কত যাত্রীকে এখানে নামিয়ে দিয়েছে। আবার এখান থেকে নিয়েও গিয়েছে। কিন্তু আজ সে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে যাত্রী হয়ে। সবেমাত্র তার মাস্টার্সের পড়াশুনা সে শুরু করেছে। সে জানে মাস্টার্স কমপ্লিট হলে আরও ভালো সরকারি চাকরি পেতে পারে। কিন্তু আগের সুযোগটাও মন্দ ছিল না। পড়াশুনার পাশাপাশি তার ও তার পরিবারের পেট চালানোর জন্য টাকা তো দরকার। আবার তার ক্লাস সেভেন-পড়ুয়া ভাইও রয়েছে। তার দিকেও তো দেখতে হবে। সে ফিন্যান্সের ছাত্র। পাশ করেছে তিতুমীর কলেজ থেকে। তার মতো একজনের টাই টিউশনি পাওয়াটাও মুশকিল। ড্রাইভিং তার খুব শখের একটা জিনিস। তাই তাকে ট্যাক্সি ক্যাবই চালাতে হয়। তার মতো এক গরিব ছেলে ট্যাক্সিই চালাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাথে আছে তার পড়াশুনা এবং পরিবারের ভরণপোষণ। আজিজুল হক কলেজ থেকে বের হয়ে ভেবেছিল সে হয়তো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবে। কিন্তু হয় নি। তারপরও সে হতাশ হয় নি। বাবা অবসরপ্রাপ্ত কেরানি, মা গৃহিণী, সাথে এক ভাই। তার পড়াশুনার ততটা যত্ন হয় নি ঠিকই। তারপরও সব বিষয়ে A+। তার বাবা তাকে সংসারের হাল ধরতে বললেন আর বললেন পড়াশুনা ছেড়ে দিতে। বাবাকে বুঝিয়ে সে সিদ্ধান্ত নেয় চাকায় পড়বে। আর ড্রাইভিং তো জানা আছেই। তাই ট্যাক্সি চালাবে আর মাসে মাসে কিছু টাকা বাসায় দেবে। অনার্স শেষ করার পর তার প্রাইমারি স্কুলের চাকরিটা হয়েই গিয়েছিল, কিন্তু...।

সে জানত না এরকম বৃষ্টির দিনে তার জীবনের মোড় হঠাৎ করেই ঘুরে যাবে। সবই মনে আছে তার। এক যাত্রীকে নামিয়ে দেয় এয়ারপোর্টে। যাত্রী বিদায় দিয়ে দরজা লক করেই সে ভাড়াটা তার মানিব্যাগে রাখে। ইতোমধ্যে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। তাই হলুদ ক্যাবের দরজা লক করে সে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই তার জানালার কাচে কে যেন নক করছে। রাজীব দেখল এক ভদ্রলোক। কাচ খুলতেই বলল– এই ট্যাক্সি, গুলশান যাবে? হ্যাঁ যাব। ভাড়া কত? ২৫০ টাকা। কিন্তু খুব বৃষ্টি হচ্ছে আপনি বরং এয়ারপোর্টের ভেতরে থাকুন। বৃষ্টি শেষ হলেই যাব। অনেক ক্লান্ত লাগছিল রাজীবের। তাই সে একটু জিরিয়ে নিতে চাচ্ছিল। তোমাকে আমি ৫০০ টাকা দিব তবু দয়া করে চল। আমার ড্রাইভার যে কোথায় জ্যামে আটকে আছে। উপায়ান্তর না পেয়ে রাজীব তাকে উঠতে বলল। ভদ্রলোকের সাথে কিছু ব্যাগও ছিল। তাঁর সাথে ব্যাগগুলো ছিল বলেই তিনি রাজীবকে অনুরোধ করেছিলেন বৃষ্টির মধ্যে যাওয়ার জন্য। গুলশান পৌঁছার আগেই বৃষ্টি থেমে গেল। ভদ্রলোক গুলশানের এক বিলাসবহুল বাড়ির সামনে নেমে গেলেন। ঐ দিনশেষে

গাড়িটা গ্যারেজে রাখার সময় রাজীব খেয়াল করল একটি ব্যাগ ফেলে গিয়েছেন ভদ্রলোক। সে পরের দিন ঐ ব্যাগটি বাসায় ফেরত দিতে যায়। রাজীব ঐ ব্যাগ খুলেও দেখে নি এতে কী আছে। স্বাভাবিকভাবেই ভদ্রলোক অনেক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। রাজীব তা দেখেই বুঝতে পেরেছে। ভদ্রলোক ব্যাগ পাওয়ার পর খুব খুশি হলেন। তিনি জানালেন যে, এতে অনেক ডলার ছিল এবং এর চেয়েও বড় বিষয় তাঁর কোম্পানির অনেক মূল্যবান কাগজপত্র ছিল। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন যে, কেন সে এগুলো নেয়ার বদলে ফেরত দিয়েছে। তুমি আমাকে এতগুলো ডলার ফেরত দিয়েছে। তুমি জানো এক ডলার সমান কত টাকা? রাজীব জানে এবং সে বলল। ভদ্রলোক তারপর তার পড়াশুনার কথা জানতে চাইলেন। রাজীব তাকে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিল। ভদ্রলোক নিশ্চয়তা দিলেন যে তাকে আর ট্যাক্সি চালাতে হবে না। তিনি ছিলেন USA এর একটি সাইকেল কোম্পানির মালিক। রাজীব ফিন্যান্সের ছাত্র শুনে ভদ্রলোক তাই খুশিই হলেন।

কথাগুলো মনে হলেই রাজীবের খুব খুশি লাগে। ইতোমধ্যে এয়ারপোর্টে এসে গেছে। রাজীব হয়তো প্রাইমারির চাকরিটা পেলে এইদিন দেখতে পারত না। এখন সে নিশ্চিন্তভাবে বাকি সব স্বপ্ন দেখতেই পারে এবং তা ভাবতে ভাবতেই রাজীব নেমে পড়ে এয়ারপোর্টে। প্রাইমারির চাকরিটা তার প্রাপ্য ছিল বটে, কিন্তু তার সৎগুণের বলেই সে জীবনে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে চলেছে।

মলিন মুখে সুন্দর হাসি

মোঃ নাঈম হাসান
কলেজ নম্বর : ১৫২১০৯৪
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-গ (দিবা)

-নাহিদ?
-জি আম্মু।
-বাবা পড়ছ?
জি মা পড়ছি।

উপরের কথোপকথনটি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া নাহিদ ও তার মার মধ্যে হচ্ছিল। মা নূরজাহান হক এর একমাত্র ছেলে নাহিদ। সে অনেক মেধাবী ও শান্ত প্রকৃতির ছেলে। নাহিদের মা ও বাবা তাকে খুব স্নেহ এবং আদর-যত্ন করেন। নাহিদ ছাড়াও তাদের আরও দুজন মেয়ে আছে। যারা উভয়ই মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ছেন। একমাত্র ভাই বলে নাহিদ তাদের কাছে অনেক ভালোবাসা পায়। সবমিলিয়ে নাহিদের দিন ভালোই কাটছিল।

বাবার চাকরিসূত্রে নাহিদদেরকে বগুড়ায় থাকতে হয়। নাহিদ বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের ছাত্র। নাহিদ স্কুলে যায়, মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে। ওর বাসায় ফেরার সময়টুকু যেন বাসায় থেকে কাটতে চায় না নূরজাহান হক এর। দরজার পাশে ঠুক করে কোনো একটা শব্দ হলেই দৌড়ে যান, দরজা খুলে দেখেন তাঁর নাহিদ এল কি-না। দরজায় যখন দেখেন নাহিদ নেই তখন মন খারাপ করে আবার ঘরে ঢুকে সোফায় বসে পড়েন। স্কুল বাস থেকে নেমে নাহিদ যখন দৌড়ে বাসার গেইটে আসে আর নক করে আম্মু আম্মু বলে ডাকতে থাকে, ওর মা তখন পৃথিবীর সব খেয়াল ঝেড়ে ফেলে দরজা খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে নাহিদকে কোলে তুলে নেন। তারপর কথা বলতে বলতে ভেতরে নিয়ে আসেন। নাহিদ তার মার গলা জড়িয়ে বলে– "দরজা খুলতে দেরি হল কেন? তুমি কোথায় ছিলে? কী করছিলে?" হাজার রকমের প্রশ্ন। ওর প্রশ্নের জবাব দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন নূরজাহান হক।

নাহিদের বাবা কামাল হক একটু গম্ভীর ও কৃপণ প্রকৃতির মানুষ। নাহিদের যে দুই বোন মেডিকেল কলেজে পড়ালেখা করে তাদেরও বাবার কাছ থেকে টাকা হিসাব করে নিতে হয়। সবকিছুতেই একটু হিসেবি প্রকৃতির তিনি। পরিবারের সবাইকে ঈদ কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের পোশাকের জন্য তাঁর কাছে বিভিন্ন অজুহাতের কথা বলে অথবা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে টাকা নিতে হয়। যে যতই জেদ করুক না কেন তিনি তাঁর অবস্থানে অটল। যদি জামাকাপড় থাকেই তবে আবার নতুন কিনতে হবে কেন? কিন্তু নাহিদ কখনও যদি কোনোকিছুর আবদার করে তিনি কোনো কথা না বলে আগে ওর আবদার মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নাহিদ সচরাচর কোনোকিছুর জন্য জেদ করে না। তবে ওর বোনরা যখন বাসায় আসে তখন যদি খেলনা না নিয়ে বাসায় আসে নাহিদ তাদেরকে বাসায় ঢুকতেই দেয় না। তাই বোনেরা অন্য কিছু ফেলে আসলেও নাহিদের খেলনা আনতে ভুল করে না।

নাহিদ নূরজাহান হক এর কলিজার টুকরা হলেও ওর প্রকৃত মা কিন্তু তিনি নন। তিনি নাহিদকে প্রথম দেখেছিলেন তাঁর বাসার নিচে এক কুঁড়েঘরে। অনেক গরিব পরিবারে জন্ম হয় নাহিদ এর। জন্মের ২ মাস পরেই মারা যান নাহিদের বাবা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েন নাহিদের মা। কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছুই মাথায় আসে না তাঁর। একদিন নূরজাহান হকের কাছে টাকা চাইতে আসলে তিনি বলেন– "তোমার ছেলেকে আমি আমার কাছে রাখতে চাই। কি দেবে না?" একটু কষ্ট পেলেও ছেলে ভালো থাকবে, মানুষের মতো মানুষ হবে একথা চিন্তা করে আর না করেন নি নাহিদের মা। এভাবেই নূরজাহান হকের বাড়িতে নাহিদের প্রথম আসা।

কুঁড়েঘরের এক অসহায় মায়ের সন্তান হয়েও নাহিদ যেভাবে তাঁর মেধা বিকাশের সুযোগ পেয়েছে তা সত্যি খুব কম শিশুর ভাগ্যে জোটে। যেভাবে সে বাবা-মায়ের আদর-স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছে তা অতুলনীয়। নাহিদ যখন তার বস্তির বাড়িতে বাবাকে হারিয়ে অসহায় মায়ের কোল জড়িয়ে বসে ভেবেছিল– সারাজীবন হয়তো মায়ের কোলে থাকতে পারবে না তখন তার সেই সুন্দর মুখটাতে কোনো আনন্দ ও হাসি ছিল না। সুন্দর মুখটা মলিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার কৃপায় ওর সেই মলিন মুখে ফুটেছে আজ সুন্দর হাসি। মায়ের কোলকে হারাতে হয় নি নাহিদের।

ওরাও মানুষ

মোঃ ইব্রাহীম সাদেক ভুঁইয়া
কলেজ নম্বর : ১৪২২৯
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ঙ (প্রভাতি)

কলেজে যাওয়ার জন্য একদিন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পিছনের পকেটে টান অনুভব করলাম। ঘুরে দেখলাম এক পিচ্চি ছেলে আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করতে চেষ্টা করছে। কাঁচা হাতের কাজ। ধরে ফেললাম আমি ছেলেটাকে। ধরা পড়েও ছেলেটার যেন কোনো ভয় নেই। আমার দিকে নির্বিকারভাবে তাকিয়ে থাকল। আমি ব্যাপারটা খুব হাসিখুশিভাবে উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ আমাকে বলল– "এখন কি আমারে মারবেন? না মারলে ছাইড়া দেন। অন্যজনের পকেট মারার চেষ্টা করি। সক্কাল থাইকা কিচ্ছু খাই নাই। পকেট না মারলে খামু কী।"

আমি সত্যি না হেসে পারলাম না। ছেলেটাকে খুব ভালো লেগে গেল। বললাম– "ক্ষুধা লাগলে আমার কাছে চাইলেই তো পারতিস। পকেট মারতে গেলি কেন? আমি না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সবাই তো তোকে ছেড়ে দিবে না।" পিচ্চি বলল– "চাইলে কেউ দেয় না।" আমি আর কথা বাড়ালাম না। এমনিই কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটাকে ২০ টাকা দিয়ে বিদায় করে দিলাম। সময়ের পরিক্রমায় ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ পরের ঘটনা। একদিন দুপুরবেলা কোচিং এ যাওয়ার জন্য বাসস্ট্যান্ডে গেলাম বাসে উঠার জন্য। দেখলাম সেখানে খুব ভিড়। ব্যাপারটা কী জানার জন্য ভিড় ঠেলে একটু সামনে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা পিচ্চি ছেলেকে একজন লোক খুব মারছে। একটু ভালো করে তাকাতেই বুঝতে পারলাম এ-ই সেই ছেলেটি– যে আমার পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আমার সাথে চারজন বন্ধু ছিল। আমরা সবাই মিলে লোকটাকে থামালাম। দেখলাম ছেলেটার অবস্থা বেশ খারাপ। লোকটা ছেলেটাকে অনেক মেরেছে। ছেলেটার মাথা কেটে অঝোরে রক্ত পড়ছে। বাম হাত ভেঙ্গে গেছে। শরীরের বিভিন্ন স্থান কেটে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত পড়ছে। আমি বললাম– "ভাই, এরকম ছোট বাচ্চাকে কেউ এভাবে মারে?" লোকটা বলল– "আরে ভাই বইলেন না। এগুলো সব নেশাখোরের জাত। নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য এগুলো সব খারাপ কাজ করে। এগুলোর মইরা যাওয়াই ভাল।" লোকটার কথা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। পরে আমরা বন্ধুরা মিলে ছেলেটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে গেলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে কচি ছেলেটাকে আর বাঁচানো গেল না। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। সমাজের যারা নির্দয় ধনী তাদের জন্যই কত প্রাণ এরকম নীরবে ঝরে যাচ্ছে। আমরা যারা প্রতিদিন ডাইনিং টেবিলে বসে মাংসের কচি হাড় চিবোই তারা কি কখনও ভাবি রাস্তার পাশের ঐ পথশিশুদের কথা? মরে যাওয়ার সময় শিশুটির কি প্রচণ্ড অভিমান হচ্ছিল না সমাজের প্রতি, সমাজের মানুষের প্রতি? তার কি নীরব প্রশ্ন ছিল না– কেন সমাজ তার মতো একটি কচি প্রাণকে দুনিয়াতে বাঁচতে দিল না?

এখনও ছেলেটার সেই নিষ্পাপ চেহারা ভুলতে পারি নি আমি। যখনই বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াই তখনই অপেক্ষা করি কখন আমার পিছনের পকেটে টান পড়বে। আমি ঘুরে তাকাব আর দেখব ছেলেটা বলছে– "এখন কি আমারে মারবেন? না মারলে ছাইড়া দেন।"

এক বিষাদময় রাত

এস. আর. ফুয়াদ হাসান
কলেজ নম্বর : ৮৪১৯
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ঘ (দিবা)

সেই রাতটার কথা মনে করলে এখনও শরীরের পশমগুলো শিউরে উঠে। রাতটা ছিল ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪। সময় প্রায় রাত ১১টা। তখনও মনে হয় নি এক অনাকাঙ্ক্ষিত সময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। মোহাম্মদপুরে একটা হোস্টেলে ছিলাম। রাতের খাবার শেষ করে ফেইসবুকে যাওয়া মাত্রই একজন বন্ধুর মেসেজ। ওর সাথেই চ্যাট করছিলাম। হঠাৎ ও বলে উঠল– আমাদের বন্ধু দৃষ্টি মারা গেছে। কথাটা বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, উল্টো বললাম– "ফালতু কথা বলিস না।" ও বলল সে নিশ্চিত, দৃষ্টি নাকি হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোক করে হাসপাতালে নিতেই মারা গেছে। তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কী করব তখন বুঝতে পারছিলাম না। তারপর শারমিনকে কল দিলাম আসল খবরটা জানার জন্য। ওর ভাই কল রিসিভ করেই আমাকে খবরটা বলল। তারপরও কেন জানি মনটাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না। ওর বাবাকে কল দিলে তিনিও একই কথা শোনালেন আমাকে। চোখের জলটাকে আর আটকাতে পারলাম না।

অনুভূতিটা যে কেমন ছিল বুঝাতে পারব না। আমার একটা অভ্যাস আছে, খুব কষ্ট হলে আম্মুর সাথে কথা বললেই কষ্টটা একটু কমে। আম্মুকে কল দিয়ে খবরটা বললাম। আম্মু আমাকে কী সহানুভূতি দেখাবেন নিজেই পুরো নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। একটু পর বললেন আমি যেন কান্না না করি, যদি আবার শরীর খারাপ হয়। সবচেয়ে ভালো লাগল সেদিন আম্মুকে বললাম যে, আমি রাতেই দৃষ্টির দেশের বাড়ি ফেনী যাব। আর আম্মু আমাকে একবারের জন্যও নিষেধ করেন নি বরং সব ধরনের সাহায্য করেছিলেন। সাথে সাথেই সব বন্ধুকে বললাম, ওরাও রাজি হয়ে গেল।

রাত আড়াইটার সময় হোস্টেলে অনেক ঝামেলা করে বের হলাম। রিক্সা করে সায়েন্স ল্যাব পর্যন্ত গিয়ে সবাই একসাথে হলাম। ইচ্ছা ছিল সকাল ১০টার মধ্যে যাওয়ার। কারণটা ছিল ওর নিস্তব্ধ দেহটা ১০টা পর্যন্তই রাখবে, তারপর...। যাই হোক আমি, নাজমুল, তৌহিদ, জিসান, খাইরুল, শাহীন আর শাহাদাত মিলে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শুনলাম– ভোর সাড়ে ৫টায় গাড়ি ছাড়বে আর তখন বাজে ৪টা। অবশেষে সময়মতো রওনা দিলাম। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার সাথে আর টিকে উঠতে পারলাম না। ট্রাফিক জ্যাম এর কারণে ওর বাড়ি পর্যন্ত যেতে বাজল বিকাল প্রায় ৪টা।

ওর বাড়ির দিকে হাঁটছিলাম কিন্তু মনে হয় পা যেন আর চলছে না। অন্য দুজন বন্ধু আমান আর রাসেল আমাদেরকে দৃষ্টির কবরের সামনে নিয়ে গেল। কিন্তু এ কেমন বাস্তবতা। আমরা তো নীল পলিথিনে ঢাকা কবর দেখতে যাই নি! মেঘ আর কষ্টের মধ্যে অনেক মিল। অতিরিক্ত মেঘ যেমন বৃষ্টিরূপে পতিত হয় তেমনি আমাদের কষ্টগুলোও চোখের জল হিসেবে পড়তে লাগল। কখনই তো ভাবি নি ওকে দেখতে গিয়ে ওর কবরটা দেখে আসতে হবে। ওর সাথে আমাদের কাটানো সাতটি বছরের কথা বার বার মনে পড়তে লাগল। যেখানে থাকার কথা ছিল সীমাহীন আনন্দ, সেখানে আজ এ কেমন পরিস্থিতি! দৃষ্টিকে দেখতে গিয়ে ও-ই চলে গেল দৃষ্টির অগোচরে, না ফেরার দেশে।

বন্ধু হারানোর বেদনা যে কতটা কষ্টের হতে পারে তা আগে কখনই বুঝি নি। মাঝে মাঝে বলি– এটা স্বপ্ন হলেও পারত। আজও মনে হয় ও বেঁচে আছে। সত্যি ও বেঁচে আছে! দৃষ্টি, তুই আজ নেই, তবে তুই তোর বন্ধুদের মাঝে বেঁচে থাকবি সবসময়। শুধু একটাই চাওয়া আমাদের– সৃষ্টিকর্তা যেন তোকে শান্তিতে রাখেন।

প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি -এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। — (সুরা আম্বিয়া, আয়াত–৩৫)

আমার মালয়েশিয়া ভ্রমণ

সামির হাসান
কলেজ নম্বর: ১১৪৯৩
শ্রেণি ও শাখা: নবম-চ (প্রভাতি)

গত বছর ডিসেম্বর মাসে আমার JSC পরীক্ষা শেষ হলে আমি ১ মাসের লম্বা ছুটি পাই। এই ছুটি ভালোভাবে কাটানোর জন্য আমার বাবা বিদেশে ভ্রমণের প্রস্তাব করেন। সবাই মিলে আমরা ঠিক করি 'মালয়েশিয়া' ভ্রমণে যাব। ডিসেম্বরের ৩ তারিখ রাত ৯টায় 'মালিন্দো এয়ারলাইন্সে' আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করি। মালয়েশিয়ার সময় ভোর ৫টায় কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছে আমরা প্রথমে পেনাং, তারপর লংকাবি এবং শেষে কুয়ালালামপুর ভ্রমণ করেছিলাম।

পেনাং :

৪ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় আমরা 'পেনাং' এ পৌঁছলাম। সেদিন বিকেলে আমরা শহরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করলাম। পরদিন পেনাং এর ঐতিহাসিক স্থান 'জর্জটাউন' দেখতে গেলাম। সেখানকার প্রাচীন ভবন ও বহু পুরানো স্থাপত্য পেনাং এ শত বছরের ইংরেজ শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। জর্জটাউন থেকে ফেরার পথে আমরা বিখ্যাত 'স্নেক টেম্পল' দেখলাম। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির অতি বিষধর সাপ দেখলাম। নিজের হাতে এসব বিষধর সাপ স্পর্শ করা আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। এছাড়াও আমরা পেনাং এর 'ভাসমান মসজিদে' জুম'আর নামায আদায় করি। দুদিন পেনাং এ কাটানোর পর আমরা লংকাবির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

লংকাবি :

পেনাং থেকে আমরা স্টিমারে করে লংকাবির উদ্দেশে রওনা দিলাম। কিছুক্ষণ পরে সাগরের বুকে অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ ভেসে উঠতে থাকে– যা রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। আমরা দুপুরে 'লংকাবি' পৌঁছলাম। সেখানে আমরা 'বেল ভিস্তা' নামের অতি প্রাচীন ও বিলাসবহুল হোটেলে অবস্থান করেছিলাম। আমরা সাধারণত ভারতীয় রেস্তোরাঁগুলোতে বেশি খেতাম। লংকাবির গহিন অরণ্যে কুমিরের গুহা, প্রাচীন জেলেপল্লি, হাজার বছরের পুরানো বাদুরের গুহা ইত্যাদি দেখলাম। গহিন জঙ্গলের পাখি, কুমির, বাদুর এবং অন্য সকল বন্য প্রাণী দেখতে দেখতে নৌকাভ্রমণ করছিলাম। এছাড়াও আমরা লংকাবির সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। 'লংকাবি' শব্দের অর্থ সমুদ্র এবং ঈগল। সেখানে তারা 'ঈগল স্কয়ার' নামের অতি সুন্দর স্থাপনা তৈরি করেছে। এভাবেই আমাদের লংকাবি যাত্রা সমাপ্ত হয় এবং আমরা 'কুয়ালালামপুর' যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করি।

কুয়ালালামপুর :

৯ ডিসেম্বর আমরা লংকাবি থেকে কুয়ালালামপুরে রওনা দেই। আমরা দুপুর ২টায় কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে অবতরণ করি। সেদিন বিকেলে বিশ্রাম করে, সন্ধ্যাবেলা আমরা শহরের বড় বড় শপিংমলে বেড়াতে যাই। চারদিকে সুউচ্চ ঝলমলে ভবন, বহুতল মার্কেট ও আলোকসজ্জা যেন স্বপ্নের মতো মনে হতে থাকে। ডিসেম্বর মাসে 'বড়দিন' বা Christmas Day'-কে সামনে রেখে শহরের সর্বত্র বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

পরদিন আমরা 'জেনেটিং হাইল্যান্ড' ভ্রমণ করলাম। ৬০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বিলাসবহুল হোটেল, ক্যাসিনো, পার্ক ইত্যাদি দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ের উপরে অত্যাধুনিক এক শহর। আমরা স্থলভূমি থেকে 'কেবল কার' এর মাধ্যমে সেখানে যাতায়াত করলাম। জেনেটিং হাইল্যান্ডে গমন আমার মালয়েশিয়া ভ্রমণের অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পরদিন আমরা কুয়ালালামপুর শহর দেখতে বের হলাম। আমরা মালয়েশিয়ার জাতীয় মসজিদ, জাদুঘর, রাজপ্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ বেড়িয়ে সবশেষে 'পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার' এ এসে উপস্থিত হলাম। এটি ছিল আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্নপূরণ। আমরা সারাদিন সেখানেই কাটালাম– ছবি তুললাম, আলোকসজ্জা দেখলাম, বিকালের ও রাতের খাবার খেলাম। কুয়ালালামপুরের রাতের রূপ আমাদের বিস্মিত করেছিল। আর এর মাধ্যমেই আমাদের কুয়ালালামপুর সফর শেষ হল।

বুঝতেই পারি নি মনের অজান্তে কখন এই আনন্দের ৮টি দিন শেষ হয়ে গেল। বুঝতেই পারি নি কীভাবে সময় এত দ্রুত চলে গেল। কিন্তু হঠাৎ করে যেন বিদায় ঘন্টা বেজে উঠল। এই ৮ দিনে পরিচিত হলাম একটি নতুন দেশের সাথে, জানা হল সে দেশের জাতিসত্তা। ১২ ডিসেম্বর রাত ১১টায় আমরা মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশের পথে রওনা দেই। আনন্দের ভ্রমণ শেষ হয়ে যাওয়ার দুঃখ ও দেশে ফিরে আসার আনন্দের মধ্য দিয়ে শেষ হয় 'আমার মালয়েশিয়া ভ্রমণ'।

কৌতুক-ধাঁধা-সাধারণজ্ঞান

কৌতুক

মেহরাব হাসান মহির
কলেজ নম্বর : ১৫১০৪১৬
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-খ (প্রভাতি)

১। শিক্ষক ও ছাত্র :
শিক্ষক : একটি গাভী দিনে ৩ লিটার দুধ দিলে সপ্তাহে কত লিটার দুধ দেবে?
ছাত্র : ১৮ লিটার, স্যার।
শিক্ষক : কেমনে? আর ৩ লিটার কোথায় গেল?
ছাত্র : শুক্রবার ছুটির দিন স্যার।

২। বিদেশির মাছ কেনা :
জনৈক বিদেশি ক্রেতা বাজারে মাছ কিনতে এসেছেন।
ক্রেতা : (মাছ দেখিয়ে) How much? (মানে দাম কত?)
বিক্রেতা : (একটু হেসে) না না স্যার, এইডা হাউ মাছ না, এইডা রুই মাছ।

কৌতুক

তাহমিদ মোর্শেদ
কলেজ নম্বর : ৮০৯৬
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-গ (দিবা)

১। মধ্যরাতে এক লোক রাস্তা দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছে দেখে গার্ড তাকে জিজ্ঞেস করল– "কী ব্যাপার, এত রাতে রাস্তায় কী করছেন?" লোকটি বলল– "আমার ঘুম হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজতে এসেছি।"

২। এক ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে খেতে গেছেন। দাওয়াত খেয়ে ফিরে আসার পর তাকে তার প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করল– "ভাই, আপনি দাওয়াতে কী খেলেন আর কী দিলেন?"
লোকটি বলল– "মার খেয়েছি, আর দৌড় দিয়েছি।"

কৌতুক

মুহতাসিম জামান মাহিম
কলেজ নম্বর : ৮০৯২
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-ক (দিবা)

১। চলন্ত বাসে এক যাত্রী প্রচণ্ড হাঁচি দিলে পাশের যাত্রী বলল–দেখেন ভালো হচ্ছে না কিন্তু।
এরপর লোকটি আরও জোরে হাঁচি দিলে আবার পাশের যাত্রীটি বলল–দেখেন ভাই ভালো হচ্ছে না কিন্তু।
এরপর লোকটি তার সর্বশক্তি দিয়ে হাঁচি দিয়ে রাগ করে বলল–আমার পক্ষে এর চেয়ে জোরে হাঁচি দেয়া সম্ভব নয়।

২। এক আদালতে বিচার চলছে। উকিল বলছেন– কেউ মিথ্যা কথা বলবেন না, মিথ্যা বললে বের করে দেব।
তখন আসামি বলল– স্যার, আমি এতক্ষণ সবই মিথ্যা বলেছি। আমাকে বের করে দিন।

কৌতুক

তানজিম আল শাহরিয়ার অরূপ
কলেজ নম্বর : ১৩৪৩৭
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-গ (প্রভাতি)

রাজু হারিকেন নিয়ে বনের দিকে যাচ্ছে। সেই সময় তার প্রতিবেশীর সাথে দেখা। প্রতিবেশী তাকে জিজ্ঞেস করলেন– হারিকেন নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?
উত্তরে রাজু বলল– মরতে।
প্রতিবেশী বললেন– মরতে হারিকেন নিয়ে যাচ্ছ কেন?
রাজু বলল– যদি অন্ধকারে সাপ কামড়ায়।

কৌতুক

ত্বাহা ইমতিয়াজ আলিম
কলেজ নম্বর : ৭০৮০
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-খ (প্রভাতি)

সোহেল পার্কে গেছে। সে একটি বেঞ্চে বসল। সে তার পাশের ব্যক্তিকে বলল– ভাই, এটা কী খাচ্ছেন?
ব্যক্তি : বুদ্ধির বীজ। (সোহেল খুবই অবাক হল!)
সোহেল : একটার দাম কত?
ব্যক্তি : একশ টাকা।
(সোহেল ১০০ টাকা দিয়ে একটি কিনে মুখে দেয়ার সাথে সাথে বুঝতে পারল যে, এটা বাদাম!)
সোহেল : এ তো বাদাম, দুই টাকায় পাওয়া যায়।
ব্যক্তি : দেখলেন, আপনার বুদ্ধি কীভাবে খুলে গেল।

কৌতুক

তোয়াহিন আহমেদ
কলেজ নম্বর : ৬৪৮৫
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-গ (দিবা)

দুই বন্ধুর কথোপকথন :

প্রথম বন্ধু : জানিস, আমার দাদু পানামা খালটা নিজে খুঁড়েছিল।
দ্বিতীয় বন্ধু : আরে, এ আর এমন কী? আমার দাদু তো একটা সাগরকে গুলি করে মেরেছিল।
প্রথম বন্ধু : এটা সম্ভব?
দ্বিতীয় বন্ধু : কেন? 'ডেড সি' এর নাম শুনিস নি?

কৌতুক

মুতাসিম ফুয়াদ রাহাত
কলেজ নম্বর : ১১০৪৪
শ্রেণি ও শাখা : দশম-গ (প্রভাতি)

১। এক লোক শীতের রাতে মশারি না টানিয়ে ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়েছেন, কিন্তু চারদিকে মশা আর মশা। মশার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকটি কম্বল দিয়ে নাক মুখ ঢেকে ফেললেন। কম্বলের মধ্যে ছিল একটা জোনাকি পোকা। লোকটি জোনাকি পোকা চিনত না। তাই সে বিড়বিড় করে দুঃখ করে বলল– "হায়রে মশা, তোর কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কম্বল দিয়ে মুখ ঢাকলাম, আর তুই কিনা আমাকে টর্চলাইট দিয়ে খুঁজছিস।"

২। **শিশু মশা ও মা মশা :**

শিশু মশা : মা, একটু উড়ে আসি।
মা মশা : না, আরেকটু বড় হও, তারপর।
শিশু মশা : যাই না মা, কালকে একটু উড়তে বেরিয়েছিলাম, তাই দেখে সবাই কত হাততালি দিল।

কৌতুক

লাবীব রহমান
কলেজ নম্বর : ৫৪৪৬
শ্রেণি ও শাখা : দশম-চ (প্রভাতি)

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন :

স্ত্রী : আচ্ছা, তুমি সবসময় অফিসে যাওয়ার আগে পকেটে আমার ছবি নিয়ে যাও কেন?
স্বামী : কোনো সমস্যায় পড়লে তোমার ছবি দেখলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, বুঝলে?
স্ত্রী : তাই নাকি! তাহলে দেখ আমি তোমার জন্য কত সৌভাগ্যের!
স্বামী : হুম্‌ম্‌...। আমার যখন সমস্যা আসে, তখন তোমার ছবি বের করে দেখি আর নিজেকে বলি– তোমার থেকে বড় সমস্যা তো আর হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ছোট সমস্যাগুলো আমার কাছে আর সমস্যা মনে হয় না।

কৌতুক

দেবজিৎ বসাক
কলেজ নম্বর : ১১০৭০
শ্রেণি ও শাখা : দশম-ঙ (প্রভাতি)

এক ইঞ্জিনিয়ার এর অনেক দিন হল কোনো চাকরি নেই। তাই তিনি একটি ক্লিনিক খুলে বসলেন। বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা হল– "এখানে ৩০০ টাকায় যেকোনো রোগের চিকিৎসা করা হয়। রোগ না সারলে ১০০০ টাকা ফেরত।" এই লেখা দেখে একজন ডাক্তার ভাবলেন– এটাতো টাকা উপার্জনের খুব সহজ উপায়। কারণ তিনি ৩০০ টাকার বিনিময়ে ১০০০ টাকা পেতে পারেন। এই ভেবে তিনি ভেতরে ঢুকে ইঞ্জিনিয়ারকে বললেন– "ডাক্তার সাহেব, আমি কোনো খাবারের স্বাদ পাই না"। একথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার তাঁর একটি বাক্স থেকে তাঁকে ঔষধ খেতে দেন। ঔষধ খেয়ে ডাক্তার বলেন– "এটাতো ঔষধ নয়, কেরোসিন"। এটা শুনে ইঞ্জিনিয়ার বললেন– "আপনি তো এখন ঠিকই স্বাদ পাচ্ছেন। অতএব দিন আমার ৩০০ টাকা"। ডাক্তার টাকা দিয়ে মন খারাপ করে চলে গেলেন।

কিছুদিন পর ডাক্তার আবার সেই ক্লিনিকে গিয়ে বলেন– "আমার কিছুই মনে থাকে না"। একথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার পূর্বের বাক্স থেকে সেই কেরোসিন বের করেন। তা দেখে ডাক্তার বলেন– "এটাতো কেরোসিন"। একথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার হাসতে হাসতে বলেন– "দেখলেন আপনার এখন সব মনে পড়ছে। দিন আমার ৩০০ টাকা"। ডাক্তার আবার মন খারাপ করে বাইরে চলে আসেন।

কিছুদিন পর ডাক্তার ক্লিনিকে এসে জানান– "আমি চোখে কিছুই দেখি না"। শুনে ইঞ্জিনিয়ার বলেন– "এই রোগের কোনো ঔষধ আমার কাছে নেই। আপনি আপনার ১০০০ টাকা নিন"। কিন্তু টাকা নেয়ার পর ডাক্তার বলেন– "এ তো ১০০০ টাকা না, ১০০ টাকা"। শুনে ইঞ্জিনিয়ার বলেন– "দেখলেন, আপনার চোখ এখন ঠিক হয়ে গেছে। অতএব দিন আমার ৩০০ টাকা"।

ধাঁধা

সাজিদ হাসান নাবিল
কলেজ নম্বর : ১৪০৬২
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-ক (প্রভাতি)

১। কোন্ রানী রানী নয়?
উত্তর : বিরানী।

২। ৪ থেকে ৫ বাদ দিলে কোথায় ১ অবশিষ্ট থাকে?
উত্তর : রোমান সংখ্যায় (IV-V=I)।

৩। এমন একটি দেশের নাম সর্বলোকে কয়,
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে দুটি ফলের নাম হয়?
উত্তর : বেলজিআম।

৪। পাঁচ অক্ষরে নাম যার বিদ্যালয়ে থাকে,
উল্টিয়ে উচ্চারণ করলেও বোঝায় তাকে।
উত্তর : Madam

ধাঁধা

আহনাফ তাহমীদ অর্ণ
কলেজ নম্বর : ৭৫১৩
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-গ (দিবা)

১। ঘুরি-ফিরি যুদ্ধ করি মরিবার তরে,
ছুঁলে সে মারে না দুলে সে মারে।
উত্তর : হা-ডু-ডু।

২। আছাড় মারলে ভাঙ্গে না, কিন্তু টিপ দিলে গলে যায়।
উত্তর : ভাত।

৩। পুরোপুরি আবদ্ধ রাখলেও আবদ্ধ হয় না।
উত্তর : আলো।

৪। কাটলে আরও বাড়ে।
উত্তর : পুকুর।

জানা-অজানা
সাঈদ মোরশেদ
কলেজ নম্বর : ১১৯৬৬
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-গ (প্রভাতি)

বিশ্বের সেরা পাঁচ পুলিশবাহিনী

রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেন : বিশ্বের সেরা পুলিশবাহিনীর নাম বলতে গেলেই তালিকার প্রথম জায়গাটি দখল করে নেয় 'আরসিএমপি' বা 'রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেন পুলিশ'। এ বাহিনী পৃথিবীর দক্ষ আর বিখ্যাত পুলিশবাহিনী হিসেবে এক নামে খ্যাত। আর এই বিখ্যাত হওয়ার পেছনের অন্যতম কারণ হচ্ছে এরা দেশের সমস্যার পাশাপাশি সমাধান করে থাকে আন্তর্জাতিক ঝুটঝামেলাও। আন্তর্জাতিক পুলিশের অন্যতম অংশ 'আইওবি' হচ্ছে 'আরসিএমপি' এর প্রধান কার্যালয়ের একটি অংশ। বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা মেটানোর জন্য এ পুলিশবাহিনীর মোট ৩৫জন সদস্য পৃথিবীর ২৫টি দেশে কাজ করছেন।

বিওপিই : অপরাধী আর অপরাধের স্বর্গ বলে মনে করা হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওকে। এ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে দমন করতেই উৎপত্তি হয়েছে 'বিওপিই' বা 'বাটালহো ওপিরাইওস পোলিসিআইস এসপেসিয়াস' এর। রিওর এই অসম্ভব করিতকর্মা পুলিশবাহিনীর কর্মক্ষেত্র শহর ও এর নিকটবর্তী স্থানগুলো। তবে তা সত্ত্বেও প্রতিটি যুদ্ধে দেশকে বাঁচানোর জন্য এ বাহিনীই প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নিজেদের বিলিয়ে দেয় আর দেশকে রক্ষা করে নানারকম ঝামেলা থেকে। এ বাহিনীতে যোগ দেয়া সদস্যদের প্রশিক্ষণের সময় করতে হয় অনেক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। তবু এ বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতার বিচার করলে সেরা পুলিশবাহিনীর তালিকায় এক কথাতেই রেখে দেয়া যায় 'বিওপিই'কে।

জাঙ্গলস অব কলম্বিয়া : এ পুলিশবাহিনীর জন্ম ১৯৮৯ সালে। এদেরকে তখন তৈরি করে তোলার কাজ নিয়েছিল ইউএস স্পেশ্যাল ফোর্স আরএসএএস। বর্তমানে মোট ৬০০টি জঙ্গল রয়েছে কলম্বিয়ায়। আর এসব জঙ্গলের মধ্যে চলতে থাকা মাদকব্যবসাকে রুখে দেয়াই হচ্ছে এ বাহিনীর কাজ। বিশেষ বাহিনীর মতো সজ্জিত আর বিস্ফোরক দ্রব্যের মজুদ নিয়ে চলতে থাকা এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে যেতে হয় ৪ মাসের একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে।

ইন্টারপোল : আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসদমনকারী সংস্থা হিসেবে পুরো বিশ্বের কাছে পরিচিত 'ইন্টারপোল'। সবচেয়ে বড় পুলিশবাহিনীর স্থানে এক নম্বর জায়গাটি ইন্টারপোল এর। মোট ১৮৮টি দেশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। ইন্টারপোলের জন্ম ১৯২৩ সালে। জন্মের পর থেকেই এ পুলিশবাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছে এবং অদ্যাবধি সেটা বজায় রেখেছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড : লন্ডনের এই নামকরা পুলিশবাহিনীকে চেনেন না এমন মানুষ কমই আছে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের অমর রচনা 'শার্লক হোমস' এর ফলে সকলে এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে এক নামে চেনে। এ পুলিশবাহিনীটির অবস্থান ওয়েস্টমিনিস্টার। এটি নির্মিত হয় ১৮২৯ সালে। বর্তমানে নানারকম পারদর্শিতায় পুরো বিশ্বের কাছে নিজেদের কর্মদক্ষতার কথা পৌঁছে দিয়েছে এ পুলিশবাহিনী। বিশ্বের সব পুলিশবাহিনীর আদর্শ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে এই পুলিশবাহিনী।

"জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই।" (শ্রীমদ্ভগবত গীতা)

কতিপয় Abbreviation

শাহরুখ কবির
কলেজ নম্বর : ১২৩৯৫
শ্রেণি ও শাখা : দশম-ঙ (প্রভাতি)

BANGLADESH

B- Blood (রক্ত)
A- Achieved (অর্জিত)
N- Noteworthy (স্মরণীয়)
G- Golden (সোনালি)
L- Land (ভূমি)
A- Admirable (প্রশংসনীয়)
D- Democracy (গণতন্ত্র)
E- Evergreen (চিরসবুজ)
S- Sacrosanct (অতিপবিত্র)
H- Habitation (বাসভূমি)

EDUCATION

E- Equity (সমতা)
D- Discipline (শৃঙ্খলা)
U- Unity (একতা)
C- Character (চরিত্র)
A- Aims (লক্ষ্য)
T- Truthfulness (সত্যবাদিতা)
I- Intelligence (বুদ্ধিমত্তা)
O- Obedience (আনুগত্য)
N- Nobility (নম্রতা)

STUDENT

S– Simplicity (সরলতা)
T– Tolerance (সহনশীলতা)
U– Unity (একতা)
D– Dutifulness (কর্তব্যপরায়ণতা)
E– Equality (সমতা)
N– Nationality (জাতীয়তা)
T– Truthfulness (সত্যবাদিতা)

TEACHER

T– Talented (বুদ্ধিমান)
E– Expert (দক্ষ)
A– Active (কর্মঠ)
C– Creative (সৃজনশীল)
H– Honest (সৎ)
E– Educated (শিক্ষিত)
R– Responsible (দায়িত্বশীল)

জানা-অজানা

সনক লস্কর
কলেজ নম্বর : ৪৪৬৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-গ (দিবা)

জোনাকি পোকারা রাতের বেলা কেমন করে জ্বলে?

রাতের বেলা জোনাকিরা এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি করে। এরা আসলে এক জাতের উড়ন্ত পোকা, এদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণিরই পাখা আছে। এরা দেখতে কালোমতো আর এদের দেহ নরম তুলতুলে। ফুলের মধু খেয়ে এরা জীবন যাপন করে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে এদেরকে বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। এদের শরীর থেকে আলোর ঝলক বেরিয়ে আসে। আলো উৎপাদনকারী অংশটি এদের তলপেটের নিচে থাকে। বায়ুমণ্ডল দ্বারা এ অংশটি নিয়ন্ত্রিত হয়। অংশটিতে দুটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে। তার একটি লুসিফেরিন আর অন্যটি লুসিফারেস। মজার ব্যাপার হল– এদের দেহ থেকে যে হলুদ বা কমলা আলো বের হয়, তাতে কোনো তাপ থাকে না। জোনাকিরা আলো বিচ্ছুরণ করে পাখিদের ভয় দেখায় এবং নিজেদের রক্ষা করে।

অসীম রহস্য

জে. ডি. আজিজী
কলেজ নম্বর : ১৩০৩৩
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ক (প্রভাতি)

বর্তমান যুগ মানুষের উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের যুগ। দিনে দিনে মানুষ প্রমাণ করছে সবকিছুর উপর তাঁর কর্তৃত্ব। আর এর পেছনে বড় অবদান রেখেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সভ্যতাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি সমাধান করেছে অনেক জটিল সমস্যার। তবে একটি কথা চিরন্তন আর তা হল– বিজ্ঞান এই বিশ্বের সবকিছুর সমাধান করতে পারে না। যদিও বিজ্ঞান প্রায় সবকিছুরই একটা-না-একটা সমাধান বের করেই, তবে অনেক কিছুই রয়েছে যা বিজ্ঞানের কাছে এখনও হয় অনাবিষ্কৃত, নয় অব্যাখ্যাত। আর এটাই মূলত 'রহস্য'। রহস্য যেকোনো কিছুরই হতে পারে– তা স্থানের, কালের, প্রাণীর কিংবা কোনো শরীরী বা অশরীরী বিষয়েরই হোক না কেন। বস্তুত আমাদের প্রত্যক্ষ করা বিষয়সমূহের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অপার রহস্য। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল বলেন– "এই পৃথিবী অনেক সুস্পষ্ট জিনিসে পূর্ণ– যা কেউই কোনো-না-কোনো কারণে কখনই দেখে নি কিংবা দেখতে পায় নি।" পৃথিবীর বুকে অনেককিছুই রয়েছে যা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। হয়ত এর কোনো কূল-কিনারা কখনই পাওয়া যাবে না। কিছু বিষয় বা স্থান এ জগতে রয়েছে যা এতই জটিল বা অস্পষ্ট যার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। এ সমস্ত বিষয়ের কয়েকটি নিয়েই আমার এ আলোচনা।

১। স্টোনহেঞ্জ, ইংল্যান্ড :

'স্টোনহেঞ্জ' দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ডে অবস্থিত পাথরের তৈরি এক প্রাগৈতিহাসিক সৌধ। এটি আসলে ১৭টি ছোট-বড় ঊর্ধ্বমুখী পাথরের একটি বৃত্ত বা **Stone Circle**। এটি আনুমানিক ১০,০০০ বছর পূর্বে ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম কেল্টিক জাতির তৈরি। এটা আসলে এক সুবৃহৎ স্থাপনার অংশবিশেষ। এর বৃহৎ পাথরস্তম্ভগুলি **Sersen** পাথরের এবং ছোট স্তম্ভগুলি Blue stone এর তৈরি। এই সৌধের বৃহৎ সারসেন পাথরগুলির একেকটির ওজন প্রায় ৫০ টন এবং ক্ষুদ্র Blue stone গুলোর একেকটির ওজন প্রায় ৪ টনের মতো। বৃহৎ সারসেন পাথরগুলিকে মূল সৌধের স্থান থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে উত্তরের মার্লবোরো এর নিম্নভূমি থেকে আনা হয়েছিল বলে অনুমিত।

এখন প্রশ্ন হল– সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ কেমন করে ও কীভাবে এত ভারী পাথরগুলিকে এত দূর থেকে এনেছিল এবং কীভাবে একেকটি পাথরকে অপরাপর পাথরগুলির উপর এত নিখুঁতভাবে, এত ভারসাম্যের সাথে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। কোন্ উদ্দেশ্যেই বা এটা নির্মিত হয়েছিল? এসব আজ কেবলই রহস্য। স্টোনহেঞ্জের আকার থেকে গবেষকরা ধারণা করেন যে, এটি একটি মানমন্দির বা Qbservatory ছিল। এটি দেখতে অনেকটা বৃহৎ সূর্যঘড়ির মতো। তবে যদি এটি ধর্মীয় কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে কি প্রাচীন কেল্টিক জাতির লোকেরা অনেক প্রতিভাবান ছিল? কেল্টিকদের মধ্যে Druid নামে এক তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। যদি এরাই স্টোনহেঞ্জের নির্মাতা হয়ে থাকে তাহলে কি এরা সেই সময়ের রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছিল? এদের কি সময় সম্পর্কে অনেক অজানা ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ছিল? নাকি এরা এমন কিছু জেনেছিল যা আজও আমরা জানতে পারি নি? বস্তুত এসব কিছুই আজ রহস্য! এই রহস্যের কোনোরূপ সমাধান আজ অবধি পাওয়া যায় নি।

২। আটলান্টিস– হারিয়ে যাওয়া এক মহাদেশ :

আটলান্টিস সম্পর্কে কে না জানে। এক সময়কার পরাক্রমশালী এক সাম্রাজ্য তথা মহাদেশ– যার একদিকে আমেরিকা, অপরদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা। প্রচণ্ড শক্তিধর অহংকারী এক জাতির আবাস, উন্নত এর সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু– যা হঠাৎ করে এক রাতের মধ্যেই অতল সমুদ্রের মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

আটলান্টিসের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'ডায়ালগ অব টাইমাউস অ্যান্ড ক্রিটিয়াস' নামক গ্রন্থে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন– আটলান্টিসের সুসভ্য জনগণ মানুষ নয় বরং অন্য জগতের বাসিন্দা। বলা বাহুল্য, তিনি এদেরকে হয় গ্রিক পুরাণের অর্ধদেবতা, নয় সোজা ভিনগ্রহের এলিয়েন বলে বুঝাতে চেয়েছেন। তবে মজার ব্যাপার হল এই যে, প্লেটো এ ঘটনা শুনেছিলেন প্রাচীন এথেন্সের বিশিষ্ট সমাজসেবক সোলোনের কাছ থেকে। আর সোলোন এর উল্লেখ পেয়েছিলেন প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্সে লেখা প্যাপিরাস রোলে।

প্লেটোর মতে, আটলান্টিয়ানরা গ্রিসের এথেন্স ছাড়া প্রায় সমগ্র বিশ্বকে পদানত করতে সক্ষম হয়েছিল। এথেনিয়ানদের সাথে আটলান্টিয়ানদের এক দীর্ঘ যুদ্ধ চলে। তবে শেষ পর্যন্ত আটলান্টিয়ানরা পরাজিত হয়ে সমস্ত করদরাজ্যগুলি হারায় ও অবশেষে এক রাত্রে দেবতাদের আক্রোশের শিকার হয়ে তারা অতল সাগরে ডুবে যায় এবং সৃষ্টি হয় আটলান্টিক মহাসাগরের। তবে এখানেই শেষ নয়, হেলেনিস্টিক ইহুদি দার্শনিক ফিলো বলেছেন যে, বৃহৎ দ্বীপ আটলান্টিস– যা আকারে ইউরোপ ও আফ্রিকার চেয়েও বড় ছিল; তারা দম্ভ ও অহমিকার কারণে ঈশ্বর কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে এক রাতের প্রবল ভূমিকম্পে অতল জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর এমন একটা সমুদ্র (আটলান্টিক মহাসাগর) এর জন্ম হল যা সর্বদাই অশান্ত। বলা বাহুল্য, এই সাগরেই রয়েছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, সারগাসো সাগর বা শৈবাল সাগর, বিপজ্জনক হিমশৈল আর সমুদ্র এলদেশীয় আগ্নেয়গিরির ন্যায় অদ্ভুত বস্তুসমূহ। তবে এ বিষয়ে গবেষকরা একমত যে, এই হারিয়ে যাওয়া মহাদেশের অস্তিত্ব আসলেই ছিল। এ পৃথিবীতে মহাদেশগুলোর বিভাজনের আগে বা কোনো এক সময়ে এই মহাদেশ তলিয়ে গিয়েছিল। তাহলে এই মহাদেশের কোনো নিদর্শন আজও পাওয়া যায় নি কেন? নাকি রহস্যময়ভাবে সলিলসমাধি হওয়া এই আটলান্টিস হাজার বছর ধরে সমুদ্রতলে প্রবালের আস্তরণে এমনভাবে ঢাকা পড়েছে যে, মানুষের কাছে তা কেবল রহস্যই থেকে গেছে!

৩। ইস্টার দ্বীপ, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর :

চিলি ও তাহিতি দ্বীপের মাঝে অবস্থিত এই রহস্যময় দ্বীপটি বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল ভূমিগুলোর অন্যতম। ষোড়শ শতাব্দীতেই এখানে প্রায় ১০,০০০ পলিনেশীয় লোকের বাস ছিল। এরা দ্বীপের বিখ্যাত মোয়াই মূর্তিগুলো নির্মাণ করেছিল। ১৪ টন ওজন ও ৪ মিটার উচ্চতার মোয়াইগুলো আগ্নেয়শিলা ও প্রবাল দিয়ে তৈরি। এসব মূর্তি নিখুঁতভাবে দাঁড় করানো ও এদেরকে আগ্নেয়শিলা দিয়ে তৈরির কৌশল ইস্টার দ্বীপের ন্যায় একটি পাথুরে দ্বীপে কেমন করে সম্ভব হয়েছিল তা এক রহস্য। কেবল তাই নয়–এখানে ১৭-১৮ শতকের মধ্যে হঠাৎ করে ভয়ানক প্রাকৃতিক সঙ্কট দেখা দেয়। দ্বীপ থেকে সমস্ত পাখি উড়ে যায়, গাছপালা মারা যায়। ঘাসসহ দ্বীপের উপরের স্তরের মাটি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর দ্বীপবাসী নরখাদকে রূপান্তরিত হয়ে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। কয়েক শতাব্দী এরূপ চলার পর দ্বীপটি যখন পুরোপুরিভাবে মানবশূন্য হয়ে যায় তখন এখানে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। সাম্প্রতিককালে গবেষকরা এখানে প্রাচীন এক ভেষজ ঔষধের নমুনার সন্ধান পান। এটি ছিল আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ঔষধ যা মানুষের কোষকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সজীব রাখতে সক্ষম। কীভাবে ইস্টার দ্বীপ এমন সমৃদ্ধ হয়েছিল আর কেনই-বা এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তা এক বিরাট রহস্য। বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেও এর কোনো কূল-কিনারা পান নি।

৪। মাচু-পিচু, পেরু :

সভ্যতার হারিয়ে যাওয়া শহর হিসেবে ইনকা পরিচিত। সপ্তাশ্চর্যগুলোর একটি, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৪০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত আন্দিজ পর্বতমালার এক পর্বতচূড়ায় অবস্থিত। ইনকাদের স্বর্ণযুগে ১৪৫০ সালে নির্মিত হয় এই অসাধারণ শহর। পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত হয়েও উন্নত নাগরিক সুবিধা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সর্বোপরি ভূমিকম্পপ্রতিরোধী স্থাপনার জন্য বিখ্যাত এই শহর তৈরি হয়েছিল সভ্য জগতের সাথে ল্যাটিন আমেরিকা তথা ইনকাদের পরিচয়ের অনেক আগে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রতিষ্ঠার পর মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই এই শহর জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে।

১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরপরই মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইনকা, অ্যাজটেক ও মায়া সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে। তবে স্প্যানিশ বিজেতাদের বিবরণীতে এই শহরের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি। এমনকি এই শহরের মৃত্যুর শত বছর পর ১৯১১ সালে মার্কিন অভিযাত্রিক হাইরাম বিঙহ্যামের কর্তৃক এই শহর হঠাৎ করে আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত শহরটিতে কোনো মানুষের আর আবির্ভাব ঘটে নি। তাহলে কীভাবে এই শহর জনমানবশূন্য হয়েছিল? যদি স্প্যানিশরা একে না পেয়ে থাকে তাহলে কীভাবে এর অধিবাসীরা শেষ হয়ে গেল? আর কীভাবেই বা ইনকারা পশ্চিমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেই এত উন্নত একটি পার্বত্য শহর নির্মাণ করেছিল? এসবই এখন রহস্য!

এই যুগে যেখানে মানুষ চাঁদে গেছে ও মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছে, সেখানেও পৃথিবীর অনেক স্থানই এখনো মানুষের দৃষ্টির অগোচরে, রহস্যের আস্তরণে ঢেকে রয়েছে। আসলে রহস্যের শুরু আছে, শেষ নেই! রহস্য নতুন করে আবির্ভূত হয়, তবে তা কখনই শেষ হয় না!

আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে–বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোনো পলায়নস্থান ছিল না। এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য–যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে, অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।

(সুরা ক্বাফ, আয়াত– ৩৬ ও ৩৭)

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

ক্রিকেট খেলা

অমর্ত্য বড়ুয়া
কলেজ নম্বর : ৮০৫৬
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-খ (দিবা)

রমনাপুর নামে এক শহর ছিল। সেই শহরের মানুষ খেলাধুলা করতে ও খেলা দেখতে খুব ভালোবাসত। তবে তারা ক্রিকেট খেলা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত ও খেলত।

সেই শহরে ফরিদ নামে এক ছেলে ছিল। সেও নিজে খেলতে ও খেলা দেখতে খুব পছন্দ করত। তার প্রিয় শখও এটা। সে স্টেডিয়ামে ফুটবল, হকি নানা ধরনের খেলা দেখেছে। তবে সে কখনো স্টেডিয়ামে গিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখে নি। কাল বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ম্যাচ হবে। সে ঠিক করল যে, কালকের ম্যাচটি স্টেডিয়ামে গিয়ে দেখবে। কিন্তু সে চিন্তা করল- একা একা দেখে কোনো মজা পাবে না। তাই সে তার বন্ধুদেরকে বাড়িতে আসতে বলল। কাল সবাই একসাথে গিয়ে মজা করে খেলা দেখবে। রাতে তারা মহানন্দে খাবার খেল। পরের দিন সবাই স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গেল। বাংলাদেশের টার্গেট ২০০ রান। কিন্তু বাংলাদেশ হারার পথে। ৫০ রানে ৯ উইকেট পড়ে গেছে। বলও খুব একটা বাকি নেই। কিছুক্ষণ পরে দেখল বাংলাদেশ হেরে গেছে। মন খারাপ করে ফরিদ কাঁদতে শুরু করল। হঠাৎ রিপন বলল- "কী রে, এত কাঁদছিস কেন?" ফরিদ বলল- "দেখছিস না? বাংলাদেশ ম্যাচটিতে হেরে গেছে।" তার কথা শুনে বন্ধুরা হাসাহাসি শুরু করে দিল। শাহিন বলল- "আমরা তো এখন বাসায়। রাতে ঘুমাচ্ছি। আমরা এখনো স্টেডিয়ামে যাই নি।" মতিন বলল- "ঘুমের মধ্যে কেউ কাঁদে?" এতে ফরিদ ভীষণ রাগ করল।

বন্ধুরা তার রাগ ভাঙ্গাল এবং সবাই মিলে পরের দিন একসাথে খেলা দেখতে গেল। ম্যাচে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জয়লাভ করেছিল।

সৎকর্মশীলরা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা

বি.এন তারনিন সাদনান
কলেজ নম্বর : ৬৮৮৪
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-ক (দিবা)

আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানের সঙ্গে সৎকর্মের নির্দেশ দিয়েছেন অসংখ্যবার। সৎকর্ম মানে ভালো কাজ। কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে যে কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং সমাজের জন্য উপকারী তাকেই মূলত সৎকর্ম বলে। ইসলামি পরিভাষায় যাকে 'আমলে সালেহ' বলে। ইসলামি শরিয়াত অনুযায়ী ইমান ছাড়া আমলে সালেহ হতে পারে না। কেননা ইমানহীন কোনো আমল আল্লাহর সমীপে গৃহীত হয় না। এ কারণে মহান আল্লাহ্ সৎকর্মের আগে ইমানের নির্দেশ দিয়েছেন। একজন মুমিনের সামান্যতম সৎকর্মও আল্লাহ্ নিষ্ফল করবেন না।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- "কেউ সৎকাজ করলে সে তার কল্যাণের জন্য করে, আর কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সেই ভোগ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে" (সুরা আল-জাসিয়া, আয়াত-১৫)। মহান আল্লাহ আরো বলেন- "যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই সৃষ্টির সেরা" (সুরা বাইয়্যেনাহ্, আয়াত-৭)। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন- "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়- যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের তাগিদ দেয় ও তাগিদ দেয় ধৈর্যের" (সুরা আসর)। মহান আল্লাহ্ বলেন- "মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করলে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব" (সুরা নাহল্, আয়াত-৯৭)।

অতএব আমাদের সবারই উচিত সামগ্রিক জীবন সৎকর্মের চাদরে আবৃত করা। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎকর্মশীল বান্দা হিসেবে কবুল করুন।

ভোরের আলো

মোঃ কাইফ আফরান খান
কলেজ নম্বর : ১২৫৮৯
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-খ (প্রভাতি)

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়েরা খাতুনের সংসারে চার মেয়ে এবং দুই ছেলের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তাঁর বড় বোন ফাতেমা, মেজ বোন আছিয়া, সেজ বোন হেলেনা ও ছোট বোন লাইলী বেগম। একমাত্র ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। তখনকার দিনে বাবা-মা বড় ছেলেকে আদর করে ডাকতেন 'খোকা'। সেই হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাক নাম ছিল 'খোকা'। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অন্যায়, অসত্য, নির্যাতন, ভয়-ভীতির কাছে কখনও মাথা নত করেন নি শেখ লুৎফর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে পিতার আদর্শ বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

১৯৩৯ সালের কথা। গোপালগঞ্জ মাধুরানাথ ইন্সটিটিউট মিশন স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, স্কুল পরিচালনা পর্ষদ সবাই ব্যস্ত। স্কুলের ক্লাসরুম, বারান্দা, পায়খানা, প্রস্রাবখানা সব ঝকঝকে পরিষ্কার। গাছ থেকে একটি ঝরাপাতা উড়ে এসে বারান্দায় পড়লে হেডমাস্টার সাহেব কাউকে কিছু না বলে নিজেই কট করে পাতাটা তুলে ফেলছেন। দুসপ্তাহ আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের বলে দেয়া হয়েছে সেদিন যেন সকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-মার্জিত পোশাক পড়ে স্কুলে হাজির হয়। কারণ ঐদিন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক স্কুল পরিদর্শনে আসবেন, সাথে থাকবেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ভালোয় ভালোয় স্কুল পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী মহোদয় ডাকবাংলোর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একদল ছাত্র এসে হঠাৎ তাঁদের আগলে দাঁড়াল। ছাত্রদের এমন কাণ্ড দেখে হেডমাস্টার সাহেব তো রীতিমত ভড়কে গেলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন– "এই তোমরা কী করছ রাস্তা ছেড়ে দাও।" হেড মাস্টারের কথায় কর্ণপাত না করে হ্যাংলা পাতলা লম্বা ছিপছিপে মাথায় ঘন কালো চুল ব্যাক ব্রাশ করা একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে। মন্ত্রী মহোদয় জিজ্ঞেস করলেন– "কী চাও?" বুকে সাহস নিয়ে নির্ভয়ে সে উত্তর দিল– "আমরা গোপালগঞ্জ মাধুরানাথ ইন্সটিটিউট মিশনারি হাই স্কুলেরই ছাত্র। স্কুলের ছাদে ফাটল ধরেছে, সামান্য বৃষ্টি হলেই সেখান থেকে বৃষ্টির পানি চুয়ে পড়ে আমাদের বই-খাতা ভিজে যায়, ক্লাস করতে অসুবিধা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার এ ব্যাপারে বলা হলেও কোনো ফল হয় নি। ছাদ সংস্কারের আর্থিক সাহায্য না দিলে রাস্তা মুক্ত করা হবে না।"

কিশোর ছাত্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সৎসাহস আর স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে হক সাহেব জানতে চাইলেন– "ছাদ সংস্কার করতে তোমাদের কত টাকা প্রয়োজন?" সাহসী কণ্ঠে সে জানাল– "বারো শত টাকা"। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যুত্তরে বললেন– "ঠিক আছে, তোমরা যাও। তোমাদের ছাদ সংস্কারের ব্যবস্থা আমি করছি।" তিনি তাঁর তহবিল থেকে উক্ত টাকা মঞ্জুর করে অবিলম্বে ছাদ সংস্কারের জন্য জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিলেন।

এমনি এক দাবি আদায়ের মধ্য দিয়ে যাঁর জীবনযাত্রা শুরু সেই মানুষটি আর কেউ নন–তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

আর্টিস্ট : সাদাত আরেফিন আরিফ
কলেজ নম্বর : ৮৪১৮
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-চ (দিবা)

স্মৃতিকাতরতা

নুজহাতুল ইসলাম রেনান
কলেজ নম্বর : ১১০৫৬
শ্রেণি ও শাখা : দশম-গ (প্রভাতি)

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে–এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।"

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার এ লাইনগুলো ক্লাস এইটের পাঠ্যবইয়ে তখন পড়লেও স্কুল জীবনের শেষ বছরে এসে যেন সেই কবিতার লাইনগুলো বেশি মনে পড়ছে। কীভাবে রেসিডেনসিয়ালের ক্যাম্পাসে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৭টি বছর কাটিয়ে অষ্টম বছরে পদার্পণ করছি তা যেন বুঝতেই পারি নি। স্কুলজীবন মানুষের শ্রেষ্ঠ সময়ের মধ্যে অন্যতম এবং মানুষের স্মৃতিকাতরতা কিন্তু স্কুলকে ঘিরেই আবর্তিত হয় এবং আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। নীল মুক্ত আকাশ, সবুজ নীড়ের উপভোগটা একজন আবাসিক ছাত্রদের মতো অনাবাসিক ছাত্রের হয়ে ওঠে না ঠিকই, কিন্তু হলফ করে বলতে পারি উপভোগটা অনাবাসিক হয়েও আমার কম হয় নি। শিক্ষকদের সান্নিধ্য ও শিক্ষা আমাদের দেখিয়েছে সত্যিকারের মানুষ বা MAN (M তে Morality, A তে Ability এবং N তে Neutrality) হবার পথ। সেদিনকার কথা মনে পড়লে অবাক হই– যেদিন কুয়াশাঢাকা চাদরে কনকনে শীতের মধ্য দিয়ে নীল-সবুজের ক্যাম্পাসে বাবা-মায়ের হাত ধরে প্রবেশ করেছিলাম সেই ছোট ছেলেটি। অবাক হয়ে যাই বিগত দিনগুলোর কথা মনে পড়লে। আর অবশ্যই স্মরণ করি আমার প্রিয় বন্ধুদের কথা–যাদের ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল। যাদের জন্য আমার জীবন এত মধুময়, রঙিন। যারা আমাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে, আশার আলো নিয়ে বুকভরে বাঁচতে শিখিয়েছে, তাদের প্রতি আমি কৃতার্থ। বড় ভাইয়াদের Rag day তে তাদের দেয়া একটি উক্তি খুবই কানে বাজে– You can get us out of DRMC. But you cannot take DRMC out of us. তাই আমি আমার বিদায়ের দিনে জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে ঠিক এভাবে বলতে চাই–

আবার আসিব ফিরে DRMC এর নীল সবুজের আলয়ে
অমানুষ নয় অবশ্যই সত্যিকারের মানুষ (MAN) হয়ে।

কারণ DRMC তে ঢোকার সময় আমরা সেই MAN থাকি না, কিন্তু বের হই সেই MAN হয়ে।

অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলি : ভ্রম না সত্য

তাসফিক রহমান
কলেজ নম্বর : ১১০৬৭
শ্রেণি ও শাখা : দশম-ঘ (প্রভাতি)

গোটা বিশ্বের তুলনায় আমাদের বাসভূমি পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু এ পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, যা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। রহস্যের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে এমন অনেক ভৌতিক ঘটনাই ঘটে থাকে যাকে একশ্রেণির মানুষ নিছক ভ্রম বলে উড়িয়ে দেয়, অপর শ্রেণির মানুষ একে কোনো অদৃশ্য সত্তার ক্রিয়াকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করে। উদাহরণ হিসেবে পৃথিবীর এমন অনেক স্থানের বর্ণনা দেয়া যায়, যেখানে মানুষ স্বীয় মৃত্যুকে হাতে নিয়ে প্রবেশ করে। এখন গুগল সার্চ করেই এরকম শত শত রহস্যময় জায়গার কথা জানা যায়। যেমন– ইংল্যান্ডে এমন একটি জঙ্গল রয়েছে, যেখানে রাতের বেলা ঝুলন্ত মানুষের মৃতদেহ পরিদৃষ্ট হয়। সন্ধ্যা হলে পুলিশও এখানে

জনসাধারণকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। আমরা যারা কোনো-না-কোনো ধর্মে বিশ্বাসী, তারা জানি এই অতি প্রাকৃত সত্তাকেই বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন– ইসলামে এটি 'জিন' নামে পরিচিত। আমাদের গ্রামে-গঞ্জে এ ধরনের বিষয় নিয়ে বহু ঘটনা প্রচলিত থাকলেও অধুনা অনেকেই একে মনগড়া অবৈজ্ঞানিক ঘটনা বলে আখ্যা দেয়। কিছু অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা সত্য– তা যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই, তেমনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণীও উপেক্ষার অযোগ্য।

আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে জিনের অস্তিত্বের সুদৃঢ় ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। পবিত্র কুরআনে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে জিন সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। আবার আমরা এখন জানি যে, প্রাণের বিকাশ ঘটানোর জন্য পানি প্রয়োজন। যদি আমরা ৪০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিকে উত্তপ্ত করি, তাহলে প্লাজমা অবস্থায় পানির অবস্থা হবে আগুনের মতো গরম, কিন্তু এ অবস্থায় তা ধোঁয়াবিহীন থাকবে। এ ধরনের প্লাজমা অবস্থা থেকে জিনদেরকে সৃষ্টি করা হতে পারে। সম্প্রতি স্ট্রিং থিওরি থেকে গাণিতিকভাবে এগারোটি ডাইমেনশন থাকবার কথা প্রমাণিত হয়েছে। আবার আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে, দুটি ভিন্ন গতিশীল বস্তুর কাছে সময়ও ভিন্ন হয়। তাহলে বলা যেতে পারে, মানুষের সাপেক্ষে 'সময়' নামক মাত্রাটি জিনদের সাপেক্ষে ভিন্ন হয়। আবার আমরা ত্রিমাত্রিক জগতে অবস্থান করছি। এই পৃথিবীতে সকল মানুষের সাপেক্ষে সময়ের প্রবাহ এক। আর জিনেরা চতুর্মাত্রিক জগতে যদি থেকে থাকে তবে তাদের সাপেক্ষে প্রবহমান সময়ের কাছে আমাদের জগতের সময়প্রবাহ এত নগণ্য হবে যে, তারা ইচ্ছে করলে পৃথিবীর অতীত বা ভবিষ্যৎ কালকে আংশিকভাবে বর্তমানকালে হাজির করতে সক্ষম হবে। সেকারণে অনেকেই কোনো অভিশপ্ত স্থানে পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখে ভয় পায়। অন্য মানুষেরা হ্যালুসিনেশন বলে থাকে। আবার একটি ঘরে হঠাৎ জড়বস্তুকে চলমান হতে দেখা যায়। ভিন্ন মাত্রায় থেকে জিনেরা কোয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্টের মাধ্যমেও এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হবে। তারা আমাদের আশেপাশে থাকলেও ভিন্ন মাত্রায় থাকার কারণে আমরা তাদের দেখি না, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রবিশেষে জিনেরা মানুষকে স্বচক্ষে দেখা দেয়।

পরিশেষে একটা কথাই বলব, জীবপদার্থবিজ্ঞান দ্রুত উন্নত হতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন পশুপাখির ন্যায় হয়ত জিনদেরকে নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাবজেক্ট থাকবে।

শিক্ষকের মর্যাদা

আবীর মোহাম্মাদ সাদী
কলেজ নম্বর : ১৫১১০৭৬
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-গ (প্রভাতি)

একজন মানুষের আলোকিত জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হচ্ছে তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের শিক্ষা ও বিশ্বাস। একজন শিক্ষার্থী তার সমগ্র জীবনেই তার শিক্ষক হতে প্রাপ্ত শিক্ষা, সংস্কার ও আদর্শ মূল্যবোধ এর প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট থাকে। এমনই এক আদর্শ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক নিয়ে আমার এই লেখা।

কোনো এক গ্রামে অনুপম নামে এক কিশোর বালক বাস করত। সে অনেক প্রতিভাবান ছিল। অনুপমের বয়স ছিল ১০ বছর। তার গলার সুর ছিল অত্যন্ত সুমধুর। তার গ্রামে আজিমউদ্দিন নামে এক গানের শিক্ষক ছিলেন। আগ্রহী অনুপম তাই তাঁর কাছে গান শিখতে গেল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তার অসাধারণ সুরের চর্চা গ্রাম ছাড়িয়ে শহরেও ছড়িয়ে পড়ল। দূরদূরান্ত থেকেও অনেক লোক গ্রামে আসে এবং অনেকেই তার সুরকে টাকার নিলামে তুলতে শুরু করে। কিন্তু অনুপমের শিক্ষকের একজন শহুরে বন্ধু ছিল যার নাম ইসমাইল হোসেন। তিনিও গানের জগতের সাথে যুক্ত ছিলেন, ছিলেন সৎ ও মেধার মূল্যায়নকারী। তাই তিনি অনুপমকে তাঁর সাথে শহরে নিয়ে আসতে চাইলে অনুপম কিছুদিন সময় চায়। প্রায় ১ মাস পরে যখন অনুপম শহরের উদ্দেশে রওনা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ঠিক তার দেড় সপ্তাহ আগে থেকেই তার শিক্ষক তার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। কারণ জানতে চাইলে তার শিক্ষক কোনো কথা না বলে বলেন– "তোমার শহরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।" অনুপম কিছুই বুঝে উঠতে পারল না, কেননা তার শিক্ষক তাকে শহরে পাঠানোর জন্যই এতদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তাহলে কী ঘটল? কী কারণ এর পিছনে? কারণ ছিল এবং তার শিক্ষকই তাকে সব কথা খুলে বললেন।

অনুপম তার বড় ভাইয়ের সংসারেরই একজন সদস্য ছিল এবং তার আর্থিক অবস্থা ও অনুপমের শিক্ষকের আর্থিক অবস্থা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। অনুপমের বড় ভাই যার কর্মচারী তার মেয়েও ভালো গান জানত এবং অনুপমের সুরকে সম্মান করত। কিন্তু অনুপমের বড় ভাইয়ের বউ ছিল একটু লোভী স্বভাবের। অনুপমের বড় ভাই রূপমের বস্ তার এই সুরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত এবং রূপমের

বউকে অনেক অর্থের লোভ দেখিয়ে সে বলে– "অনুপম যেন কোনোমতেই গ্রামের বাইরে বের হতে না পারে।" রূপমের বউ সেই কুমন্ত্রণানুযায়ী তার ষড়যন্ত্র শুরু করে। অনুপমের শিক্ষকের একমাত্র নাতিকে খেলার কথা বলে তার বন্ধুদের থেকে দূরে নিয়ে আসে এবং একটু উঁচু স্থান থেকে তাকে ফেলে দেয়। ছেলেটির নাম ছিল রফিক। এতে রফিকের দুই পা ভেঙ্গে যায় এবং দুটি কিডনি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে তার অপারেশন করা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু অর্থাভাবে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা যখন সম্ভব হচ্ছিল না তখন একমাত্র রূপমের বস্ তাকে অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দিতে রাজি হন, কিন্তু একটা জঘন্য শর্তও জুড়ে দেন। শর্তটি এমন যে, "তোমার বংশের একমাত্র বাতিকে যদি ফিরে পেতে চাও তবে অনুপমের গান চিরজীবনের জন্য নিষিদ্ধ কর।" বংশের একমাত্র বাতি নিভে যাওয়ার ভয়ে এবং অপরিমিত অর্থের কারণে শিক্ষক আজিমউদ্দিন তাই নিজের মনের হাজারো প্রশ্নের বিরুদ্ধে রাজি হয়ে যান। এ ঘটনা শোনার পর তার শিক্ষক অনুপমকে বলেন– "অনুপম, তোমার কাছে আমি কোনোদিন কিছুই চাই নি। আজ একটা জিনিস চাইব, দেবে তো?" অনুপম তখন বলল, "আপনার জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।" তখন শিক্ষক বলেন– "আমি তোমার কাছে আমার প্রদানকৃত শিক্ষা ও তোমার সুমধুর সুর ভিক্ষা চাচ্ছি।" একান্ত অনুগত ছাত্র অনুপম বলল– "অবশ্যই। আপনি আর চিন্তা করবেন না। আমি আর জীবনে কখনও গান গাইব না।"

কিছুক্ষণ ছাত্র-শিক্ষক নীরব থাকার পর অনুপম বলে উঠল– আপনি রফিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। তারপরে অনেকেই তাকে গান গাইতে বললেও তার মুখ থেকে আর কোনো জবাব পাওয়া যায় না। এতে গ্রামের মানুষ তাকে 'অহংকারী', 'বিশ্বাসঘাতক' ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে। এরপর যখন অনুপমের শিক্ষকের বন্ধু ইসমাইল হোসেন তাকে নিতে আসে তখন তার শিক্ষকের ওয়াদা রক্ষার্থে সে তার সাথে শহরে যায়। তার শিক্ষক ইসমাইল হোসেনকে ওয়াদা করেছিলেন যে, "উপযুক্ত সময় হলে অবশ্যই আপনি আসবেন এবং অনুপমকে নিয়ে যাবেন।" এদিকে যখন শহরে সবার সামনে এক বিরাট অনুষ্ঠানে যাবার কথা ও সেখানে হাজারো দর্শকের সামনে মঞ্চ কাঁপানোর কথা, ঠিক সে সময়েই অনুপম যেন আর একটি আওয়াজও করতে পারল না। এমতাবস্থায় অনুপম ইসমাইল হোসেনসহ আয়োজকদল জুতাবর্ষণের শিকার হলে ইসমাইল হোসেন তাকে মারতে শুরু করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনুপমের শিক্ষক ও রূপমের অমানবিক বস্। শত শত ঘুষি-লাথির কারণে অনুপম যখন তার জীবনের প্রায় শেষ সময় গুনছিল, তখনই রূপমের বস্ বলে উঠেন– "তোমরা থামো। ওর কোনো দোষ নেই। ও তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" তারপর গান না-গাওয়ার ঘটনাটি সবাই বুঝতে পারে ও আফসোস করে। কিন্তু ইতোমধ্যেই অনুপম এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরপারের উদ্দেশে রওনা দেয়।

স্বপ্নের শহর ঢাকা

শাওন চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ১০৭৫৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ঘ (প্রভাতি)

প্রতিদিনকার যান্ত্রিক জীবন আমাদের পার করতে থাকে সপ্তাহ, মাস, বছর। আমাদের প্রায় ১১৫৩ একর আয়তনের এই প্রাণের শহর ঢাকার প্রত্যেক লাল ইটের মাঝে জমে আছে স্বপ্ন, কখনো মধ্যবিত্তের দীর্ঘশ্বাস। ২০২০ সালে আমরা আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পার করব। সময় যেতে থাকে স্মৃতির ছেঁড়াপাতায় ভর করে, আর আমরা বেঁচে থাকি স্বপ্নের উপর ভর করে। প্রতিদিন কলেজে যাবার আগে মাকে দেখি কত যত্ন আর ভালোবাসায় বাবার জন্য টিফিনক্যারিয়ার সাজাচ্ছেন। যে বাবার জীবন টেবিল আর ফাইল ও কলমের কালিতেই কেটে গেছে জীবনের অনেকটা সময়। এই যে ভালোবাসা, মধ্যবিত্তের কঠিন জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নিম্নবিত্তের বাস্তবতা, প্রতিদিনকার মায়া, স্নেহ, মায়ের চুমু, বাবার শাসন, লক্ষ্য, স্বপ্ন, স্মৃতি, ঝগড়া, অভিমান নিয়ে বেঁচে থাকা এ জাদুর শহরে।

স্বপ্ন যখন রক্তে রক্তে :
প্রাণের শহর ঢাকার গল্প শুরু হয় নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তকে সাথে নিয়ে উচ্চবিত্তের সমন্বয়ে। এখানে অনেক পথশিশু যখন খেতে পায় না, তখন কোনো অনুষ্ঠানে লাখ টাকার আতশবাজি ফোটে, আবার এই শহরেই কোনো এক মধ্যবিত্ত যুবক শহরকে প্যান্টানোর স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্নের নগরীর ম্যাপ-পরিকল্পনা :
আধুনিক নগরীর জন্য প্রথমত তিনটি বিষয়কে বিবেচনায় আনতে হবে– উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

* যানজট আমাদের প্রতিদিনকার জীবনকে পিছিয়ে রেখেছে। ঘুম থেকে উঠেই ট্রাফিকজ্যামের চিন্তায় মনে হয়– আজ যেন কোনোভাবে দেরি না হয়ে যায়। যানজটমুক্ত একটি নগরীর প্রত্যাশা তাই সবার আগে করি।

* রাস্তার ধারে অপরিকল্পিত গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধকরণ এবং ফুটপাতে যত্রতত্র গড়ে ওঠা দোকান সরিয়ে ফেলতে হবে।

* অল্প বৃষ্টিতেই শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলে তা সকলের জন্যই সমস্যার কারণ হয়ে দাড়ায়। তাই এ ব্যাপারে নজর দিতে হবে।

* প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

* সাম্প্রতিক সময়ের পহেলা বৈশাখের ঘটনা আমরা সকলেই জানি। তাই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো সতর্ক থাকতে হবে এবং উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে নগরীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে।

* 'আমাকে ব্যবহার করুন' লেখা বাক্স চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা তার উপযুক্ত ব্যবহার করি না। অথচ ডাস্টবিনের পাশে আবর্জনা দেখে নাকে ঠিকই রুমাল চাপা দেই। এ ব্যাপারে ঢাকার নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিতকরণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের জন্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা এখন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে সমস্ত ঢাকাকে ওয়াইফাই করে দেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

Dare to Dream:

মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। আসুন স্বপ্ন দেখি। প্রাণের শহর ঢাকাকে মন থেকে ভালোবাসি। আমাদের মনে রাখতে হবে– শহরটা আমাদের, স্বপ্নটাও আমাদের। কাজেই যা করার আমাদেরকেই তা করতে হবে।

'Don't let anybody steal your dream'. প্রশ্ন জাগবে, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কী করণীয়?

দেশটাকে 'মা' হিসেবে ভালোবাসা :

আর হয়ত ১৯৫২ বা ১৯৭১ এর মতো রক্ত দিতে হবে না। শুধু দেশটাকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হবে। নিজের অবস্থান থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং বুকে হাত দিয়ে বলতে হবে– 'থাকব ন্যায়ের সাথে', আমাদের 'বদলে যেতে হবে, বদলে দিতে হবে'। এক্ষেত্রে তিনটি জিনিসকে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে– পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্মিলিত অংশগ্রহণ।

পরিশেষে যদি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করি, তবেই গড়ে তোলা সম্ভব আমাদের 'স্বপ্নের শহর ঢাকা'।

সভ্যতার অপমৃত্যু

মোঃ তালহা জুবায়ের
কলেজ নম্বর : ১৫২১০০৬
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-চ (দিবা)

মানবসভ্যতার উত্থান হয়েছিল মহান স্রষ্টার অসীম কৃপরতে। অথচ মানুষ নিজেই তার একেক সভ্যতা ধ্বংস করেছে আপন বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু একসময় যে সমগ্র মানবজাতিই সমাপ্তির অনলে পুড়বে তা সে জেনেও আপন জাতির অপমৃত্যুর দরজা খোলার প্রয়াস চালায়।

আমরা মানুষ। আশরাফুল মাখলুকাত। অথচ আমরাও যে অন্যান্য প্রাণীর মতোই জন্মেছি তা ভুলে যাই। তাই অনেক ইতর প্রাণীর আচরণ নিজের মাঝে দেখতে পেয়েও আমরা মনে করি মানুষের মতো মানুষ হচ্ছি। একারণেই মানুষের চরিত্রে মাঝে মাঝে পশুত্ব ফুটে উঠছে অথচ বাহ্য দৃষ্টিই যে মনভোলানো দৃষ্টি, আসল রূপ নয় – তা আমরা মানতে পারি না এবং চাইও না।

পবিত্র কুরআনে এসেছে– আল্লাহ তায়ালা সামুদ সম্প্রদায়কে তাদের অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করে দেন। এছাড়াও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের তথ্য দ্বারা আমরা জানি যে, অসংখ্য জাতি বিলুপ্ত হয়েছে। তাদের ধ্বংসের মূলে কোনো উল্কাপাত বা ধূমকেতুর আঘাত নেই, বরং তাদের অজ্ঞতা, দাম্ভিকতা ও দ্বন্দ্ব তাদের সমূলে উৎপাটন করেছে। সাবধান! এসবের বীজ কিন্তু আমাদের জাতিতেও আছে।

আমরা মনে করি শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠছে, তাই চিন্তা নেই। অথচ এই সমাজই যে এসব রোগ ও বীজের বাহক তা আমরা বুঝতে চাই না। কারণ শিক্ষিত আর প্রকৃত শিক্ষা অর্জনকারী সমার্থ নয়। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, চোর, ডাকাত যে খারাপ মানুষ কে না জানে। কিন্তু যখন শুনি এসব কাজের পিছনে কিছু 'শিক্ষিত' লোক দায়ী তখন আমাদের হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ চূর্ণ-বিচূর্ণ হৃদয়সম্পন্ন জাতির ভবিষ্যৎ যে ধ্বংসের স্তূপ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। যার কথা ভালো লাগত, যার পদাঙ্ক অনুসরণ করতাম, সেই যদি খারাপ হয় তাহলে তাদের প্রদেয় শিক্ষার মূল্য কী?

কুশিক্ষা আমাদের খারাপ পথে চালিত করে। তাই আমরা প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে ভালো মানুষ হব। খারাপ মানুষ সমাজে ছিল এবং আছে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষেরা যদি এদের সহায়তা করে, তাহলে তারাও তো একই পথে ধাবিত। আর এর প্রতিবাদী কণ্ঠ খুঁজে না পাওয়া গেলে সভ্যতার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

হোম গ্রাউন্ড

তাহজিদ তাসনিফ রিহাত
কলেজ নম্বর : ১০৬৩৪
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-চ (প্রভাতি)

সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটা ভ্রমণকাহিনি লিখতে বসেছিলাম। প্রায় বারো বছর পর গত সেপ্টেম্বরে গ্রামে গিয়েছি! নতুন পরিবেশ, নতুন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরিচিত পরিবেশ বাধা দিল! কীভাবে? জানালার পাশে বসে বসে ভাবছিলাম কীভাবে লেখা শুরু করব? হঠাৎ খেয়াল করলাম মাঠে পিচ্চি একটা ছেলে একাই ফুটবল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। লেখার টপিক পেয়ে গেলাম! একজন মানুষের পার্সোনালিটি, আইডিয়োলজি, অ্যাটিটিউড কেমন হবে তা নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর। DRMC এর একজন সিনিয়র স্টুডেন্ট যদি তার রেমিয়ান লাইফ নিয়ে লিখতে চায় তাহলে সে শুরু করবে তার ভর্তি পরীক্ষার এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে। কিন্তু আমি সঙ্গত কারণে DRMC সম্পর্কে এর আগেরও কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারব!

আব্বু DRMC এর ক্যাম্পাসে আসেন নজরুল ইসলাম হাউসের হাউসটিউটর হিসেবে। তখন আমি একদম ছোট, দুধের বাচ্চা! আমার স্পষ্ট মনে আছে– ছুটিতে হাউসবয়রা বাড়ি চলে যাওয়ার পর হাউস যখন ফাঁকা হয়ে যেত, আমি তখন হাউসের করিডোরের এ মাথা থেকে ঐ মাথা পর্যন্ত সাইকেল চালাতাম। হাউসের সামনে বিশাল বাগান। একেকটা ফুলের সাইজ আমার মুখের চেয়েও বড়! আমি বাগানে দৌড়াদৌড়ি করতাম, আম্মু ছবি তুলত। আমাদের সমাজে ছোটবেলা থেকেই বাচ্চা-কাচ্চাদের ভেতরে ভূতের ভয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়, যদিও বড় হওয়ার পর ঠিকই শেখানো হয়– ভূত বলে কিছু নেই! আমাকেও এরকম বলা হয়েছিল– বাগানে যে বড় তালগাছটা আছে, সেখানে একটা পেত্নী থাকে! বলার উদ্দেশ্য ছিল– আমি যাতে একা একা নিচে না যাই! পেত্নীর নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তর এসেছিল– শাঁকচুন্নী!

পরের বছর আব্বুকে কুদরত-ই-খুদা হাউসের হাউসটিউটর করা হল। বিশাল বড় বাসা। যে কেউ চাইলেই ড্রয়িংরুমে ইনডোর ফুটবল অথবা শর্টপিচ খেলতে পারবে! হাউসটিউটর স্যার অনেক বড় একটা বেত নিয়ে রাউন্ড দিতেন, মারার প্রয়োজন হত না! বেত দেখলেই সব ঠাণ্ডা! আবার তিনি প্রায় প্রতিদিনই বিকালে থ্রি-ফোরের ছাত্রদের সাথে হাউসের সামনে ক্রিকেট খেলতেন। খুবই ভালো প্লেয়ার ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই! বল ব্যাটে না লাগলেও স্ট্যাম্পে ঠিকই লাগত!

২০০১ সালে আমি হাউসের ছাত্রদের সাথে প্রথম প্রভাত ফেরিতে যাই! আম্মুকে বলে রেখেছিলাম– যেভাবেই হোক আমাকে ভোরে ডেকে দিতে হবে! ছোটবেলা থেকেই ভেতরে একুশের চেতনা ছিল কিনা জানি না! ঘুম ঘুম চোখে খালি পায়ে হাতে ২টা গোলাপ ফুল নিয়ে কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের সাথে যেতাম। সে সময়কার কলেজ-অথোরিটির কথা একটু বলা যাক। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন কর্নেল (অব.) কায়সার আহমেদ স্যার। খুব কড়া মানুষ ছিলেন! তাঁর অমর বাণী ছিল– "আমার পারমিশন ছাড়া এই ক্যাম্পাসে একটা কাকপক্ষীও ঢুকবে না!" তাঁকে দেখেই আর্মি লাইফের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ শুরু হয়। স্যারের অদ্ভুত নিয়ম– সবকিছু চামচ দিয়ে খেতে হবে! এমনকি মুড়ি-চানাচুরও! কারেক্ট স্টুডেন্টদের হয়ত বিশ্বাস হবে না– তখন হাউসবয়রা মার্চপাস্ট করে কলেজে যেত, আবার ছুটির পর একইভাবে হাউসে ফিরে আসত!

বাঘ-ভাল্লুককে ভয় পাই কিনা জানি না! তবে একসময় কুকুরকে মারাত্মক ভয় পেতাম! বিকালে একদিন সাইকেল চালাতে বের হয়েছি। বয়স তখন ৪-৫ বছর। একা। হঠাৎ ২টা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে আমার সাইকেলের পেছনে দৌড়াতে শুরু করল। মৃত্যুভয় যে কী জিনিস সেটা সেইদিনই ভালোমতো বুঝে গিয়েছিলাম। তবে কুকুরগুলো আমাকে ধরতে পারে নি। হয়ত আমি অনেক জোরে প্যাডেল মেরেছিলাম, অথবা তারা বাচ্চামানুষ দেখে ছেড়ে দিয়েছিল– এই পিচ্চিকে ধরে কী হবে! দ্বিতীয় কারণটার সম্ভাবনাই বেশি!

২০০৩ সালের শেষের দিকে আসলাম ৪ নম্বর টিচার্স কোয়ার্টারে। এখানে টিচারদের ছেলেদের সাথে নতুন গ্রুপ তৈরি হল। সবাই আমার চেয়ে বয়সে ৩-৪ বছর বড়। তখন থেকেই বড়দের সাথে চলাফেরা। আস্তে আস্তে নিজের ভেতর ম্যাচিউরিটি আসা শুরু করল। ২০০৬ সালের শুরুতে আম্মু হঠাৎ একদিন বলছে– "সামনের বছর তুমি এই কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিবা।" 'ভর্তি পরীক্ষা' শব্দটা আমার কাছে নতুন। তবে এতটুকু বুঝলাম– আমি সম্পূর্ণ নতুন একটা জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আর তার জন্য কিছু প্রিপারেশন নিতে হবে।

অনেকে অনেক কোচিং সেন্টারে পড়া শুরু করল। আর আমি নিজের মায়ের কাছেই কোচিং শুরু করলাম! ডিসেম্বরে ভর্তি পরীক্ষা হল। আমার আর আম্মুর সারাবছর পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছিল। যদিও মর্নিং শিফটের পরীক্ষায় একটা অংকে ভুল করেছিলাম। আমার কী দোষ! অংকটা ছিল– '১ অধিবর্ষে কত সপ্তাহ, কত দিন?' আমি তো জানতাম না 'অধিবর্ষ' মানে 'লিপ ইয়ার'। আমি অধিবর্ষকে ভেবেছিলাম 'অর্ধবর্ষ' মানে অর্ধেক বছর। তাই ৩৬৫ কে ২ দিয়ে ভাগ করেছিলাম। তারপর যেহেতু সপ্তাহের হিসাব চেয়েছে, তাকে আবার ভাগ করেছিলাম ৭ দিয়ে!

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে '১০৬৩৪' কলেজ নাম্বার দিয়ে রেমিয়ান হিসেবে আমার যাত্রা শুরু। প্রথম দিনে যার পাশে বসেছিলাম তার নাম রাফাতুল ইসলাম রাফি। এখন ইলেভেন-এফ এর বাম সারির ছয় নম্বর বেঞ্চে আমার পাশে বসে সেই একই ছেলে। ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষার রেজাল্ট দিল– তাহজিদ তাসনিফ রিহাত, পজিশন-০১। এই রেজাল্টই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশটা করে দেয়! হঠাৎ করেই আমার ওপর সবার এক্সপেকটেশন বেড়ে গেল! যতই দিন যাচ্ছে আমাকে নিয়ে তাদের স্বপ্ন ততই বেড়ে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে ক্লাস ফোর পার করে ফাইভে উঠে গেলাম। তখনও জানতাম না– আমরাই বাংলাদেশের সবচেয়ে অভাগা ব্যাচ! প্রথমে জানতাম– বছরশেষে শুধু বৃত্তি পরীক্ষা হবে। সবার হাবভাব ছিল– 'বৃত্তি পাইলে পাইছি, না পাইলে নাই!' শেষের দিকে হঠাৎ করেই খবর এল– এবার বৃত্তি পরীক্ষার বদলে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা' দিতে হবে। আমরাই ছিলাম এই পরীক্ষার ফার্স্ট ব্যাচ!

DRMC কে যদি একটা দেশ ধরা হয়, তাহলে তার জাতীয় খেলা ফুটবল! আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতার আগে এখনও আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়! ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমরা টিফিন টাইমে ফুটবল খেলতাম টেনিসবল দিয়ে! বলের ওপরে লালটেপ প্যাচানো থাকত। এই কলেজের এমন কোনো ছাত্র নেই– যে কখনো ফুটবল খেলে নি! বৃহস্পতিবার অনাবাসিকদের জন্য ঈদের দিন! আগে আগে ছুটি হয়ে যাবে, তারপর তাদের আর থামায় কে? আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়– তোমার খালি পায়ে ফুটবল খেলতে ভালো লাগে নাকি বুট পরে? আমি চিন্তা না করেই বলে দিব– খালি পায়ে।

বর্ষাকাল। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে জানালার পাশে বসে বসে বৃষ্টি পড়া দেখছিলাম। মনের ভেতর বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলার সুপ্ত ইচ্ছা। আব্বু বাসায়। সাহস করে বলতেও পারছি না। শেষবার যখন ফুটবল খেলে কাদা মেখে বাসায় ঢুকলাম, আম্মু জিজ্ঞেস করল– "এগুলো কী?" সার্ক এক্সেলের অ্যাডটা মাথায় ঘুরছিল! মাথা নিচু করে উত্তর দিলাম– "দাগ থেকে যদি দারুণ কিছু হয়, তাহলে তো দাগই ভালো!" সাথে সাথেই কামান গর্জে উঠল– "ধাক্কর মেরে তোমার দাগ বের করে দেব!" তাই খেলার চিন্তাটা আপাতত বাদ দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যই দেখছিলাম! সৃষ্টিকর্তার মতো এত সুন্দরভাবে রঙের খেলা কেউই খেলতে পারে না। সবুজ মাঠ, উপরে নীল আকাশ। সবুজ আর নীলকে একসাথে মেশালে কী রং হয় কে জানে! ঢাকা শহরে গাছপালা এমনিই অনেক কম। মাঝে মাঝে মনে হয়– এই শহরের অর্ধেক গাছ বোধহয় আমাদের ক্যাম্পাসেই আছে!

আবার একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক! ক্লাস সিক্সে ওঠার পর বুঝতে পারলাম– বড় হয়ে গেছি। কারণ একটাই– ফাইভ পর্যন্ত ছিল হাফ প্যান্ট, এখন ফুল প্যান্ট পরতে হবে। বছরের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন ক্লাস সিক্স থেকে নাইন পর্যন্ত সব ছাত্রকে মাঠে নিয়ে আসা হল। সাফ গেমসের ওপেনিং সিরিমনিতে এই কলেজের ছাত্রদের একটা টিম ডিসপ্লে করবে। পড়াশোনা একরকম বাদ! শুরু হল হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত আমরা মাঠে থাকতাম। ঐ যে সেদিন গায়ের মাংস কমে গিয়েছিল, আর কোনোদিনই বাড়ে নি। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত প্রতিদিন ছুটির পর থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত ফুটবল খেলে বাসায় যেতাম! এখন এটা কোনোভাবেই সম্ভব না! মনে হয় এটাকেই বলে– বড় হয়ে যাওয়া! Don't grow up, it's a trap! কথাটা আসলেই সত্যি!

সত্যি কথা বলতে কি– ক্লাস এইটে ঠিকমতো পড়াশোনা করেছি, যার ভালো একটা গিফট বছরের শেষেই পেয়েছিলাম! পরীক্ষার পর ছুটিতে একদিন আমি আর তিনজন স্যারের ছেলে ক্যাম্পাসে বের হয়েছি। হঠাৎ বেল খেতে খুবই ইচ্ছা করল। কুদরত-ই-খুদা হাউসের সামনে একটা বেলগাছ আছে। সেখান থেকে পাড়তে হবে। আইডিয়াটা খারাপ না! এক ভাই গাছে উঠে গেল। আমরা বাকিরা নিচে গার্ড হিসেবে দাঁড়ালাম। হঠাৎ দেখলাম সাবেরা ম্যাডাম এদিকেই আসছেন। আমরা আস্তে করে চেপে গেলাম। ম্যাডাম আর খেয়াল করলেন না– গাছে তখনো একজন বসেই আছে। বেচারাকে আধঘন্টা গাছেই থাকতে হল!

নাইনে ওঠার পর এরকম ভাব এল– নাহ্! এবার সিরিয়াসলিই বড় হয়েছি! কলেজ বিল্ডিংয়ে ক্লাস করব। এদিকে সায়েন্স তিনভাগ হয়ে গেছে– ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি। ম্যাথও দুই ভাগ– জেনারেল ম্যাথ আর হায়ার ম্যাথ। বড় তো হয়েছিই, তাই না! কোচিং এর সংখ্যা বেড়ে গেল, খেলার টাইম কমে গেল। দেখতে দেখতে কখন যে টেনের টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ফেললাম, টেরই পেলাম না! তবে ২০১৪-২০১৫ ছিল আমার জীবনের সেরা দুই বছর।

মাঝে মাঝে জানালার পাশে বসে থাকতে থাকতে ভাবি– সেই বাচ্চা রিহাত এখন কলেজের সিনিয়র স্টুডেন্ট! যে ছেলেটা খেলতে খেলতে বড় হল, তার সামনে এখন অনেক অনেক রেসপনসিবিলিটি! ইন্টারে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, ভালো জায়গায় চান্স পেতে হবে।

তারপরেও সময় পেলে সে মাঠে চলে যায়। অনেক দিনের অভ্যাস একদিনে বদলাবে কীভাবে? সে বুঝতে পারে– স্বপ্ন পূরণ করার জন্য তার প্রত্যেকটা দিনকে পারফেক্ট করে তুলতে হবে। আর সাথে দরকার কিছু ইন্সপিরেশন, কিছু কেয়ার, যেগুলো সে DRMC-তেই খুঁজে পেয়েছে! বিস্তারিত নাহলে না-ই বললাম! যার বোঝার সে বুঝে নেবে!

যারা স্কুলে পড় তাদের জন্য কিছু কথা– শুধু পড়াশোনাই নয়, পাশাপাশি রেগুলার খেলাধুলাও কর। You only live once! জীবনতো একবারই! এই সময় আর ফিরে পাবে না। একজন পারফেক্ট রেমিয়ান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলো। তাহলে বের হয়ে যাওয়ার পর একজন 'প্রাউড রেমিয়ান' হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে। বলতে পারবে– DRMC তে কাটানো দশটা বছরই তোমার জীবনের সেরা সময়। DRMC কে শুধুই কলেজ হিসেবে দেখো না–নিজের বাসা হিসেবে দেখো, নিজের 'হোম গ্রাউন্ড' ভাবো। হোম গ্রাউন্ডে যেকোনো টিমকেই হারানো অনেক কঠিন।

শেষ করব ২০৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসের একটা কাহিনি দিয়ে। কলেজের গেইট দিয়ে একজন লোককে ঢুকতে দেখা গেল। সাথে তার ফ্যামিলি। গেইটে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হল না 'কোথায় যাবেন'? দারোয়ান ভাই লোকটাকে ভালো করেই চেনে। কিছুক্ষণ পর তাদেরকে দেখা গেল নজরুল ইসলাম হাউসের সামনে। তার ছোট মেয়েটা প্রশ্ন করল– আব্বু, আমরা এখানে আসলাম কেন? লোকটা বলা শুরু করল– তোমার দাদা এই হাউসের হাউসটিউটর ছিলেন। তখন আমি একদম ছোট, দুধের বাচ্চা! ...

অনুভূতি

অনিক সাহা
কলেজ নম্বর : ১০৬৯৬
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-চ (প্রভাতি)

আমার জীবনের ঘটনা মানুষকে বলতে গেলে রেসিডেনসিয়াল নামটা আসেই। ঘটনা সে হোক ভয়ংকর কিংবা হাস্যকর। যেমন– হাউসের পেছনের তকনোপাতা পোড়ানোর সাদা ধোঁয়া দেখে ভৌতিক সব কল্পনা করা, লোডশেডিংয়ে অদ্ভুত সব শব্দ করা। নতুন হাউসে উঠার এক সপ্তাহের মাথায় দেখা। সব ঘটনা বলা সম্ভব নয়। তবে কিছু বিশেষ বিশেষ অনুভূতি জানানোর চেষ্টা করব আজ।

গুরুজন হোক বা বন্ধু-বান্ধব। হোস্টেলের কথা উঠলেই সবাই আমার হোস্টেলের প্রথম দিনের অনুভূতি জানতে চায়। ২৬ জানুয়ারি ২০০৭। হোস্টেলে আমার প্রথম দিন। নাইটক্লাস হাউসেই ছিল। আমি এতই ক্লান্ত ছিলাম যে, নাইটক্লাস চলাকালীন ঘুমিয়ে যাই। পরদিন সকালে নিজেকে নীল মশারির ভিতর আবিষ্কার করি। রাতে আমাদের ওয়ার্ডবয় শহিদুল ভাই মশারি টাঙিয়ে দিয়েছিলেন।

লিখতে লিখতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল। স্থান ও চরিত্র একই। কিন্তু চিন্তাধারা ও জবাব একটু ভিন্ন। সাল ২০০৭। সম্ভবত শরৎকাল। পরিষ্কার ও সুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বলেছিলাম– "হে ঈশ্বর, কী দোষ করেছিলাম আমি? আমাকে মা-বাবার থেকে ৩০০ কি.মি. দূরে এই দেয়ালেঘেরা বন্ধ পৃথিবীতে আবদ্ধ করলে?" সেইদিন কোনো জবাব পাই নি।

সাল ২০১৫। মাস মার্চ। তারিখ সম্ভবত ২৮। এসএসসির শেষ লিখিত পরীক্ষা দিয়ে ভাবলাম স্কুল থেকে একটু ঘুরে আসি। মন বিষাদগ্রস্ত। একটামাত্র ভাবনা, আর মাত্র কয়েকটা ব্যবহারিক পরীক্ষাশেষেই এত বছরের স্কুলজীবনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন। আশ্চর্যজনকভাবে সেই পূর্ববর্তী মঞ্চ পুরাতন Sports department room এর পাশের ছোট মাঠটায় গিয়ে দাঁড়াই এবং আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম– "হে ঈশ্বর, বন্ধন যখন তৈরি করে দিয়েছ, তখন ভাঙছ কেন?" সেদিন বুঝি নি, আজ হয়ত বুঝি। ঈশ্বর মনে হয় সেই নয় বছর আগে করা প্রশ্নের উত্তর আমার মনে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে। মুখে কখনও প্রকাশ করি নি। কিন্তু হয়ত নিজের অজান্তে এই কলেজ, ধরাবাঁধা নিয়ম, সবুজ প্রান্তর, খোলা হাওয়া, সুবিশাল মাঠ এবং মর্নিং পিটিকে ভালোবেসে ফেলেছি। প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে আমার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ঘটেছে। তবু আমার মন কুদরত-ই-খুদা হাউসের সেকশন-২ এর বিছানায় পূর্বদিকে মুখ করে বসে আছে। দেখছে– বাইরের জগৎটা কেমন পাল্টে গেছে, তবু আমি পাল্টাই নি। সেই সাত বছরের অবুঝ বালকই রয়ে গেছি। একা।

একটি মনোগ্রাম

তাঈম আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৪২৯৪
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-চ (প্রভাতি)

আমার বুকের বাম দিকে ঠিক হৃৎপিণ্ড একটু বাঁকা হয়ে যে দিকটায় থাকার কথা, সেখানে দুপাশে ধানের শীষ আর তার মাঝখানে একটি ভাসমান নৌকায় প্রজ্বলিত এক রক্তবর্ণ মশাল। এটি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের মনোগ্রাম। আর এ মনোগ্রামটির পাশে আইডি কার্ড আর তার ডান দিকে নেমপ্লেট। আমি একজন রেমিয়ানের কলেজ পরিধেয় একটি শার্ট।

রেমিয়ানদের কলেজশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হয়। আর তাই প্রতিদিনই আমি আর এই রেমিয়ান পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত হয়েই কলেজে রওনা হই। আমরা দুভাই। আমার রেমিয়ান আমাকে গ্রীষ্মে 'ছোট' আর শীতে 'বড়' হাতা দেয়। শীতের সে সময়টায় আমার বড়ই একা লাগে। কিন্তু নিয়ম আর স্বাচ্ছন্দ্য যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, সেখানে আমিও সন্তুষ্ট।

তবে ব্যবহারিক ক্লাসগুলোতে দূর সম্পর্কের বড় দাদার আবশ্যকতা বেশি, তার নাম অ্যাপ্রোন। সুনিশ্চিতভাবেই রেমিয়ানদের এ নিয়মগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হয়। ৫২ একর জমির ওপর স্থাপিত এ কলেজের বিশাল ক্যাম্পাসে গ্রীষ্মেও থাকে পর্যাপ্ত দখিনা বাতাস–যা কখনই আমার ঘর্মক্লান্তি বা অবসাদের অবকাশ দেয় না। শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিশিক্ষক ও বিষয়শিক্ষকগণ বিভিন্ন পরামর্শ দেন ও পাঠদান করেন। এ রেমিয়ান গভীর মনোযোগের দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকে আর হাতে কলম নিয়ে লিখতে থাকে প্রয়োজনীয় নোট। আর আমি ও আমার চারপাশে অন্য রেমিয়ানদের পরিধেয়গুলোর সাথে রেমিয়ানদের নিয়ে কথা বলি, নিজ সম্প্রদায়ের সবাইকে দেখে ভালো লাগে এবং মাঝে মাঝে মনোগ্রামটার দিকে চোখ যেতেই গর্ব অনুভব করি।

শ্রেণিকক্ষের দেয়ালগুলোও যেন কখনও কখনও মুচকি হেসে জানিয়ে দেয়–এ শ্রেণিতে কত মহৎ ছাত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, কত একাদশ শ্রেণি যুগের আবর্তে পরিবর্তনের ধারায় চলছে। সময়ও চলছে তার নিজস্ব গতিতে। আর ক্যাম্পাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতা ঝরে পড়ছে আবার কতগুলো শক্তভাবে ডালে আগলে রেখেছে নিজেকে একান্ত স্বকীয়তার বলে। আর একটা রেমিয়ানের স্বপ্ন বোনা হচ্ছে একটি মনোগ্রামে যা আমারও উপরে, অনেক অনেক উপরে।

স্বপ্নবাস্তবতার গল্প

এ. কে. এম. শাব্বীর
কলেজ নম্বর : ১০৩১৫
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ঙ (প্রভাতি)

কতকিছুই তো ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে দূর দিগন্তে নিজেকে মিলিয়ে দিতে। ইচ্ছে করে দিগন্তের আবছায়ায় ছায়ামানব হয়ে থাকতে। ইচ্ছে করে আকাশের নীলিমার মতো নিজেকে রঙিন করতে। ইচ্ছে করে ঐ দিগন্তছোঁয়া পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে ঊর্ধ্বদিকে তাকিয়ে নিমীলিত লোচনে অচেতন জগতে প্রবেশ করতে। ইচ্ছে করে শরতের রঙিন আকাশের শুভ্র মেঘের সাথে জুটি বাঁধতে।

সব ইচ্ছা তো ইচ্ছাই থেকে গেল। অপূর্ণতার প্রাপ্তি সবসময়ই মানুষকে তাড়া করে বেড়ায়। অতৃপ্তি আছে বলেই তো তৃপ্তি এত মধুর। দুরাশা আছে বলেই তো আশা এত সুন্দর। অন্ধকার আছে বলেই তো আলো এত সুন্দর। বিশ্বাস আছে বলেই তো অবিশ্বাসের এত দাপট। অবিশ্বাসের দাপটে বিশ্বাস দরজায় দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বদিকে তাকিয়ে উন্মুক্ত চিত্তে কাঁদে আর নির্জন বনের একাকিত্ব বরণ করে। স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আর বিশ্বাস? সে তো অবচেতন মনের এক সম্ভ্রান্ত ধারণা। যে ধারণা মানুষকে আশাবাদী করে তোলে।

আজ ভাবতেই অবাক লাগছে– ছোটবেলায় যা অবাস্তব কল্পনা করতাম তা বাস্তবেও ঘটে। ইদানীং বাস্তবতা কল্পনাকেও হার মানাচ্ছে। তবে বাস্তবতা ও কল্পনা উভয়ই আপেক্ষিক। আমার কাছে যেটা কল্পনা, অন্য কারো কাছে সেটা বাস্তব হতে পারে। আবার আমার কাছে

যেটা বাস্তব, অন্য কারো কাছে তা কল্পনার জগতে স্থান নিতে পারে। বাস্তবতা আছে বলেই তো আমরা কল্পনার জগতে ডুবে থাকি।

কল্পনায় মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে মানুষ অনেক অদেখাকে দেখে। মানুষ স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে। বাস্তবতার দ্বারা মানুষ তার স্বপ্নকে ছুঁয়ে যেতে চায়। মানুষ চায় তার বাস্তবতা হবে কল্পনার জগতের মতোই বিস্তৃত। স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দরকার সাহস ও উদ্যম।

হিরোশিমা ও নাগাসাকি ট্রাজেডি : ইতিহাসের ধিক্কার

মোঃ ফাহিম আখতাব
কলেজ নম্বর : ১৪১৭৭
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-চ (প্রভাতি)

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিক। পৃথিবীর ইতিহাসে মহালজ্জার একটি দিন। হিরোশিমায় দিনটি ছিল যুদ্ধের অন্য দিনগুলোর মতোই। কিছুটা আতংকের, কিছুটা স্বস্তির। গুঞ্জন উঠেছে শীঘ্রই যুদ্ধ শেষ হতে যাচ্ছে। তাই মানুষের মনে কিছুটা হলেও নেমে এসেছিল স্বস্তি। বেলা আড়াইটায় সমস্ত আশা ধূলিসাৎ করে, ন্যূনতম মানবিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে হিরোশিমায় যেন ভেঙে পড়ে নরক। সমগ্র মানবজাতিকে লজ্জায় অবনমিত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যানের নির্দেশে নিক্ষেপকৃত পারমাণবিক বোমা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কেড়ে নেয় লক্ষাধিক প্রাণ। ছবির মতো সুন্দর শহরটি পরিণত হয় এক ভয়ংকর মৃত্যুকূপে।

হিরোশিমায় ফেলা বোমাটির নাম ছিল 'লিটল বয়'। এ বিস্ফোরণটি ঘটে ১৩ কিলোটন tnt এর সমান এবং এসময় তাপমাত্রা হয়েছিল ৩৯০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিস্ফোরণের পর এক মাইল ব্যাসার্ধের এলাকা জুড়ে ধ্বংসলীলা শুরু হয় এবং হিরোশিমার প্রায় ৯০ ভাগ বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। চারদিকে শুধু পড়ে থাকা লাশ, আহতদের চিৎকার, শিশুদের করুণ কান্না। বড় জীবন্ত হয়ে বেঁচে আছে সেই কান্নার সুর। বোমা নিক্ষেপকারী পাইলট পল টিবেলস বিমান থেকে এ ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য দেখে ভয়ে-আতংকে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন– "হায় ঈশ্বর, এ কী করলাম!" কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর রেশ কাটতে না কাটতেই তিনদিন পর নাগাসাকিতে ফেলা হয় দ্বিতীয় মৃত্যুদূত 'ফ্যাটম্যান'। বোমা হামলার ফলে নাগাসাকিতে আনুমানিক ৭৪০০০ জন লোক মারা যায়। আর হিরোশিমায় মারা যায় ১,৪০,০০০ জন। আর যাঁরা প্রাণে বেঁচেছেন তাঁরা বেঁচেছিলেন তেজস্ক্রিয়তার ফলে নিরাময়-অযোগ্য ক্ষত, বিকলাঙ্গতা ও দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে।

ইতিহাসের এ নৃশংস, কলঙ্কজনক ঘটনার নেপথ্যে ছিল অস্ত্রের উন্নয়নে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রত্যাশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। আণবিক অস্ত্রের জন্ম হয়েছিল এই ভীতি থেকে যে, হিটলারের জার্মানি একচেটিয়া শক্তির অধিকারী হয়ে গোটা বিশ্বে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়– জার্মানিতে এ ধরনের বোমা তৈরিতে ১টি প্রকল্প হাতে নেয়া ছাড়া কোনো কার্যকর উদ্যোগ আদতে হয় নি। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী ড. লিওজিলার্ড সর্বপ্রকার বোমা তৈরিতে উদ্যোগ নেন। এর ভয়াবহতার কথা বিবেচনা না করেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সমর্থন দেন তাঁকে। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে জানানো হলে শেষ পর্যন্ত এ অস্ত্রকেই বেছে নিলেন তিনি। আর মানবতা হার মানল নৃশংস বর্বরতার কাছে।

আজ একবিংশ শতাব্দী। ১৯৪৫ সালের ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে। বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। সেই সাথে উন্নতি হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রেরও। বিশ্বে আজ যত পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে তা দিয়ে গোটা পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা সম্ভব। এখনকার পরমাণু অস্ত্রের তুলনায় হিরোশিমা-নাগাসাকির বোমাগুলো নিতান্তই শিশু। তাই একথা আজ বলাই যায়– গোটা বিশ্বকে যেকোনো মুহূর্তে বরণ করতে হতে পারে সেই করুণ পরিণতি। আমার এ লেখা হয়ত উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছাবে না, ম্যাগাজিনেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তবু আমাদের সবার উচিত এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠা, আর যেন না ফিরে আসে সেই ভয়ংকর দিন, যেন আর না শুনতে হয় অন্তিম আর্তনাদ, বাঁচার আকুতি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ অঙ্গীকার রক্ষাই হয়ে উঠুক আমাদের কাম্য।

অসমাপ্ত বিদায়

ফারহান সাদিক
কলেজ নম্বর : ১৪২৪৫
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-চ (প্রভাতি)

বার্ন ইউনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। শফিককে বার্ন ইউনিটে আনা হয়েছে। চারদিকে পোড়া গন্ধ। শফিক নিজের শরীরের ক্ষত অনুভব করেও তাই বুঝল। চোখদুটো ঝলসে গেছে তার। অন্যদের অবস্থাও পত্রিকার মাধ্যমে আগেই দেখেছিল সে। সেই নিষ্পাপ মানুষদের কষ্ট, তাদের স্বজনদের বেদনা! শফিকের মাকেও যে এই দলে পড়তে হবে সে ও তার মায়ের কল্পনাতেও ছিল না।

"কিন্তু আমার কী দোষ বল মা? আমি তো প্রতিদিনের মতো কলেজে যাওয়ার কথা চিন্তা করে আগে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। প্রতিদিনের মতো সাতটা বাজে তুমি 'এই শফিক উঠ' বলে ডাক না দিলে হয়ত বা আজ আমার এখানে স্থান হত না। অবশ্য তোমার কোনো দোষ নেই মা, দোষ ভাগ্যের। ভাগ্য বড়ই সুন্দর! ছোটকাল থেকেই সকলের মুখে 'তুই খুব ভাগ্যবান' এই কথাটি শুনে এসেছি, এই তার প্রমাণ মিলেছে" শফিক বলল মাকে।

কলেজটার কথা খুব মনে পড়ছে শফিকের। প্রিয় ক্যাম্পাসের নৈসর্গিক সৌন্দর্য কি সে আর অনুভব করতে পারব না? সময় কেটে যাচ্ছে। ডাক্তার, নার্স সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবু যন্ত্রণা যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে। চারদিকে কেবল কান্নার শব্দ। এই শব্দের মাঝে মার কান্নার শব্দটিও শফিক খুঁজতে চেষ্টা করল। মাকে কখনও কাঁদতে দেখি নি সে। আজ কি তার ব্যতিক্রম হবে? মার কথা সাধারণত এত মনে পড়ত না তার। কিন্তু আজ যেন মায়ের চেহারাটি অন্ধকার চোখে উজ্জ্বল তারার মতো ভাসছে। বাবা গত হওয়ার পর মাকে মা-বাবা দুজনের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। অনেক ইচ্ছে ছিল বড় কিছু করে মাকে খুশি করবে সে। আফসোস এই পিশাচ নরঘাতকরা তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে শরীরটা অবশ হয়ে আসছে।

অবশেষে সে মুহূর্তটি এল। মায়ের বিকট কান্নার শব্দ কানে এল তার। ডাক্তারের কথা শুনে শফিক বুঝতে পারল সময় শেষ হয়ে এসেছে তার। বন্ধুদের কথাও খুব মনে পড়ছে। ওদের সঙ্গে আর আড্ডা দেয়া হবে না। ওরাও কাঁদবে তার জন্য। কেউ বা অনেক গালাগালি করে বলবে– "বলেছিলাম না তোকে, বাসে করে যাতায়াত না করতে"। "থাম ভাই থাম। হাতে আর সময় নেই, থাকলে তোদের সাথে আরো অনেক আড্ডা দিতাম। কতকিছু বলার ছিল তোদের।"

মার আহাজারি বাড়তে থাকল। শফিক বুঝল তার যাওয়ার সময় হয়েছে। সবার উদ্দেশ্যে তার শেষ বক্তব্য ছিল–

"চলমান আমি অসমাপ্ত পথে
কাঁদিসনে কেউ তোরা
আর কোনো মায়ের বুক হবে নাকো খালি
এই ভেবেই মৃত্যুতে আসুক পূর্ণতা।"

"এই দুনিয়াতে তোমরা নিজেদের ধন–সম্পত্তি জমা করিও না। এখানে মরিচা ধরে ও পোকায় নষ্ট করে এবং চোর চুরিয়া চুরি করে। কিন্তু বেহেস্তে মরিচা ধরে না, পোকায় নষ্টও করে না এবং চোর চুরিয়া চুরিও করে না। তাই বেহেস্তে নিজেদের জন্য ধন জমা কর, কারণ তোমার ধন যেখানে থাকিবে তোমার মনও সেখানে থাকিবে।" (বাইবেল প্রথম খণ্ড, মথি: ১৯–২১)

হাউসলাইফ

নাজিমুল হক সানি
কলেজ নম্বর : ৮৪৭৫
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ক (দিবা)

ভর্তি হবার জন্য প্রথম যেদিন এই কলেজে আসলাম, সেদিন একটা কথাই বার বার মনে হয়েছিল যে, আমি কি আসলেই এখানে ভর্তি হতে পারব? ভাগ্যক্রমে ভর্তি হতে পারলাম। তখন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষের সাথে তুলনা করেছিলাম। আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল ঈদুল ফিতরের ৭ দিন পর। জীবনে প্রথম বাড়ি থেকে এত দূরে এসেছিলাম। বিদায়বেলাটা ছিল খুবই বেদনাদায়ক। সুটকেস গোছানোর সময় মায়ের অশ্রুসিক্ত চোখদুটি দেখে মনে হয়েছিল আমি বুঝি জীবনের একটা বিরাট অংশ ফেলে রেখে যাচ্ছি।

যেদিন প্রথম পা রাখলাম হাউসে, সেদিন হাউসমাস্টার, হাউসটিউটর, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি, সিনিয়র-জুনিয়র সবাইকে অসহ্য লেগেছিল। তখন মনে হয়েছিল ডানা লাগিয়ে উড়ে চলে যাই আমার ছোট শহরটিতে। এভাবে কিছুদিন কাটল। হাউসের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বেশিদিন লাগল না। সহপাঠীদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, সিনিয়রদের আদর ও ভালোবাসা এবং জুনিয়রদের শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ নিজেকে নিয়ে গেল এক অন্যরকম উচ্চতায়। এখনো কানে ভাসে অধ্যক্ষ স্যারের সেই কথাটা– "তোমরা হচ্ছ রেমিয়ান, তোমাদের সকল বাধা অতিক্রম করতে হবে। যদি তা না করতে পারো তবে তোমরা মনে রাখবে যে, বাবা-মায়ের সাথে চরম স্বার্থপরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা করছ।" শ্রেণিশিক্ষকও একটা কথা বলেছিলেন– "বাবারা, তোমরা মডেল কলেজের ছাত্র। তোমরা এমনভাবে চলবে, যাতে করে অন্যদের মডেল হতে পারো।"

হাউসের প্রতিটা দিন শুরু হয় মর্নিং পিটি দিয়ে। সুখনিদ্রা ত্যাগ করে জগিং করা কিংবা ফুটবল খেলাটা মোটেই সুখকর ছিল না প্রথম দিকে। কিন্তু প্রতিনিয়ত করতে করতে মর্নিংপিটি শুরুর আগেই প্রস্তুত হয়ে থাকি। আগে থেকেই পরের দিনের ফুটবল ম্যাচের ছক কষতে থাকি। হাউস লাইফের ডাইনিংটা লাগে আরো আকর্ষণীয়। ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজানো থাকা সত্ত্বেও খাবারে হাত দিই না। সকলে একসাথে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' বলেই খাবার শুরু করি। আবার খাবার শেষ হবার পর কেউ জায়গা ছেড়েও উঠি না 'শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্' না বলে।

হাউসলাইফের আরেকটা মজা হচ্ছে গোসলের সময়টা। হাউস থেকে প্রতিনিয়ত ভবিষ্যতশিল্পী জন্ম নেয়। তাছাড়া পানি ছিটানো যে বড়দের খেলা হতে পারে তা হাউসে না আসলে উপলব্ধিই করতে পারতাম না। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে যখন খবর আসে– প্রিন্সিপ্যাল স্যার এখন হাউস পরিদর্শনে আসতে পারেন কিংবা তিনি নিচে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, তখন আমাদের অবস্থা কেমন হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২-৪ মিনিটেও যে রুম পরিষ্কার করে লকার, বিছানা গুছিয়ে পড়ার টেবিলে ভদ্রছেলে বনে যাওয়া যায়, তা বোধ হয় হাউসে আমাদেরকে না দেখলে বোঝার উপায় নেই।

মাগরিবের নামাযে মসজিদে যাওয়াটা হচ্ছে আরেকটি ব্যতিক্রমী অনুভূতি। একসাথে ৬ হাউসের ছেলেরা লাইন বেঁধে নামায পড়তে নিয়মিত যায় মসজিদে। নতুনদের সাথে পরিচিত হবার কিংবা কুশলাদি বিনিময় করার এর থেকে বিকল্প সময় আমার জানা নেই।

হাউসলাইফের রুমপার্টির স্বাদ পৃথিবীর কোথাও আর পাব না, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। মরিচ, পেঁয়াজ, শসা কাটা; এরপর বড় বালতিতে মুড়ি-চানাচুর মাখিয়ে ভজনখানেক ছেলে হইহুল্লোড় করে খাওয়া যে কত মজার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এভাবেই চলে আমাদের সুখ-দুঃখে, আনন্দ-বিষাদে ভরপুর হাউসলাইফ।

একদিন আমি, আমরা থাকব না, কিন্তু চাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের হাউসলাইফ এভাবেই চলবে। নতুন নতুন ফুলের কলি এভাবে আসবে, পরিচর্যা পেয়ে সেগুলো ফুটবে, তারপর তাদের সুবাস ছড়িয়ে দেবে সমাজের চারদিকে।

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি -এবং নির্বাণ পরম সুখ। (ত্রিপিটক)

ENGLISH WRITINGS

The Golden Bengali

Zubayer Khan Borat
College No : 8070
Class & Shift : IV-A (Day)

There was a dream,
In the heart of Sheikh Mujibur Rahman.
He would like to build up,
The Golden Bengali.
But, he could not do it,
He was martyred.
By the few unruly soldiers
And some hypocrite officers.
I have sowed the seeds of Mujib's
Dream in my heart.
We will become the ideal man
For building our country.
We must build our Golden Bengali
The Bengali of Sheikh Mujibur Rahman.
We will fight against
Al-Bador, Rajakar and Al-Shams.
Then it will be possible
Of our dream.
Golden Bengali, Our Bengali
The Bengali of Sheikh Mujibur Rahman.

True Partner

Abrar Hossain
College No : 12948
Class & Shift : VI- A (Morning)

DRMC is the best place
For proper education.
It gives us all the time
Life's best solution.
It disciplines us
To accept what's true
This is how what all evils
We try to be through.
It nurtures us
Through discipline and character
In our mission to the great
It's our true partner.

Jokes

Sheikh Bidito Haque
College No : 13086
Class & Shift : VI- A (Morning)

Lady: Is this my train?
Man: No, it belongs to the Railway Company.
Lady: Don't be funny. I meant to ask if I can take this train to Dhaka.
Man: No, I'm afraid it's too heavy.

Realization

Md. Abrar Jahin
College No : 12587
Class & Shift : VII-B (Morning)

When I was a child,
I couldn't understand
Which side my elders
Would stand.
As I was inexperienced,
I didn't know
That the right way of life
Was what they showed.
My parents told me,
"Your merit is great
But industry's your best friend
And can help you earn bread."
I didn't pay heed
And went on with my deeds.
So, the inevitable happened
I had to come on the streets.
And I had to beg which was someting I hated
But what could I do,
I felt like I had lost my legs
And died the way of any beggar
In pair, cradle and in despair.
Suddenly, I woke up with a sigh of relief
And understood that it was only a dream
I touched my face
And felt traces of tears.
That were of those tragic fears.
Now that I understand
That my welfare
Is where my elders stand.
And I vow to be
A better son,
A friend to be believed
And a person to be loved.
I want to live to the expectation
So, I can give them peace.
And to be the one
They always wanted me to be.

Moon

Tamzeed Ahmed Alvy
College No : 5432
Class & Shift : XI-C (Day)

There's a moon, up in the sky.
She is glowing bright up in the high.
She comes and goes,
Leaves a mark for those,
Where the love has rose.
The mystical clouds crawl behind her,
They grab her beautiful gown,
And they go around her to frown.
She opens her book of enchantment,
She reads them out,
But some just get fainted.
She crawls here and there,
In search of us every where,
And when she finds us,
She doesn't leave us mellow any where.
London, Paris, Newyork, Millan,
Or a village full of people with lots of plans,
She will go there and make them say-
"Yes I Can".
It's time to go says the moon,
She will be back tomorrow,
She will be back to inspire us,
But a feeling of emptiness arouses,
Gently taking us back to slumber
She hides again in the trees.

My College

Sagor Sheikh
College No : 1520998
Class & Shift :XI-C (Day)

Dhaka Residential Model College,
Has increased our out knowledge.
We have a science club ,
Here we don't find any behalf,
Because they displayed us many documentary,
By using the best inventory.
Have you ever seen?
Our large college canteen?
There you will find really fresh food
For health, it is also so good.
Namaz must be offered
And this rule will never be broken
As the door of wash room is open
We say our prayer
Library with a lots of books,
Hold us light like books.
Here not only have the books of ghost and action,
But also have the books of science fiction.
Teacher with smiling face,
Have you ever guessed
Only you will find,
If you are not blind.
Our discipline is so tight
That we can't fly like a kite
I want to thank a lot
Because, the best college, I've got.

Strive for Excellence

Md. Musfikur Rahman Fahim
College No : 1520729
Class & Shift : XI-D (Day)

This is DRMC
Here happiness we see.
We have strong patience
We strive for excellence.
This is DRMC
Here generocity we see.
We have strive confidence
We strive for excellence.
Yes, it is DRMC
Enlightened life we see,
All we have strong friendship
We strive for excellence.
Gaining right designation
DRMC is our ambition.
Feeling all inspiration
DRMC is our station.

আর্টিস্ট : নাবিল ফারুক রাফিন
কলেজ নম্বর : ৬৫০৩ শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-খ (দিবা)

To The Martyrs

Khondoker Abu Jor Gifaree
College No : 14248
Class & Shift : XII-E (Morning)

(Dedicated to the memory of the valiant sons of the soil for whose supreme sacrifice we are enjoying freedom)

The whole Nation fought for freedom
Three million embraced martyrdom,
Sketched a new country
In the map of the world;
Inscribed a new flag
With a sea of blood.
We pay homage to you all
Bowing our heads,
History recalls you.
For your heroic deeds
Long live Bangladesh
Long live martyrs,
Inspire us from Heaven
In all disasters.

If I were a Magician

Mahadi Bin Mamun
College No : 13892
Class & Shift : IV-B (Morning)

If I were a magician, I would do many things. I would make a rocket and go to the Mars. Then I could meet aliens there. I would go to the moon and talk to the old lady there. I would go to an ocean and catch many tuna fishes because it is my favorite sea food. I would make goals in every kick while playing football and make Bangladesh Cricket Team win in every match. In my school, I would show magic tricks and find my pens or pencils back when they were lost. I would do my homeworks within seconds. I would clean my school campus with my magical power. The great thing that I would do with my magical power, is to help my mother in her household chores. I would also help the police to arrest the thieves and the robbers. Thus I would help the people of our country to live in peace.

A Trip to Chandpur

Ayman Abir
College No : 1540054
Class & Shift : III-A (Day)

Everyone has beautiful days in his life. I also have some beautiful days in my life. My father and I went to Chandpur in summer vacation. I went to Chandpur by motorcycle. Before two years, we went to Chandpur by launch. It was very interesting. The launch was very big. Its name was 'M. V. Sonartori'. I also saw other big launches, such as:- 'Eagle', 'Rof-Rof', 'Al-Borak', 'Imam Hasan' etc. We passed five rivers, the Buriganga, the Shitalakkha, the Dakatia, the Meghna. It is very interesting

that the Padma and the Meghna meet together but the color of the rivers is different. The travellers can easily distinguish the junction of these two rivers. The Buriganga river is very dirty now. We saw small boats in the river. I saw that there were some fishermen in a boat. They were catching fish. We also saw some small houses so far from the river. But the journey by motorcycle was very interesting. I felt so funny when I saw paddy fields, cornfields and line of banana trees. When I reached to my grandfather's house, I became sad seeing my grandmother. Because she was sick. But I was also happy because I made a lot of fun with my cousins. We ate the fish of our own pond. Chandpur is famous for Hilsha fish. We visited Boishakhi Mela in Chandpur where I saw a crowd of people. The day was very enjoyable. My father bought me a blue toy car. I stayed two days in Chandpur. I will never forget the trip to Chandpur.

The Silly Goats

Mohammad Abdul Hasib Zehad
College No : 14020
Class & Shift : IV-A (Morning)

Gab and Gib are two goats. Gab is white and Gib is black. They live on opposite sides of a river. There is an old wooden bridge across the river.

One day the two goats decided to cross the river. They met in the middle of the bridge. They stopped. They could not move. The bridge was too narrow.

Only one goat could cross the bridge at a time, "Go back and let me pass first", said Gab.

"No, you go back and let me pass first," said Gib.

"Let me pass. I was here first," said Gab. He was angry. "No, I was here first!" said Gib. He was also angry. Both goats stamped their feet angrily. The old bridge cracked. The two goats did not notice.

"I shall fight you if you don't let me pass," said Gab.

"All right," said Gib. "Let's fight." The two goats looked at each other.

Then, Gab used his head and hit Gib. Gib did the same to Gab.

They pushed and pushed each other. They stamped their feet and fought. The old bridge started to shake.

C-R-A-C-K! The bridge broke and fell.

"Aaahh!" The two goats screamed as they fell into the river. Both Gab and Gib could not swim. They could not get out of the river. Soon, the two silly goats got drowned.

[We must think of others and not be selfish.]

Sugar

Mahfuz Alam
College No : 7508
Class & Shift : V-C (Day)

Sugar makes food taste delicious. You can mix it into cakes, and stir it into cups of tea. It's also found in carrots, capsicums, cucumbers, peaches, peas and potatoes. Let's discover more about this all-time favourite ingredient.

Plants and sugar : Sugar is a natural product. It comes from plants. They make it through a process called 'photosynthesis'. Plants use energy from the sun to combine the carbon dioxide they absorb through their leaves and the water which they obsorb through their roots to make sugar. So sugar is found in every fruit and vegetable.

In Bangladesh, we get most of our sugar from sugar cane, a giant grass, which grows well in warm climates with plenty of bright sunlight, lots of rainfall and rich soil. Sugar cane looks a bit like bamboo. It has a tough, shiny outer layer which protects the sweet, juicy fibre inside.

But in some areas of Europe and America, it is too cold to grow sugar cane. So in those places sugar is made from sugar beets, root of vegetables that are related to carrots. Unlike sugar cane, which stores sugar in its stalk, beets store sugar in their thick, white roots.

Even though sugar cane and sugar beets are very different plants, the sugar they produce tastes and looks identical. How is sugar produced? Most Bangladeshi sugar comes from Rangpur, Dinajpur etc. Sugar cane farmers plough furrows in the soil, then lay pieces of cane stalk, called setts, along the ground. The young cane grows extremely rapidly in the warmth and humidity of the tropics, and can reach two to four metres in height in just over a year.

Once the sugar cane is full of sugary sap, it's harvest time. Sugar cane was used to be cut by hand. It was an exhausting, back-breaking work. These days, big machines are used.

The machines strip the leaves from the stalks, which are then chopped into little pieces. The chopped stalks are then taken to the refinery as quick as possible so the valuable sugars can be extracted while they're fresh. Special tram tracks help speed the cane from the field to the refinery within a day of being cut.

Sweet smells: Sugar is a wonderful ingredient because it doesn't just taste good- it makes food look and smell delicious too.

When biscuits and cakes are baked, the sugar in the mixture reacts with chemicals in the other ingredients and gives cooked food a woderful golden brown colour. When sugar is heated above its boiling point, it gives off a delicious aroma. Sugar attracts water, so it helps food stay moist and fresh. It also provides food for yeast, which makes bread rise.

Sugar also gives us essential energy, which is especially helpful when we're playing sport or bushwalking, or when we're sick. So next time you're enjoying something sugary and sweet (but remember, it's not good to have too much of a good thing) think of how marvellous nature is turning sunlight, carbon dioxide and water into sugar.

Planets In Our Solar System

Azraf Aqil
College No : 7578
Class & Shift : V-C (day)

Space is all around the Earth, high above the air. There are many exciting things in space. The sun is our nearest star which is surrounded by a family of circling planets called the Solar System. The Sun's gravity pulls on the planets and keeps them circling around it. There are eight planets in our solar System.

Mercury : Mercury is the nearest planet to sun. It's round, cratered ball of rock and it has no air. The sunny side of mercury is boiling hot but the night side is freezing cold. As it spins round slowly, the night side has time to cool down and there is no air to trap the heat.

Venus : Venus is the hottest planet because it's completely covered by clouds that trap the heat, like the glass in a greenhouse. Venus has poisonous clouds with drops of acid that can burn our skin. These thick clouds don't let much sunshine reach the surface of Venus. Venus has hundreds of volcanoes, large and small all over the surface. A year on Venus is 225 Earth days.

Earth : The Earth is the only planet with living creatures because of water. The inner core at the center of the Earth is very hot and keeps the outer core as liquid. Outside this is the mantle, made of thick rock. The thin surface that we live on is called crust. The Earth's atmosphere is made of a perfect balance for us to breathe and live. Earth has one moon and it has no rings. The Earth tilts, so we have different seasons as the Earth moves around the Sun. Day and night happens because the Earth is always turning. Earth makes a complete orbit around the sun in about 365 days which is a year on Earth.

Mars : Mars is very dry, like a desert, and covered in red dust. The iron oxide prevalent on its surface gives it a reddish appearance. Mars has two moons named Phobos and Deimos. Mars is very cold. Mars is rocky with, volcanoes and craters all over it. The Olympus Mons of Mars is the second highest mountain within the Solar System. Mars has about one-third the gravity of Earth. Mars makes a complete orbit around the sun (a year in Martian time) in 687 Earth days.

Jupiter : The most massive planet in our Solar System with dozens of moons and an enormus magnetic field, Jupiter forms a kind of miniature solar system. Jupiter is a gas-giant planet and therefore doesn't have a solid surface. Jupiter's atmosphere is made up mostly of hydrogen (H2) and Helium (He). Jupiter's Great Red Spot is almost a 300 years old storm. Jupiter makes a complete orbit around the sun (a year in Jovian time) in about 12 Earth years.

Saturn : Adorned with thousands of beautiful ringlets, Saturn is unique among the planets. Saturn is a gas-giant planet and does not have a solid surface. Its atmosphere is made up mostly of hydrogen (H_2) and helium (He). Saturn has 53 known moons with an additional 9 moons awaiting confirmation of their discovery. Saturn makes a complete orbit around the sun (a year in Saturnain time) in 29 Earth years.

Uranus : Uranus is the only giant planet whose equator is nearly at right angles to its orbit. Uranus is an ice giant as it's so far from the sun. Uranus has an atmosphere which is mostly made up of hydrogen (H2), helium (He) and a small amount of methane (CH_4) which gives Uranus its blue colour. Uranus has faint rings. It seems to "roll" around the sun. Unlike most of other planets, which spin upright like a top, Uranus spins on its side as it has a retrograde rotation (east to west). Uranus makes a complete orbit around the sun in about 84 Earth years.

Neptune : Dark cold and whipped by supersonic sounds, Neptune is the last hydraten and helium gas giants in our solar system. Neptune's atmosphere is made up mostly of hydrogen (H2), helium (He) and methane (CH_4). It has bright blue clouds that make the whole planet look blue. Above these clouds are smaller white streaks. Neptune has 13 confirmed moons. Neptune makes a complete orbit around the sun (a year Neptunian time) in about 165 Earth years).

The Prehistorical Animal

Nabil Amin
College No : 13121
Class & Shift : VI-A (Morning)

The world is full of different kind of animals. All the animals are created by Allah. One of them was dinosaur. But the dinosaurs are no more on the earth. The dinosaurs lived generally in the Triassic, Jurassic and Cretaceous period 65 million years ago.

The dinosaurs were of many kinds like: Therpods, Sauropodomorphs, Thyreophorans, Ornitopods, Marginocepbatians ect.

In the Theropods the largest dinosaur was Tyrannosaures (40ft). It was also the largest carnivorous dinosaur. It lived by eating the flesh of other dinosaurs.

There was also other dinosaurs in Theropods like Allosaures (36ft), Baryonys (30ft), Eustreptospondylus (25ft) etc. They were carnivorous. In herbivorous there were Struthiomimus (11ft), Grallimimus (13ft) etc available in theropods.

In Sauropodomorphs, there were much herbivorasis and long necked dinosaurs. There were: Diplodocus (90ft), Melanorosaures (40ft), Brachiosaures (60ft), Brontosaures (50ft), Plateosaures (30ft), Riojasaures (36ft), Saltasaures (40ft), Cetiosaurus (59ft) etc. They lived by eating grass and trees.

In Thyreophorers, there were most herbivorous dinosaurs. They were big. They were: Stegosaures (40ft), Tuojiangosaures (23ft), Kentrosaures (16ft), Edmontonia(40ft), Euphocephalus (35ft), Pinocosaures (17ft) etc. They lived on grass, vegetables.

In Ornithophds, there were grass eating dinosaurs. Some of them are Iguandon (35ft), Gryphosaures (25ft), Coritbosaures (35ft), Parasaurolophus (40ft).

In Marginocephaliars, there are the domed head Pakisefa losaures (30ft), Stegoceras (20ft). The others were triceratops (30ft), Protoceratops(9ft) Pssitcosaures (20ft), Syrecoasured (18ft) etc available.

From the dinosaurs the largest was Diplodocus (90ft) and the smallest was tecnosaures (3ft). Many people thought that the dinosaur died in the rise of the volcano. It may be truth. The scientists say that the dinosaur died in the flow and rise of volcano.

A Journey To Malaysia

Rafsan Chowdhury
College No : 13402
Class & Shift : X-D (Morning)

For the first time, I visited Malaysia last year on February. Now, I am going to share my views and experiences of visiting Malaysia with my family.

The flight was on 2nd February. At 2nd February, 2014 we woke up at 6:30A.M and started our preparation to go to the Airport. I took some cloths, a diary, a travel book and other necessary deeds in a travel bag. Our flight was on 11:00 A. M. We started our Journey to the Dhaka International Airport at 8:00 A. M. We reached there at about 9:00 A. M. We went through the Departure by showing our passport and giving much information on our personal details. We and our baggages were scanned and checked. Then we were finally approved to wait for the flight in the waiting room. After half an hour we were finally announced to step on the Airplane. It was Malaysian Airlines Boeing 777 which can carry 300 passengers. There were three rows in the cockpit. Two were situated by the windows and one in the middle. Our tickets were business class and I got my seat by the window. After running about 3.5 kilometers our boeing 777 took off and we finally started our Journey to Malaysia. In that day the climate was good and very clear. I looked out the windows. We were almost over the clouds. What a beautiful sight! The white clouds gathering together created a great scenery by reflecting sunlight. After half an hour of taking off the air crues came to us with different foods and Juices.

Bears and alcholic drinks were also available in their rolling trays and moving trays. I took one glass of Apple Juice. The flight duration was near 2.5 hours. At a time, we were also served a dish of Malaysian food culture. But I didn't find it a tasty dish. I will not say that the dish was not tasty as I am a Bangladeshi. It might be tasteful to Malaysians or Singaporeans because of their different food

habit. I only took the youghurt as it was a healthy drink. After a few minutes our flight captain (the pilot) declared that we were nearly crossing Malaysia's border line. We would land after 10-15 minutes. He suggested us to get ready. From my experience of travelling Malaysin Airlines I want to mention that this Airways was not so good for the passengers who had the problem of vomitting as I vomitted on the board of this plane. During flying in the sky it trembled a little bit and remained unparalled. By the by we reached the airport at 1:00 p.m. The Airport was adorned with many modern teachnoogies land facilities whch are not often shown in the under developed countries Airport. Showing our passport and checking everything we started our Journey expedition to the 'Grand Season' Hotel which was situated in the Kualampur city. A microbus was previously hired, the driver carried our baggges and we finally started our Journey. The mircobus was running at a great speed. I think it could be more than 130 kilometers per hour. The roads were so wide and perfectly plain that I could hardly find discomfort. Many expensive cars like Audi, Mercedes Benz, BMW etc. were available in the roads which are rarely seen in Bangladesh. However we reached the Hotel at about 2 o'clock. It was a 3-5 star hotel.

Our room was pre booked and it was on 32th floor. In the room there was a big wide window from where we got a good view of the full Kualalumpur city. After having bath we had our launch at the buffet. There were many items of foods displayed in order. You just need to collect the foods of your choice. You can eat limitlessly in a buffet. Nobody will obstruct you.

We were fully tired that day. So, we didn't move to any where.

Visiting KICC : The next day in the morning we started our Journey to the Kualalumpurcity centre [KLCC] It was a 96 floored building situated at the middle of the Kualalumpur city. The first 3-4 floors (1 am not exactly sure) were markets and the towers were offices. Everthing even cloths were very expensive there. We brought some cloths and ate at a restaurant. In the restaurant we wondered when the food was served in a coocking pot. It was traditional food serving style of Malysia. The Malaysians usually eat half boiled or half coocked vegetables as it is healtheir.

Visiting KL city gallery: The same day we visited KL city gallery. It was a place where the culture and developing history of Malaysia was saved and shown. Once Malaysia was a very poor country. It was under developed and so indisciplined. How Malaysia became so developed and urbanized? You will know about these facts in the KL city gallery. You can also be familiar with Malaysian cottage industry there.

Visiting KL Bird Park : The next day on 4th February we started our trip to KL Bird Park which was a renowned ecotourism destination situated right in the heart of Kualalumpur. It needs only 10 minutes driving away from the Kualalumpur city centre. It was the home more than 3000 birds of which 200 species of local and foreign birds. One of KL Bird Park most extra ordinary features is that birds are let free in the aviary which closely resembles their natural habitat. With this free flight concept, birds are able to breed naturally in this unique environment. This place is 100% secured with nets. So, the birds cannot fly away from this area. There was a small shop and a restaurant.

Foods are expensive almost everywhere in Malaysia. From the restaurant, I took freezed green coconut which cost RM (Ringhit Malaysia) 28. It was nearly BDt 700 then . We returned in the noon.

Visiting Sunway Pyramid: The Sunway Pyramid was one of the biggest shopping mall of Malaysia. The attraction of here is ice-sketting. Malaysia is a country of terrible heat 'sun way pyramid ice' is the place where you will get a sensation of cold weather. Wearing gloves and ice sketting shoes you can also get on the big ice and sket with other. Though it is a little bit difficult, it is a very amazing entertainment.

Genting highlands: Genting highlands resort which is a theme park hotel is situated at genting highlands 69000, Malaysia. It is one of the most attractive places of Malaysia. The resort was established on the middle of a peak, in the clouds. You can touch the clouds from the resort. We had to travel a long distance by the cable cars. These cable cars allow you to take a breath taking views of nature.

It only costs RM 6.4 per person. There are many attractions like circus, magic shows rides etc. in the resort which you must see if you visit Malaysia. We were there for three days.

I also visited many other places like sea beach which is also an attracive place of natural beauties. But everything cannot be mentioned through description. Though Malaysia is a very urbanized country, it is also a country of natural beauties and resources. You will see different types of people in different places in this country. Now Malaysia has become one of the most visiting places of the international travellers. However, we returned our homeland Bangladesh unfortunately by the same Airlines on 9th Febraury, 2014. Though it was not my first time of travelling outside of the country. I really enjoyed my visiting

Laughing kingdom

Leehan Hayder
College No : 13034
Class & Shift : VI- A (Morning)

1. Rono : What's in your bag?
Jawad : Guava.
Rono : Will you give me one?
Jawad : Ok. But if you tell me how many guavas are there, I shall give you both the guavas.
Note : Jawad has told that there are two guavas (both the guavas). So, Rono has got the answer of the question because of Jawad's foolishness.

A Visit to Thailand

Rubaiat Fardin
College No : 12923
Class & Shift : VI-A (Morning)

It was August 2013. I was a student of class four. That time, my family planned to visit Thailand. I became very excited hearing this. But unfortunately my mom and dad were so busy that they could not go with us. At last I went to Thailand with my aunt's family.

We went to Thailand on 11th August 2013. There were my aunt (mom's sister), my uncle, my brother and my uncle's friend with his wife and two children with me. My grandma and her elder sister also went with us. Our flight was on 11:00 am. We reached Thailand at 2:30pm (local time). We landed on Bangkok airport. From there we started for Pattaya in the afternoon . It was a dull rainy day. We reached pattaya in the evening. We went to our hotel. Then after having a rest, we went to see a famous show named 'Alcazar' at night. It was a show which was performed by a group. That show was amazing. We came to hotel and had our dinner and then we slept at night. The next day, we all went to the pattaya sea beach. We were swimming in the sea. I was enjoying the scenic beauty of that island. We had lunch in an Indian restaurant. In the afternoon we went to the nong noch village. I saw an elephant zoo. Some of the elephants were in cage and some were open. We saw the elephants. My uncle's friend's daughter and I rode on an elephant. It was very interesting.

Then in the evening. we came back to the hotel. In the next day, we went to Bangkok from Pattaya. It took so much time to reach to Bangkok. That's why we couldn't do anything that day. The next day was more interesting. That day we all went to the safari Park of Bangkok. We saw different animals and birds there. They were so charming. I saw a Royal Bengal Tiger with its kid. We watched 3 amazing shows in the park. They were- Orang Utan show (Dolphin show), Elephant show and strunt show. I enjoyed a lot. At night our parents went for shopping but we children were very tired. So, we stayed in the hotel. On the next day, we went to Siam ocean (under water world). We rode on a glass bottom boat there. It was a boat made of glass. We saw many fish from the boat. Actually it was an aquarium and we were inside the aquarium with the boat. We had lots of fun there. Later on we watched a 5D short film. In this film, the chair moves by the movement of the characters of the film. It was very scary for me as we watched a 5D horror film. In the evening, we went to one of the most famous shopping malls of Thailand, MBK. We did lots of shpopping from there. We came back to hotel at night. On the very next day, all of us were very busy as that was the day for coming back to Bangladesh.

We checked out from the hotel in the afternoon and started for the airport. At last in the evening we left Thailand and we reached Bangladesh at night safely. I enjoyed so much in Thailand. It was a great experience in my life.

চারুচিত্র

মোঃ রেদোয়ানুর রহমান মাহি
কলেজ নম্বর : ১৪০৭০
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-খ (প্রভাতি)

মাহদি আল-নাহিয়ান
কলেজ নম্বর : ১৩৩৯৯
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-ক (প্রভাতি)

এস. এম মোনতাসির পুরব
কলেজ নম্বর : ১২৬১৮
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-খ (প্রভাতি)

মোহাম্মদ সামি খান
কলেজ নম্বর : ১২৫৬৯
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-গ (প্রভাতি)

মোঃ রাইয়ান ভুঞা আদিব
কলেজ নম্বর : ১২৫৬৫
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-গ (প্রভাতি)

মোস্তফা ফাহিম আবরার
কলেজ নম্বর : ১২৬০০
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-গ (প্রভাতি)

তাজ-এ-আদনান খান
কলেজ নম্বর : ৬৪৯২
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-গ (দিবা)

অর্ক রিফায়েত হক
কলেজ নম্বর : ৭৬৭৩
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-ক (দিবা)

মোঃ মেহেদী হাসান
কলেজ নম্বর : ৫৭৭৯
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-ক (দিবা)

মোঃ সাবা আল মুকতার
কলেজ নম্বর : ৫৭৬৫
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-ক (দিবা)

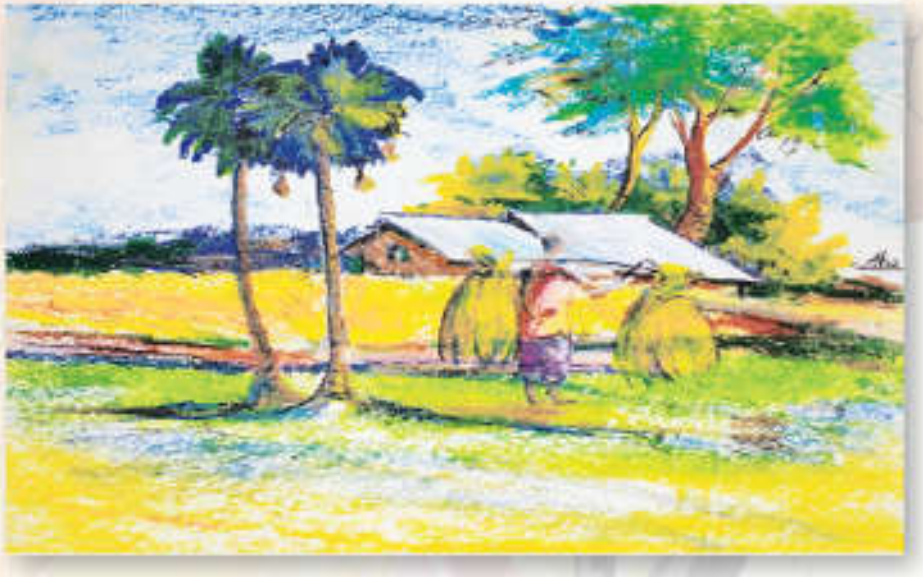

মাহির আহ্নাফ রাফিদ
কলেজ নম্বর : ১৫১০৪৭৩
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ক (প্রভাতি)

শুভজ্যোতি সাহা
কলেজ নম্বর : ৫২৪৭
শ্রেণি ও শাখা : নবম-গ (দিবা)

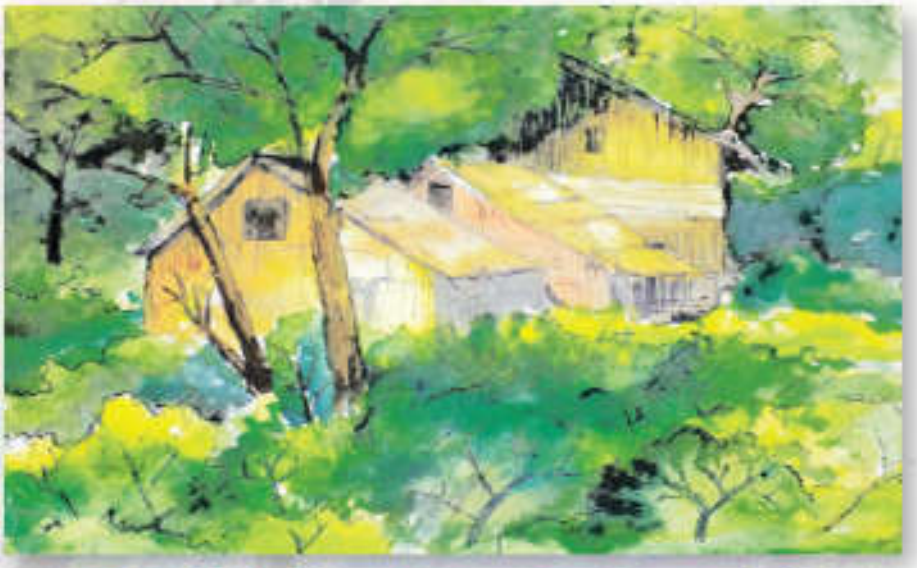

চৌধুরী ফাতিন ইলহাম
কলেজ নম্বর : ১১৬৫৭
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ঘ (প্রভাতি)

মেহেদী হাসান
কলেজ নম্বর : ১১৪৫২
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ঙ (প্রভাতি)

মুশফিকুল আলম অঙ্কুর
কলেজ নম্বর : ৪২২৪
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ঘ (দিবা)

যাদের পদচারনায় মুখর DRMC এর সবুজ চত্বর

তৃতীয় শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

তাহমিদ | জাহিন | আদিল | রিজওয়ানুল | তাজভী | সুফি | মুশফিকুর | তালহা

তামজিদ | রউফ | ফাহমিদ | জারিফ | মুহিব | আলিফ | সন্দীপন | ফারহান

আরাফ | আহনাফ | সাদ | রাহিম | পিয়াল | তানভীর | তাউসীফ | জিলানী

শাশীর | নাহিয়ান | তাবিব | তাহসিন | জাহিন | সাফনুর | মাহিন | নাহিয়ান

সারিম | সামীন | শাফিন | তালাল | তাহসিন | রাকিন | আরাবি | ওয়ারিদ

ইয়ন | অনন্ত | দ্বীপ | মুমিন | রাইয়ান | রূপম | আদনীন | সামি

জাওয়াদ | অনিন্দ্য | ওয়াফি

তৃতীয় শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রাফিদ | ফাইয়াদ | ফারহান

মোরসালিন | সাদমান | অরিক | যুলকারনাইন | ওয়াসিফ | মিতুল | আলভী | ইন্তেজাব

তৃতীয় শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

সৌরভ	মুহতাসিম	রুহাম	মুত্তাকিন	তূর্য	জারিফ	জিয়ান	ত্বোহা

শাফিন	মুহতাসিম	মাহিন	ইফতেখার	জাবির	মুনতাসির	মুরসালিন	রুবাইয়াত

আহসান	উৎস	সাকিন	রুহান	ফালাক	তৌসিফ	সুজাল	মুশফিক

ওয়াসিস	সোয়াদ	সাইহান	মোয়াজ	সামিউল	মেহরাব	সৌরভ	ইফাত

অর্পণ	সাকিব	ইশমাম	মেহরাব	অ্যালেন	আশিক

তৃতীয় শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রাসলান	শুভ্র	আবির	স্বপ্ন	অরূপ	নাহিয়ান	রাফি	স্রোত

মির্জা	অরুণাভ	জুবায়ের	অনি	মোস্তাকিম	তাসনিম	অভিজিৎ	রাতুল

আদিব	তাওয়াসসুফ	রাকিন	আবরার	সিফাত	দীপক	তানিম	রম্য

তৃতীয় শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মারুফ | আনাস | সামিন | খালিদুজ্জামান | তানভীর | ইমরান | রাইন | আতিক

সাব্বাত | নিলয় | শোভন | রাইয়ান | সাকিব | ফারদিন | অন্তর | সাহিয়ান

ফাহিম | মেহেরাজ | নুহান | তুর্য | প্রাচুর্য | শুভজিৎ | রাইয়ান

তৃতীয় শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আদিব | মাহির | জারিফ | তাহমিদ | আয়মান | ওমর | তাহসিন | আয়ান

জুহায়ির | আবির | মানসিফ | ইউশা | তাজুল | আবরার | মুস্তাকিম | শাহরিয়ার

আদিত | জুনায়েদ | য়াসিন | আসহাব | রাদ | আইয়াম | কৌশিক | ফারহান

শাহিল | নাঈম | আহনাফ | রহমান | সুহাইল | রিফাত | রাইয়ান | নাফিজ

ফাহিম | অরিত্র | মাহিন | সুবর্ণ | মুস্তাইন | আহনাফ | রাফিদ | ইব্রাহিম

তৃতীয় শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আদিব · নাবিব · তাইমিন · ইহ্‌তিমাদ · জাবির · নাবিল · হামাদ · মাহমুদুল

আহনাফ

তৃতীয় শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

অর্ণব · গৌরব · অতুল · জিহান · ইশতিয়াক

সারজিল · মাহিম · মুনতাকিম · মাহিম · আতেফ · শাহরিয়ার · ইয়ামিন · জুলকারনাইন

মাহির · হাসিব · শাহরিয়ার · রাফিন · জুবায়ের · রাজিন · তামীম · রোহিত

সাদিক · আঈমান · মুহতাসীম · রেজওয়ান · শুভাশিস · মাসরুর · তানজীল · ওয়াহিদ

সামি · মুয়াজ · অমি · সাজিদ · ফাহিম · আনতী · মুশফিকুর · রিয়াজুল

অমি · সাইফ · অলিভিল · আন্দালিফ · ইস্পাহান · যারিফ · তাহসিন · মুসাররাত

রোহান · ফারহান · কমল · আরিফুল · ঈশান

তৃতীয় শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

রিয়ান | ফয়সাল | শাইয়ান | ফারহান | ওয়াসি | আইমান | রাফিন | আরাফ

নাফি | সিয়াম | আরিয়ান | শান | সামীন | সাদ | লাবিব | হিমেল

ইশরাক | কিশোর | ফারহান | রাফিন | ওয়াকিফ | আলিফ | সাইফ | কাজিম

আনাম | ইফতেখার | লাবিব | রাফিন | তাওসিফ | মুনতাকিম | রাকিব | সাব্বির

রফিন | উৎস | ফাইয়াজ | ফারদিন | আরমান | লাবিব | আইমান | ফাহিম

আলভি | তানজিম | নামিদ | সাজ্জাদ | ঈশান | রাইয়ান | আহনাফ | রাহাত

মুশফিক | আহনাফ

চতুর্থ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ওমর | সাদিক | হামযা | আরিফ | আফিফ | আইমান | সাকিব | সুজন

চতুর্থ শ্রেণি (প্রভাতি)-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ

সান | নাসরাত | সাইফ | রিফাত | অন্তর | প্রত্যয় | মিফতাহুল | অনন্য

রবিন | আরাফ | মুসাব | অর্ণব | ইফতেখার | মাশরাফি | মোহাইমেন | নাহিন

জিহান | আফনান | রাফসান | টিমটিম | নিনাদ | সানি | নাসিফ | মাশিয়াত

মাহের | মেহেদী | নাবিল | শুভ্র | জাবির | আফিফ | জুন | রাজিন

নাজির | শাফিন | ইফতি | রাফিদ | ওয়াসির | মাশনুর

চতুর্থ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মাহিন | জোবায়ের | রাফি | মাহাদি | রাজিব | রাফিদ | অনন্ত | রাইয়ান

সাদাত | শাহমাত | কাইফ | শাফিন | তূর্য | সিয়াম | মাহীর | জাওয়াদ

রাইয়ান | রোহেল | ওয়ালিদ | আহনাফ | রাকিব | সামিদুল | সাকিব | হাসিব

চতুর্থ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

জারীফ সৌম্য সাজিদ সাবুর কাম্য রাতুল শারজিল আকিল

সাগ্নিক মাহফুজ সোহান রাহাত রিয়াজ শামিম মাহি মাহমুদুল

লাবিব তৌসিফ তালহা ফাইয়াদ মেদ তাহমিদ রিয়াসাত নিয়ন

মুনজির

চতুর্থ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফারহান ফাইয়াজ আশরাফিন রাশিক তাহসীন

আরাফাত মাহতাব মুত্তালিব আদিব এহতেশামুল শাকলাইন আহনাফ মওদুদ

জাবের মুদাসসির নাকিউর মুশফিক আলিফ রিয়ান তাওসিফ আরিয়ান

ওয়াসিফ শাহরিয়ার রাজিন মাশফি আব্দুল্লাহ সালমান শ্রেয়ান তামিম

মাশফিকুর সুনান মাহফুজুল নাফিম রৌদ্র এহসান তোয়াসিন শাহরিয়ার

চতুর্থ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

সামির | আব্দুল্লাহ্ | সালমান | মাশরাফি | ইনাম | মাহফুজ | তৌফিক | সাইফ

উথাল | জেলান | শাহিন | জাহীন

চতুর্থ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

জাহির | রিয়ান | আবির | ইলহাম | লামিন | সাহেল | রুবাইয়াত | সাবিক

রাজ | তামিম | ইনতেসার | আইয়ান | মাহির | দীপাঞ্জন | শিহাব | মাহিন

মাহাথির | রাফান | তাহমিদ | আরিয়ান | নাভিল | আব্দুল্লাহ্ | ইরফান | আব্দুল্লাহ্

ফুয়াদ | সোয়াদ | বোরাত | শাদিদ | রাফাত | অদিপ | মুহাম্মেদ | শাহরিয়ার

মাহিম | অভিরূপ | ইরতিজা | জুনায়েদ | শিহাদ | নিশাদ | শিখর | তাউসিফ

সামি | মারিজ | আবিব | রাফি | শাহরিয়ার | শিবলী | আরমান | মাহির

চতুর্থ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আবির | রাইহান | ইশফাক | জুবায়ের

চতুর্থ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

নাঈম | মাহাথির

আব্দুল্লাহ | জয়দীপ | সুফিয়ান | আফ্ফান | সালাত | শায়ের | তানভীর | তানভীর

রাফিন | তাসিন | আত্রিক | মাহিম | ওয়াসি | দীপ্ত | আরেফিন | সামিন

আবির | মুত্তাকিম | মাশিয়াতুল | অয়ন | অর্ণব | তূর্য | রেহীন | বর্ণ

সাঈম | সেজান | সিয়াম | আলজী | অমর্ত্য | উৎসব | প্রত্যয় | ফাতির

স্নেহাশিস | দিবস | শীর্ষ | ইয়ামিন | নাফি | নীল | শাহরিয়ার | সিয়াম

ফারহান | সানিম | মানতাক | অর্ক | আবরার | নাবিল | অনন্ত | শোয়েব

স্বর্ণাভ

চতুর্থ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

মুহাইমিন | সাদমান | অহন | হামি | সানিব

চতুর্থ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তাওসিফ | মারজুক | ফাতিন | নাঈম | অর্ক | নাফিস | সিফাইন | আহনাফ

সাদ | সিনান | ওয়াসিফ | জাহিন | আহনাফ | সাদাত | মুত্তালিউল | শাহেদ

মাহদি | অন্তর | সিনাত | আদিব | সামি | আলাবি | সুহাইল | নাফিস

তাহমিদ | নাজিব | সিয়াম | ইফরান | সাদমান | সালমান | ইমাদ | মাহির

খালিদ | আদনান | উসায়েদ | আবরার | শিহাব | সাজী | কাশফি | ওয়াজিব

তানজিম | সা'দাত | তরিকুল

পঞ্চম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মুহতাসিম | আশফাকুজ্জামান | নাফিস | বিজোর | সালাফি | রিশান | মাহদী | ফারহান

প্রথম | শোয়েব | টারফি | মাহির | ইব্রাহীম | আবরার | আহনাফ | কাবির

পঞ্চম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

নুর | ফায়েম | সাজিদুর | শাহনান | নাজিরুল | মুশফিকুল | তুকী | জুবায়ের

আহনাফ | তাহমিন | আরমান | ওয়ারিদ | সাফওয়ান | নজরুণীর | তাসফি | শাহরুখ

নকিবুল | নাকিব | ফাহিম | ইয়াকুব | মাশরুর | তাসফিক | তাহেন | আবিদ

ইয়াসির | শাইয়ান | মুক্তাদির | আব্দুল্লাহ | সাকিব | শামস | ইসমাইল | রাশেদ

আব্দুল্লাহ | ফাহিম | সাদমান | ইরাম

পঞ্চম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

তাওসীফ | জাওয়াদ

নিহাল | সিয়াম | জাওয়াদুল | রাতুল | সামিন ইয়াসির | রাইসুল | সালমান | আসফাকুর

আহনাফ | রাহিক | প্রাজ্ঞ | নাহিয়ান | আস্রাফিউজ্জামান | নাফিস | আমিরুল | রাফিদ

অগ্নিক সাহা | আকিফ | তাসিন | সালমান | সাকিব | মোহাইমিনুল | শাদমান | রাদ

পঞ্চম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রেভাতি

শাহ নেওয়াজ | হাসিন | তাসকিন | তানজিম | আমাতুন নূর | আসাদ | যোবায়ের | ফারহান

অনুদীপ | সৌম্য | অভিজ্ঞান | আবু বক্কর | দেব | সারাফ | আবিদ | নাফিউল

নাভিদ | সেতু | পলক | মুত্তালিব | জাহিদ | আবদাল্লাহ্

পঞ্চম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফাহিম | মাহির | শাহরিয়ার | মাহিন | রাফান | সিফাত | মাশরুফ | মাহবুব

তৌহিদুজ্জামান | কনক | অদিব্য | হিশাম | সহন | আরিফ | সাদমান | আবরারুল

মুত্তাকিম | সাকিব | অরূপ | শাবিদ | আবতাহি | সামিন | সাইফ | সালমান

নাফিউল | জারিফ | আদিব | সামিন | সাফকাত | আশিস | হিশাম | মুশফিক

ফাহমুদুর | অহন | কাইফ | ইনতিসার | আবরার | তকি | শাকী | মাসফিকুর

পঞ্চম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

লিখন | মাহাদী | তাহসিন | তাকিব | ফারাবী | মেহেদী | জুলকারনাইন | মুশফিক

পঞ্চম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আহনাফ | সানভির | ফাইয়াজ | ওমর | নাবিব | আহনাফ | রাহিকুল | আসওয়াদ

ইয়ামিন | তূর্য | আরাফ | রেদওয়ান | তৌফিক | আবীর | তাহমিদ | ফাহিম

কাব্য | অলক | তোহাসিন | ইয়াসিন | আনিব | মিনহাজ | অর্জন | তওয়াসিন

অভ্র | তানিম | আর রাফি | আদিত্য | আবরার | আসওয়াদ | রাহাত | আজমল

তামিম | রাফিদ | জারিফ | সালমান | সামিন | আব্দুল্লাহ | রিদওয়ান | রাফিদ

রওনক | জারিফ | আকিব | অর্ণব | রোহান | নিলয়

পঞ্চম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

রেশাদ | মানাফ | সাহিত্য | সিয়াম | বিবেক | প্রাচুর্য | সৌমিক | হায়দার

পঞ্চম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সাঈদ সাদমান তালাল আকাশ ফায়হান ফারহান আবরার মাহী

প্রান্ত ইফরাজ মুবিন ইউশা ওয়াসী রাফিদ শাহরিয়ার রাইয়ান

রাজীব আবিদ কামরুল মুশফিক ইরামুল স্নেহাংশু প্রিয়াংশু মশিউর

শায়ক অর্ণব অর্প নাসিফ ঈশান মুনায়েম শায়ক প্রমিত

জয় রাম পাল তাহমিদ রাগীব ইবনুল আদিত্য অরিত্র

পঞ্চম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সামিউল রেজওয়ান আদিব তাহজীব জাবের মহিবুর লিসান ত্বোয়াসিন

সাদ্দাম সৃজন মাহিন রাদিয়াত আবরার আরিয়ান রাশিদুল আন্দালিব

সামিন আবরার মাস্তক আরিফ অনিন্দ্য আতিক আবিয়াদ তাহসিন

পঞ্চম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

নাসির	মিনহাজ	ফাইয়াজ	তূর্ণন	আবরার	মাহফুজ	তাহমিদ	তানভীর

ইমন	আহন্নান	তাসফিক	অর্ক	আফিফ	ফায়েখ	আজরাফ	মাহিন

জুবায়ের	মারজুক	ওয়াসিক	ইশমাম	ইরাম

ষষ্ঠ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

লাবিব	ফাহিম	রাফিজ	জাওয়াদ	রুবাইয়াত	লুবান	তানভীর	আহ্নাফ

ওয়াসিব	সামি	ইমতিয়াজ	তামিম	আবরার	ইসমাম	ফারদিন	তাহ্মিদুর

সামির	সারতাজ	রোহান	জাররাফ	জয়	মানহ্যাত	জাভেদ	কাব্য

আহ্নাফ	ফাহিম	শাহনেওয়াজ	শাফাক	অপূর্ব	তাসবিহ্	হাবিব	শাহিদ

মুনতাসির	লিহান	হামিম	সজিৎ	জারিফ	আব্দুল্লাহ্	সাকিব	রাইহান

ষষ্ঠ শ্রেণি-ক শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

সামি | প্রিন্স | তাহমিদুল | বিনিত | ইফতেখার | রিহাব | মাহমুদুল | আহনাফ

আমিন | মহিবুল | সামিউল | রাশেদ

ষষ্ঠ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মাহির | নাফিস

ফাহিম | ইমতিয়াজ | সিফাত | হামিম | ইয়াসিন | ফয়সাল | সামিন | তাওসিফ

হামজা | আবিদ | তানজিম | মোর্শেদ | পল্লব | রাজন | কিংশুক | মনিরুল

হাসিন | অন্তরীপ | আব্দুল্লাহ | সাম্য | আদনান | সাকিবুল | আনজুম | সাজেদুর

রওনক | সাফায়েত | আরাফাত | ফারহান | আবরার | খালেদ | কাদেরী | সামির

হাসান | তালহা | ইলমান | ইশতিয়াক | ইশরাক | সাইফ | জয়ন্ত | রাহিদ

আরিয়ান | সাকিব | সালমান | অরুণাময় | মুহতাশিম | ফরিদুজ্জামান | নাসিফ | মিনহাজুল

ষষ্ঠ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মুখিদুল সিয়াম

ষষ্ঠ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

শাফীউল মিনহাজ ইন্তেখাব ইরফান

আবিদ মুওয়াইসির রাফিদ সাদ আকিব অনন্ত কনক মমিন

ফাদিফ আকিব নওশাদ সাকিত সাকিব ফাহাদিন ফারাবী পারভেজ

আয়েন মেহরাব মাহির রাইয়ান মিশকাত রাদিয়াত রাফসান শফিউর

সাজিদ নাহিদ আরিফ মাসমুম ওয়াসি অমি নাসিম নাঈম

মাশরুর রাফি সাজ্জাদ আহনাফ সাদমান ওয়ালিদ তানজিম সাজিদ

ইমতিয়াজ তাসফিক মেহেদী রশিদ আবরার আহনাফ সামির আলভী

ষষ্ঠ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তাবদিন নওফিল নিহাল মাহির আলিফ ফাইয়াজ জুবায়ের ইয়াসিন

ষষ্ঠ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

মাহিয়ান | ফারদিন | তাসফাতুল | আলিফ | ফায়েজ | ঐশিক | আলভি | সাজিদ

কাব্য | আবির | রাফি | চিশতি | ফাইরাজ | আরীব | ফারজান | নাবিব

রায়েল | আজমাইন | রাফিদ | রোহান | ফারদিন | রওনাক | রাইয়ান | বাপ্পুর

আবরার | ওয়াহিদ | হাসিন | ওয়াসিত | সিহান | আদনান | তাবিব | সামিন

মাহি | তাহমিদ | আরহাম | রিফাত | সিয়াম | মাহাথির | শাহদীন | ফাহাদ

তাহমিম | রিয়াম

ষষ্ঠ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তাহমিদ | রাফি | সামি | জুলফিকার

সাদিক | রাফসান | সাকিব | কুন্তল | শিহাব | অনিক | নাঈম | মৃণাল

রিমন | ফারহান | আবিদ | ইত্তেহাদুল | বিভোর | ঋদ্ধ | মুবিন | সুব্রত

ষষ্ঠ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আপন | শিশির | অর্নব | সাইফ | অর্ক | ইখুন | আরেফিন | আদিব

ওমর | মাহাদী | ইনাম | সামিউল | রাফি | আবরার | রাফিদ | দিলশাদ

প্রপাত | শুভজিৎ | তাহসিন | ধ্রুব | তানজিমুল | নাফিস | আতিক | সৌম্য

অদিত | রাফিয়াত

ষষ্ঠ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

মাসরুর জাহিন | সাব্বির | লাবিব | লাবিব

সিহাবুর | সামিউল | তৌসিফ | সোয়েব | তাহমিদ | রিফাত | আতাহার | আরিফুল

নাসিফ মাহবুব | ইরফান | মাহাদী | লাবিব | ফারদিন | জিয়াদ | রায়াত | রাফসান

জুহায়ের | ইসতিয়াক | ফাহাদ | সাকিব | তাহসীন | জাওয়াদ | জুনায়েদ | আহসান

অমিয় | জুনাইদ | ইশরাক | আবরারুল | জিহাদ | নিহাল | সুমিত | আরিফুল

ষষ্ঠ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

মোস্তাকিম, রাসেল, আরিয়ান, অনন, ফাইজুর, সিফ, নওরোজ, ইশরাফুল, আজওয়াদ, রায়াত, রাফিদ

সপ্তম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফাইসাল, রাফি, নাশিন, সাকিব, দুর্জয়, সামান, রাফি, তন্ময়, ওরিত, রাফিদুল, শাহরিয়ার, বিজয়, জামিল, তারেক, মিনহাজুল, আশফাউজ্জামান, তাসনিম, নাজমুল, আলিফ, রাশেদুল, রাকিব, মশিউর, রুশ্বাদ, ওয়াসি, শাবরাফি, আবদুল্লাহ্, শিউম, মেহরাব, তানজিম, শাহরান, মেহরাব, জুলকার নাইন, ইফতি, মাহমুদুল, সৃজন, শাহরান, আরিফ, মনিরুল, ফাশিহ্, সাফউয়ান, সাহলাব, ফারদিন, নাইয়ান, ফুয়াদ, মাসাবি, তামজিদ, সাকিব, প্রমিত

সপ্তম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফাহিম | সাহ্‌রাত | আরিফ | আরমিন | সাজ্জিদ

সপ্তম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

তাসনিম

মাহিন | ইশতিয়াক | সারওয়াত | মাহফুজুল | মুহিন | ঋত্বিক | শাহরিয়ার | ফারহান

জাওয়াদ | আশফাক | মোনাব্বির | জাওয়াদ | তাজ | অনির্বাণ | ফারহান | সাইমুম

সামিন | আরমান | মুশফিকুর | ইমরান | স্বাগত | নাফিস | তূর্জয় | অভিক্র

বাঁধন | আবরার | কাইফ | তাহমীদ | মাহমুদুল | ইশতিয়াক | আদনান | মশিউর

আব্রাউল | পুরব | শওকত | তামিম | সাজ্জিদ | এনায়েত | রিদওয়ান | আবির

ইসতিয়াক | স্বপ্ন রাজ | শবর | সালেকিন | মুহতাসিম | হাবীব | জুবায়ের | তাহসিন

জাদিয়ান | মাহির

সপ্তম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

আরিয়ান | আজিজুল | শাহেদ | রেদওয়ান

সপ্তম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

তাসনিম | শাহরিয়ার | সাইদুল্লাহ | আল্লাফি | ইফতেখার | সরণ | অভি | সালমান

সালমান | মেহেদী | হাফিজুর | তানভির | সানজিদুল | মাহদী | ইরতিজা | শুভ

ইবতেশাম | সাদাব | রাইয়ান | সামি | সরোজ | রেজওয়ান | তামজীদ | আরেফিন

সাইফুল্লাহ | সানজিদ | ইহতেশামুল | ফাহিম | ইফতি | দিদারুল | তানজিম | আবরার

আলভী

ইসফার | আফফান | মাহিব | ফারহাম | রঞ্জন | মাহবুব | ফাইয়াজ

সপ্তম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

রাহাত | ফেরদৌস | ইয়াসির | মুশফিকুর | সামিন | রিয়াজ্জান | জাকওয়ান | ইয়াদ

ইজাজ | আলভি | আলমাস | জুবায়ের | জামান | সরফরাজ | জাওয়াদ | সামিন

সপ্তম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তানজিম | ফারহান | সাজিদ | হাসিব | ফাহাদ | আশফাক | ফারদিন | ফারদিন

শফিক | সালমান | রুতবাহ্ | আশফাক | সোলাইমান | আকিব | আজমাইন | সামিন

নাফসিন | আব্দুল্লাহ্ | তানজিম | আজমাইন | অর্ণব | সামিউর | আর্দেন্দু | সারজিল

নাহিন

সপ্তম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

শাহীন | সালমান | মাশায়েখ | আশিকুর | তাসনিম

মনন | ইশতিয়াক | ফারদীন | আবরার | শাওন | জুবায়ের | নির্জন | মাহিয়ান

আহনাফ | আসফাক | জয় | রেজওয়ানুল | ফাহিম | রাফিন | লাইয়ান | অর্ণব

তাহমিদ | দীপ্ত | আতিক | নাবিল | তাসনীম | সাম্য | শিহাব | রাফসান

রাতুল | মুনীর | সাকিব | অরিত্র | মুনতাসির | জিতু | জামিল | হাসান

সপ্তম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সিয়াম | রাফি | নেহাল | রিফাত | কামরুল | ইফরোজ | পৃথু | রাইয়ান

সপ্তম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

মেহরাব | তাওসিফ | উৎস | সাদমান | শাফিন | সালমান

তানভীর | তানভীর | সামী | তোয়াহিন | নাফিস | তাহসিফ | আদনান | আলভি

তাজওয়ার | মুস্তাকিম | সাইফ | ফারদিন | আরাফাত | আ. আজিজ | জিম | ফাহিম

মাইনুল | প্রান্ত | ইফতেশামুল | ইব্রাহিম | নাফিস | আদিব | ফাতাহ্ | আফনান

সামনান | আফিফ | সাইদুর | ইফতেখার | নিবিড় | রিফাত | জিহান | রাফি

ইফতি | মাহির | রাজীন | আজরাফ | মাহী | আফজাল | জুবায়রুল | আরেফিন

রাকিবুল | শরীফ

অষ্টম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রাফিউ	সালমান	ফারদিন	আরিয়ান	সাকিব	রিফাত	রাকিব	আরেফিন

সাজিদুর	আব্বাস	ঐতিহ্য	মুশফিক	ফারাজ	ফাহিম	নাবিব	সাব্বাম

ফয়সাল	মাহিন	রাকসান	রাহিক	তানজিম	রাকিন	ফেরদৌস	মুনিম

সৌর	সালমান	আবরার	শাহরিয়ার	আরেফিন	নোয়েল	মইনউদ্দিন	রিজওয়ানুল

রওনক	উয়াইস	তন্ময়	রাব্বি	রিদওয়ান	আবির	শাদিদ	ফারহান

নাভিল	জাওয়াদ	আবিদুর	আবরার	মেহেরান	ইশতিয়াক	জুনায়েদ	রায়হান

রুবায়েত	আহনাফ	তানজিব	নিমাত

অষ্টম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রেজা	নিলয়

মুন	সোহান	নন্দিত	স্বদেশ	প্রত্যয়	তাজওয়ার	শাহরিয়ার	ইস্তিয়াক

অষ্টম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মাহমুদ | রোকন | সোয়াদ | শিহাব | আকাশ | অনুব্রত | হিমেল | রাফিদ

রিদুন | ইরতিজা | সাফায়াত | শোভন | হাদিম | মাহিন | জাবির | শিমুল

অর্ণব | অয়ন | তাওসিফ | সাকিব | ফয়সাল | আবরার | তাফসির | নাঈম

শামসুদ্দিন | তাওহিদ | সালমান | ফারুক | রিফাত | স্বপ্নীল | ইমরান | নাফিজ

আবির | আসিফ | আহনাফ | রিফাত | রিমন | নয়ন | রিফাত | নাঈমুর

অষ্টম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মনিমুল | আজাদ | মেহরাব | আরাফ | হাসিবুর | সালমান

আশিকুল | হাসান | সালমান | মোরশেদ | মেহেদি | সাদমান | আওসাফ | সিফাত

মোফাজ্জের | রিফাত | ইফতি | সাজিদ | সাহিয়ান | তাওসীফ | সাদ | আজম

অষ্টম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

নাঈম · ফারহান · জাকারিয়া · জাওহার · আহনাফ · বান্না · ইকবাল · ইত্তিহাদ

তানজিরুল · মাহমুদ · আবিরুল · রহিম · রিফাত · নাঈমুর · আকিব · হিম

রাফি · অরিত্র · ফয়সাল · ইয়াসির · নাফিজ · মোহসীন · মাহবুব · সাহাম

রিফাত · ওয়াহি · মাসনুম · সাইফুল

অষ্টম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

সাফাত · তাওসিফ

ওমর · আহনাফ · ফয়সাল · ফারদিন · সার্বিক · সাইফুর · উসামা · নাভিদ

মাহফুজ · সানীন · আলফি · আলভি · নাফিউ · ইমন · জাহিন · ফারদিন

আলফি · আকিফ · ফাহিম · মুনতাসির · রিজন · ফারদিন · নাফে · নাইমুর

তাজওয়ার · রুমান · আনন্দ · জায়েদ · তমাল · আশফাক · মুহতাসিম · সাদিদ

অষ্টম শ্রেণি (প্রভাতি)-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ

মামুন, লাবিব, শামস্, তাসিন, জিদান, সাজিদ, রোমান, জুবায়ের

নাসিমুল, মুশফিক, আকাশ, তামিম, মীর্জা, আদনান, শামসুল

অষ্টম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

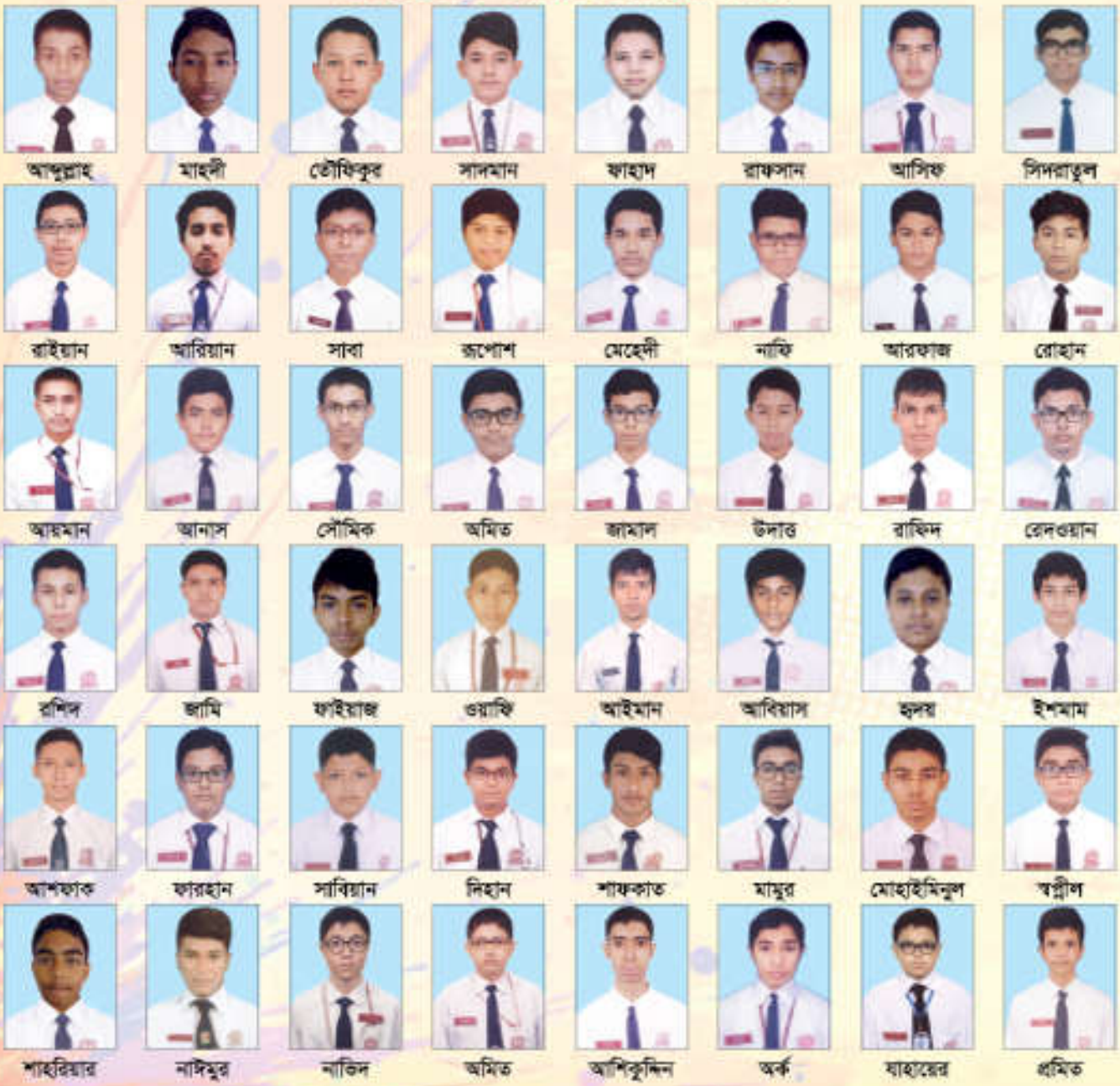

আব্দুল্লাহ্, মাহদী, তৌফিকুর, সালমান, ফাহাদ, রাফসান, আসিফ, সিদরাতুল

রাইয়ান, আরিয়ান, সাবা, রূপেশ, মেহেদী, নাফি, আরফাজ, রোহান

আয়মান, আনাস, সৌমিক, অমিত, জামাল, উদাত্ত, রাফিদ, রেদওয়ান

রশিদ, জামি, ফাইয়াজ, ওয়াফি, আইমান, আবিয়াস, জুনয়, ইশমাম

আশফাক, ফারহান, সাবিয়ান, লিহান, শাফকাত, মাহুর, মোহাইমিনুল, স্বপ্নীল

শাহরিয়ার, নাঈমুর, নাভিদ, অমিত, আশিকুদ্দিন, অর্ক, যাহায়ের, প্রমিত

অষ্টম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তৌসিফ

অষ্টম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

শরিফুল, অমিত, ইশতিয়াক, মাহদী, তাজবীদ

রিয়াদ, নাফিস, স্বপ্নীল, ওয়াসি, মাশরুর, পল্লব, সামিউল, রাফি

তানভীর, ফাহিম, নাহিদুল, মোহাইমিনুল, সাজিদুর, আয়মান, প্রান্তিক, তোহা

আদনান, মেহেদী, রাফিক, শাখাওয়াত, হাবীব, মুহাইমিনুল, জিয়াউর, আহনাফ

আকাশ, রাফাতুল, রাহুল, জয়, সালমান, শাওন, ফাইয়াজ, আদীব

ইফতিখার, রাইয়ান, আরিয়ান, সাফিত, শিহাব, মাহি, রিয়াসাদ, মুশফিকুর

ফারদীন, রাওজিল, সোহান, ইসমাইল

অষ্টম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

ফাহিম, আহনাফ

আদনান, মুকিত, মাহফুজুর, মোয়াল্লেল, আদনান, সাজিদ, সাফওয়ান, আরিফুজ্জামান

অষ্টম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আশরাফ	সামিউল	শাজেদুল	মুন	নাবিল	জুবায়ের	মঈনুল	অথই

মোসাদ্দিক	গালিব	রাহাত	শাহেদ	রুবাইয়াত	রাশেল	আশফাক	তাজওয়ার

মুকিত	তাওসিফ	তাহসিম	তাহমিদ	ইমতিয়াজ	রিফাত	অরণ্য	জিসান

আবরার	রাতুল	নাজমুল	আজমল	সাকিব	ফয়সাল	দীপ্ত	মোহাম্মেদ

সাকিব	তহিদুল	সাফি	তানজিল	শাহিন	নাজিব	সৈয়দ মোহাম্মদ	আবরার

অষ্টম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

অপু	অংকেন	ইফতেখার	তামজিদ	তাশরীফ	আদিব

সাজিদ	বাঁধন	শাহরিয়ার	শান	জোবায়ের	রাফিউল	ইফতেখার	নাবিল

মাহিন	মারুফ	নাফিস	আশিক	শাহিন	রুহুল	সাব্বির	মাহমুদুর

অষ্টম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সাকিব · রাফিদ · মাহিন · সামীর · শাহরিয়ার · মুনতাসির · ফয়সল · আবির

আবরার · আহনাফ · নাফিস · নেহার · আদনান · রাফি · আকিব · সাহাল

তানজিম · রাফি · মাশরুর · মেহেদী · অন্তর · শাকিল · অমিত · ইশরাক

রাদ · তানজিম · মুশফিক · শাকিব

নবম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

টনক · তাকসীর · জুবায়ের · সাইফুল · কামরুল · সুমিত · নাজমুল · প্রান্ত

জুনায়েদ · তওফিক · রাফিদ · তাজবিদ · জামিল · তারেক · রায়হান · নাবিল

আরাফাত · মাহমুদুল · মেহেদী · বায়েজিদ · জুবায়ের · শান্ত · হৃদয় · আসিফ

হাদি · সোহান · তানভীর · আফসার · আহাদ

নবম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

আদিব

নবম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

সালমান | মেহেদী | নাভেদ | নিয়াজ | শফিক | শাবাব | প্রতীক | রিমন

রাইয়ান | রেজওয়ান | মোস্তাফিজুর | মোহাম্মদ উল্লাহ | হৃদয় | মাহমুদুল | মাহদী | তাবীব

খায়রুল | আব্দুল্লাহ্ | আসিফ | নাকিব | তন্ময় | আকাশ | রুবাইয়াত | তাসরিফ

ওয়াসি | আরাবি | মোতাসাদ্দিকুর | তাসনীমুল | তাসীন | আবরার | আরাফ | তানজিম

অনন্ত | আব্দুল কাহহার | ইয়ামিন | ইমতুল | নাহিয়ান | সাজিদ | সাকিন | রাইয়ান

সায়েম | ইসমাইল | হিমেল | আওয়াদ | আজমি | সাদিক | আদনান | সিরাত

আবির | সিয়াম | মোজাহিদ | নাহিদ | সাইফ | অয়ন | সজল | মহিউদ্দিন

সাজির

নবম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রাসিন | সামির | আরাফাত | কাবুল | আকাশ

নবম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মারুফ | নাঈম | সজীব | তানভীর | অর্ণব | হাসান | মাসুম | হামিদুল

হাসান | কাদির | শাকিল | সুদীপ্ত | হাসিব | বিশাখ | রাহাত | মাহমুদ

সায়েল | দিগন্ত | ইফ্ফাত | ফাইয়াজ | মাশফি | ফাহিম | নাবিল | ইশরাক

নাবী | অনিন্দ্য | মাহিম | মারুফ | ফেরদৌস | স্মরণ | শাহরিয়ার | শাইখ

তাহমিদ | সাকিব | রাফি | জয় | আহনাফ | ঋত্বিক | হাসিব | সাব্বীম

আহসান | রাফিদুল | ইমরান | ফারহান | নওরোজ | বিপ্লব | সাইমুন | আমিন

নয়ন | নাঈম | কাব্য | মাহদী | ওমর | তপু | আকিব

নবম শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

নিলয় | ফারদিন | ইমাম | তানজীম | জিহাদ | রওনাক

নবম শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ইশরাক ফারহান সামিউল ফারহান আনাস সৌহার্দ্য নির্ঝর মেহেদি

ইনান মোবাশ্বির সামির ফাহিম আরজ তাসিন অনিক মারুফ

এনায়েত সাফোয়ান ইসতিয়াক আহনাফ শাহরিয়ার ইসতিয়াক বেলায়েত ইব্রাহীম

সাইফুল্লাহ শাকুর তাসিন শমিত শারজিল ইরফান মাহমুদ সাজ্জাদ

রাকিব মারুফুল তসলিম ফয়সাল আবির একরাম মুনেম ইউসুফ

সাকিব সার্থক স্বপ্নীল তানভীর মোহাইমিনুর ওয়াহিদুল আবিদ আসিফ

আহাদ নাজমুল আদিব নাসিক সাকিব ইব্রাহিম

নবম শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফারদিন রাফিদ শাবাব ধ্রুব ফয়সাল এজাজ আব্দুল্লাহ সাফকাত

নবম শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফাতিন মুরসালিন আজমাঈন তাহমিদ ফারহান নাফি নেহাল রাকিব

নিহাল রাব্বুন ইজতিহাদ ইসতিয়াক উদ্দীপ্ত শুভ্র সাইফুল্লাহ শাহরিয়ার

মাহদিন অর্ঘ্য সামির সামিন ফাহিম মনির রাগিব তামজিদ

মোহতাসিম জামান সিফাত ফাহিম পুষ্পী তানভীর রিদওয়ান সাজিদ

মুশফিক রাইয়ান নুর তাজওয়ার রাফসান মুহাইমিন ওমর সিয়াম

তামজিদ ইফাজ মোজাহিদ সৌরভ সোহাইল ইকরাম জিম

নবম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তাহসিন লাবেব ইমতিয়াজ সাদিদ ঈশান মুহিত আহনাফ প্রিতম

তৌফিকুল রাফি সাইমুন সামির মোহাইমিন সালমান দীপ আসিফ

নবম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

জুবায়ের, ইমরান, ফাহাদ, ইফাজ, মাহিন, রাফি, ফাইয়াজ, ফারদীন

হাসিবুল, ফাহিম, ফারুক, মঈন, আহাদুজ্জামান, আরাফ, সাকিব, সাদাব

শাফায়েত, তানজিম, স্বাক্ষর, মশিউর, সিয়াম, আশরাফুল, ইমন, তালহা

তানভীর, মাহরাফ, আফজাল, জাবের, ইয়াসিন

নবম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সালমান

রাফিদ, শুভজ্যোতি, সাইফি, আরিফ, শুভাশিস, মোহাইমিনুল, লাবিব, পুলক

সাফিয়ান, জিলান, দেবপ্রসাদ, নাহিল, রাফসান, ইবতেশাম, অভিষেক, রাইয়ান

সাজিদ, অর্ণব, মুহ্তাসিম, অনিক, অহন, মেসবাহ্, হাসিব, নিলয়

নাসিফ, তানজিরুল, আরাভিন, আশফাকুল, ফাহিম, আমিরুল, সাদিক, তানভির

নবম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

অভয়কান্তি এহসান অনিক প্রদীপ্ত সাজ্জাদ আসিফ মুত্তাকিম নাহিদুল

তালহা অন্বয় গালিব ওয়াকিল মুশফিক শাশন জাকারিয়া রাফসান

মুবাশশির মুশফিক আহনাফ মৃণাল আসিফ ফারহান সীমান্ত হুমায়ুন

রুদ্র

নবম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

মাহীম আসিফ জিহান ফারহান দারদা

লাবিব আসিফ জারিফ সাগর স্বরূপ সাফায়েত মশিউর সাকিব

অমিয় শিফাতুল্লাহ আশিক সিয়াম সাজিদ সালমান আরিফুল সালমান

হা-মীম আতিক রোহিত ইফাজ তূর্য সোর্ভি সাজিদ রাকিন

তাহসিন মুনেম নোমান ওয়ায়েস রাফাত ফাইয়াজ নাঈমুল আন-নূর

নবম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

শাকিক | আসিফ | মাহমুদুল | নাফিস | নাফি | মুহিত | ইয়ামিন | আশরাফ

সাকিব | শাদিদ | ফারহান | রেজওয়ানুল | মাহি | সালমান | ফারদিন | আশিক

রাফি | আবুবকর

নবম শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সাফিদ | তাহসিন | তাহমিদ | রেদওয়ান

নাফিজ | রাফিন | আলভী | জুহায়ের | আব্দুল্লাহ্ | মেহরাব | আমিনুল | নুরনবী

তালহা | নাসিফ | সাদনান | মিফতা | মিম | ফারদিন | শামীম | রাফি

সিয়াম | ফারাবি | লিয়ন | আজমাইন | তাহসিন | শরাফ | সাদিক | ইফতিখার

আবতাহী | সাকিব | ইমরান | আতিক | আজমাইন | রাকিবুল | আহান | আশিক

রাশেদ | আলভী | আদনান | সাফেইন | নূর | রাইয়ান | স্বনন | আরাফাত

নবম শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আবিদ, মাইনুল, সায়র, ওয়াদুদ, রিফাত, বাশার, রিয়াজ, রোকন

ইয়াছিন, আরিফ, নাহিদ, আবরার

নবম শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

ফয়সল, তাওসিফ

জুহায়ের, রোহিত, সামনানি, তাহমিদ, আসিফুল, নোমান, সাজিদ, অনিকেত

আদিব, সালমান, মুকিত, আরিক, মুরসালিন, আনাস, সাফকাত, নাফি

সামি, আওসাফ, মাইনুল, ইমামুল, ইফাজ, কুলজিৎ, অনিরুদ্ধ, কাওসার

রাওয়াক, নাজমুস, রোহেল, মুহতাসিম, আফিফ, ইশতেহাদ, শফিউল্লাহ, তাহমিদ

শরিফুল, শায়ের, জুনায়েদ, মাহিদ, তাহমীদ, কুরেশি, ওহী, সানিয়াত

আন্দালিব, শান্তনু, আকিব, মানসিব, তানজিম, তীর্থ, নিয়াজুর, মুস্তাক

নবম শ্রেণির-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আরমান | জাকি | সালমান | আবরার | তাহমিদ | তুষার | তূর্য | আশফাকুর

তাসিন | শাহরিয়ার

দশম শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

জিলান | মুন্তাসির | এমরান | টনক | হৃদয় | নাঈম | আসিব | মামুন

রাশিদুল | এমদাদ | আরাফাত | সৈকত | রাগিব | জাহিদুল | রায়হান | নূর

ফাহিম | ফয়সাল | রাফিদ | সানি | চন্দন | রাকিব | মাহি | শিবলু

রনি | মেহেদী | তানভীর | ওয়াজিদুল | ইমন | আদিব | মামুন | অয়ন

ইয়াসিন | আবরার

দশম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রাদিব | আশিকুর | ইরাম | শাদমান

সাকিব | রিফাত | রাহাত | নাফিস | তৌহিদ | নুরুল | তাওহীদ | রেদান

দশম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

শাহরিয়ার | আনোয়ার | রেদওয়ান | শামির | আবিদ | সালেহ্ | রুবায়েত | সামিউল

সাকিব | সেজান | তামজিদ | ইমতিয়াজ | আকিব | মাহিয়ান | সাকিব | শাহরুল

মুন্তাসিন | ইরফান | অভিষেক | রিজুয়ান | রেজওয়ান | রাকিব | রায়হান | সাকিব

তামজিদুল | আনন্দ | তাহমিদ | রিফাত | আল আমিন | সাব্বির | তানভীর | তাহের

ফয়সাল | মুশফিক | আশরাউল | সোয়াস | সাকিব | আতিকুর | ওমর | আসিফ

দশম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফাইয়াজ | রাফি | আতিক | আরিফ | রনি | মাহিন

জুয়েল | ফাইয়াজ | তাসফিক | ইমন | আরাফাত | ইনজামাম | পিয়াস | আবিদ

রিয়াজুল | ফয়সল | আলিফ | মাহমুদুল | তানজিব | আশিক | সালাফ | হাসিবুর

দশম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

শাশ্বত | অহীন | ফারুক | ফাহিম | লাবিব | মিয়াজি | সাদ | রুবায়েত

জাকারিয়ার | রাফসান | হৃদয় | সাকিব | আবতাহি | মেহেদী | তাসনীমুল | রাইয়ান

সাদাত | মুহিবুর | তুষার | হাসনাইন | দিব্য | নুরউদ্দীন | জাওয়াদ | সাকিব

শাহলাত | ফাহিম | সাইয়াদ | সাদ | ইরফান | সালমান | ইব্রাহীম | সালমান

দশম শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

পৃথুল | জাওয়াদ | সাজিদ | ফারুক | সামি | মেরাজ

নাইম | সাদ | আসিফ | ইফতেখারুল | আবরার | প্রিন্স | মোস্তাবা | দেবজিৎ

পাভেল | ইবতেহাজ | শাহরিয়ার | রাইয়ান | শিহাব | নিয়াজ | অর্ণব | মিহান

শাহরিয়ার | রাকিব | মাহতাব | সাকিব | নওশাদ | আশিকুল | জাবির | রাজেশ

দশম শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ওয়াসি | আশিকুজ্জামান | রনক | ওয়ালিদ | শাহরিয়ার | শিহাব | ইশাত | শাহরুখ

সাকিব | তাসনিমুল | শাহরিয়ার | ফারহান | আরাফ | জুবায়ের | ফারহান | সাজিদুল

রাফি | সূর্য | মুবিন | মাজহার | সৌরভ | ওয়ালী | সাউদ | প্রণব

শান্ত | অর্পণ

দশম শ্রেণি-চ
শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ
(প্রভাতি)

মুশাহিদ | রাফিন | মুশফিক | লাবিব

তামজীদ | সানজানান | সোহম | জিদান | লাতুল | তাসিন | রাহাত | নাঈম

নাফিস | সামদানি | আহবাব | রহিম | মুনতাসির | শামস্ | ওয়াসিফ | আবরার

আদনান | দেবনাথ | নাহিয়ান | ফাহিম | শাহরিয়ার | মুশফিক | সাদ | মহিবুল

তৌসিফ | মুনিম | কেতন | শাফি | নাসির | জাবির | সালেহীন | লাজিম

দশম শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মাহমুদুন্নবী | মুহাইমিন | নাঈম | হুরায়রা | ওয়াসিফ | আসিফ | তমাল | সিয়াম

আইনান | ওয়াসী | সাকিন | সাজিদ | জিসান | ফাহমিদ | রাফিদ

দশম শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

রাশিক | নাঈম | সাদেক | আদনান | মাহবুব | সুকানন | তপু | পল্লব

তানজিরুল | হিরা | রাফিন | সামিন | ওয়াসিমুল | রিশান | জুখরুফ | শাহীন

খালিদ | সাজিদুর | আদনান | রাফি | নাফিস | শওকত | ইবনুল | সাজ্জাদ

জুবায়েদ | সাকিব | আল-আমিন | সাকিব | নাবিল | আসিবুল | ইশতিয়াক | নাহেফ

কাইফ | মঞ্জুরুল | আতিকুর | অভিষেক | রিফাত | রাফসান | নাবিল | সুমাইন

কামরুল | ফয়সাল | ফারহিন | আলভী

দশম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

জিম | অনিক

দশম শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

রশিদ | সাজ্জাদ | ইমন | নাঈম | সাগর | রেজওয়ান | আলভী | স্বরূপ

ফারাজ | সওগাত | নাবিল | জয় | ফাহমি | ইয়াসির | ভাস্কর | তন্ময়

নিলয় | ধ্রুমীম | রিফাত | রাকিব | নোমান | জোবায়ের | রাতি | আবিদ

শারার | তিয়াস | নিয়াজ | মাশফিক | সিয়াম | ফাহিম | সামিন | জয়

সুদীপ্ত | সাকিব | নাফিজুল | সাকিব | তাহমিদ | রাহাত | হিমালয় | অয়ন

ইয়াফসান | মুত্তাকী | লাবিব | সুদীপ্ত | বাঁধন | ফারহান | সাকিব | মহিউদ্দিন

আরাফাত | সালাফ | জাভেদ | শামসুদ্দোহা | আরিফুল | নেহাল

দশম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

নাবিল | ভাওসিফ | ফাহিম | নাফিসুল | সালমান | সালমান | সাকিব | মাশরুর

দশম শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সাদমান নাহিদ খালিদ আপন রুদ্র মুনসিফুর আশরাফ তাসিন

অমি মাহিম নুর মেহেরাব সাকিব সাকিব আলভী রশিদ

জুবায়ের মুশফিকুর ওয়াসি আরমান জাওয়াদ নাভিদ শুভ্র আনন্দ

কামরুল সারতাজ সাইফুল সিয়াম ফাহমিদ সাদ তকী ফাহিম

অর্ক তুহিন ফারহান রিফাত মঈন নাফিস শরিফ সামি

তানভীর ফুয়াদ তানজিম নিয়ামত রেদওয়ান রিফাত মুরসালিন

দশম শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তানজির রাফিদ তাইফুল ফাইজুর সাজিদ তামজিদ

মুশফিক ইয়ামিন শাওন ফাত্তাহ ফাহিম রাহাত আরেফিন শোয়েব

দশম শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আসিফ | স্পন্দন | ইশরাক | সাফওয়ান | নাহিয়ান | রাফি | সাজিদ | হাসান

ইমতিয়াজ | নীলাদ্রি | প্রান্ত | শাহরিয়ার | গালিব | মুশফিক | রাইয়ান | মুনেম

রাফসান | আদীব | তাবরীজ | আজম | তওসিফ | সৈকত | মাহাতাব | সাকিব

সিনান | ওমর | তানভির | সাদাত | ইফতিয়াখ | সামিউল | রিফাত | করিম

আজিজ | তাহমিদ | হাসনাইন | শামস | রাশেদুল | সিফাত | সাদমান | ফাহিয়াদ

বিজয় | আরাফাত | সিদ্দিক

দশম শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সারতাজ | ইফতি | আলী আহমেদ

আহসান | নাঈম | ইরফান | মুগ্ধ | জাওয়াদ | সাফায়েত | নিরুপম | স্নেহাশিস

মুনতাসির | গৌরব | অমিতাভ | আকিব | রাজিন | ওয়াসিফ | ফারদিন | মোস্তফা

দশম শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

মাহমুদ, রাইয়ান, নাসিব, ফাইয়াজ, রাতুল, ইব্রাহীম, আশফাক, আবরেশাম

ইমতিয়াজ, নিলয়, মুহাইমিন, সাদ, হাসিব, নাভিদ, আবির্ল, আদনান

রাহুল, জুনায়েদ, সাজিদ, রাইয়ান, নুফায়েল, তামিম, সামি, রাইয়ান

তৌসিফ, নাহিন, রাফি, আইনুন, ইফতি, শাহিদুর, আহনাফ, ফরহাদ

ওয়ালিদ, মারজুক

একাদশ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফাহাদ, সাব্বির, আফসার, আল আসাদ, ওমায়ের, শান্ত, ইমাম, দেবেন্দ্র

রাজিব, শাহরুল, ফারহান, আলভী, সজীব, নাজমুল, রুবায়েত, নাঈম

সিদ্দিকুর, জ্যোতিষ্ক, মাহফুজ, রোমান, মোবারক, আজাদ, রাকিব, আজমী

একাদশ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ফাহমিদ | শাকিল | রাকিব | ফাহমিন | আবরার | সঙ্গীত | মুজাহিদ | ইমাম

ইমতিয়াজ | সাব্বির | শংকর | আরাফাত | নুরুন নবী | মাশফির | সোহেল | নুরুজ্জামান

শাহরিয়ার | মেহেদী | মেফতাউল

একাদশ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রিদওয়ান | মুহিবুর | মোসাদ্দেক

মোস্তাফিজ | সালেহ | রিয়াসাদ | শরিফুল | রাফিউল | সারতাজ | রিফাত | নেফাউর

শাহরিয়ার | নাঈম | কাদির | কবির | শিমন | আকাশ | আরাফাত | রিয়াজুল

মাহমুদ | আলতামাস | জাহিদ | হাসিব | মিজান | সিয়াম | নাসির | খালেদ

ফারদিন | খায়রুল | এহতেশাম | নিলয় | ওমর | শিহাব | নাফিজ | আশফাকুর

কবির | রনি | রাকিবুল | সানি | নাঈম | তানভীর | শুভ | সাকিব

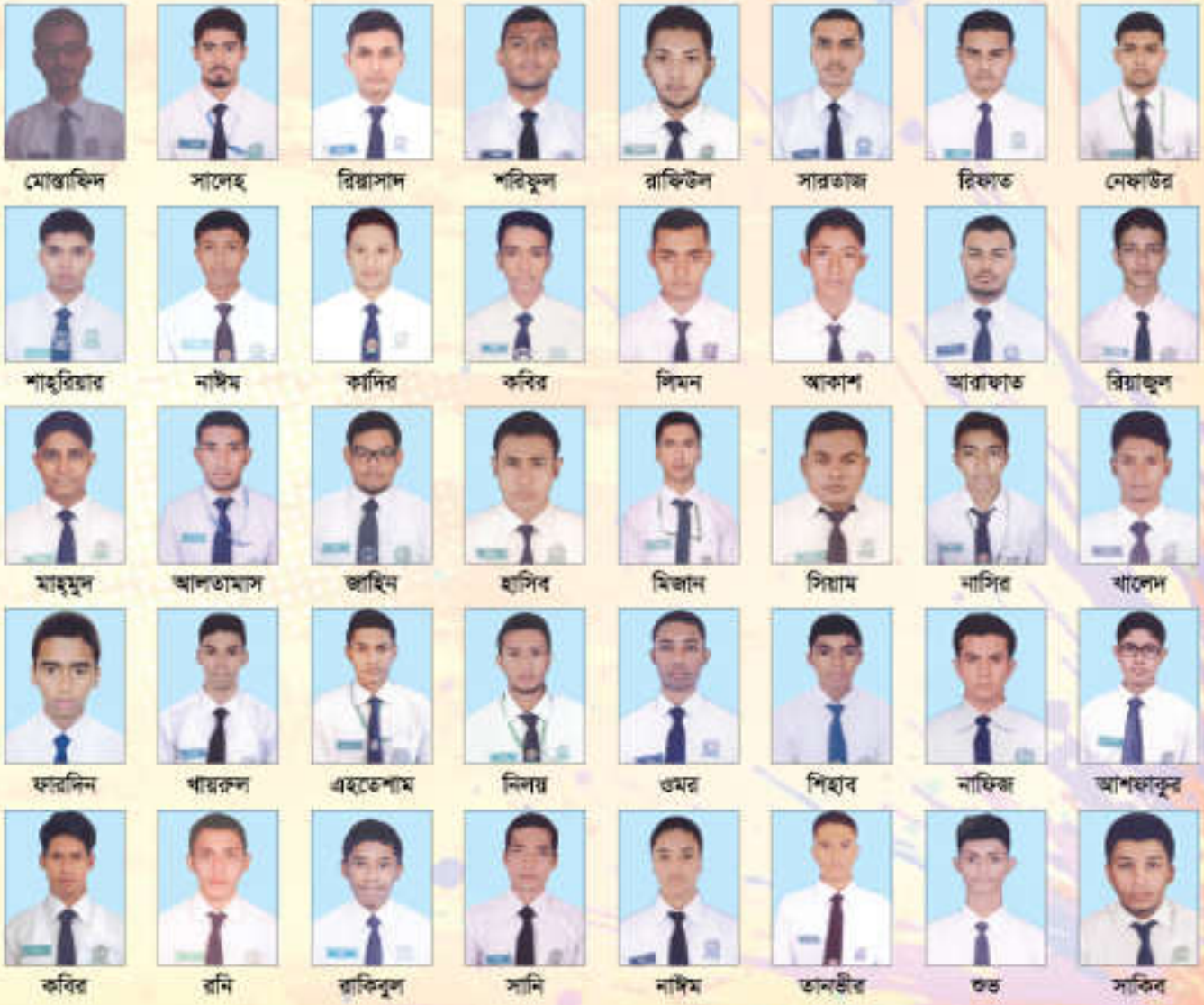

একাদশ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মামুন | যুবায়ের | ফখরুল | আশিকুল | মারুফ | রওনক

একাদশ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রাকিব | রায়হান | মহিউদ্দিন | সাকিব | অয়ন | মেহেদী | ওয়াসিফ | ইমাদুদ্দিন

সাফায়েত | নাহিদ | শুভ | রায়হান | মোস্তাফিজুর | নাজমুল | আরমান | আবিদ

ফারহান | শামসুল | সাফায়াত | শাফকাত | ওয়াসিফ | প্রাঞ্জল | সাফাত | শৈশব

আবরার | আরাফাত | ফারহান | ফাগুন | মুশফিকুর | ইব্রাহীম | জাওয়াদ | জুবায়ের

উত্তম | সাকিব | সালিম | সাকিব | রফিকুল | জাকি | মামুন | কামরুল

সালমান | রাহাত | ওয়াসিফ | ফয়সাল | আশরাফুল | মানসুর | শাকিব | সাকিব

আশিক | তৌসিফ | আসিফ | মাহফুজুর | আতিকুর | রাফি | হাসনাত | ফয়সাল

একাদশ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

শাব্বির নিলয় ফারহান মোহাইমিনুল তূর্য হাসিব পিয়াল মারুফ

শাহনেওয়াজ ইমতিয়াজ নাঈম মুশফিকুর সালেহ নিলয় ফুয়াদ পরশ

তামজিদ তুষার সাদী মুহাইমিনুল হাসান কাওসার অর্ণব রাশাদ

সিফাত সালমান

একাদশ শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

দ্বীপ রাফিকুল কবির রাজ

মুতাসিম সোহম রাফি সাদীদ ফাহিম আকিব রাহুল ফারহান

রেজা আতিক শাওন সালেহ আরেফিন মোসাদ্দেক সাইফ জাকারিয়া

রেদওয়ান তুহা মুস্তাকিম সাকিব রাইহান সাব্বির ওয়াহিদুজ্জামান শোভন

তাহমিদ ফাহিম জাহান রাফিউল জাবের আদর জাহিদুর মাহি

একাদশ শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

আসিফ	প্রমিত	সাদিকুল	মাহিদুর	ইফতেখার	সেলিম	ইকরামুল	ফোরকান
জুয়েল	আতিকুর	পণি	সালমান	শান্ত	নিহান	মঈনুল	রাকিব
জুবায়ের	সাঈদ	অয়ন	অর্ণব	আমীন	হাসান	জুনায়েদ	মাইদুল
মইনুল	আরাফাত	ফয়সাল	শাহিনুর	হাসান	হাসান	শহিদুল	রিদওয়ানুল
সাফওয়ান	আসিফ	মামুন	বাপ্পী	ফারহান	নাদিম	রাকিব	হাসান
আমিন	আল আমিন	সাজ্জাদ	সাদ	মেহেদী	একাদশ শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)		জামিউর
সাব্বির	শোভন	প্রান্ত	মুহাইমিন	সামি	সাদিক	আবির	সীমান্ত
সাদিক	মুরাদ	প্রীতম	রাইহান	আনন্দ	শাহরুখ	আখিয়ার	ইকরাম

একাদশ শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

অভিষেক বেলাল কৌশিক তাশনীল শৌভিক রুহানী শাহরিয়ার সাক্ষর

আবরার নূর করিম আব্দুল্লাহ সুপান্থ অমর্ত্য মুশফিক সাফায়েত

তাহফিজুল পলাশ সোহাগ অরুণ রাকি সামি অভিজিৎ মাশফিক

রাহাত আদিব সাদ সোহাগ মাহির শরিফুল অর্ণব ফয়সল

ইভান হাসান সাদেক সাজিদ অতনু আশিক আরাফাত ইশতিয়াক

রিশাদুল আবিদ ইমাদ রিজওয়ান মারুফ তানভিল আকাশ ফরিদুজ্জামান

আজিম সামিউল ইমরানুর তারেক তানভির ইমতিয়াজ আশরাফুল শিহাব

তাসিন সামস্ তালহা ইব্রাহিম ইসমাইল মোস্তাফিজ আশরাফুল

একাদশ শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

লাজিম | রায়হান | মঞ্জুর | সাইম | বিভা | রিহাত | তাশরিফ | মোস্তফা

স্মরণ | সেজান | মোসাদ্দেক | অনিক | ইসতিয়াক | আসিফুর | সিয়াম | রিমন

তাজেক | ফাহিম | রাফি | মেহেদী | রাহাত | শিহাব | শিশুন | জুনায়েদ

মেহেদী | খালিদ | শাকিল | শাওন | নাহিন | রাফি | মুহতাসিম | ইমরান

ইফতি | হিমেল | আবিদ | রাইহান | রাফি | আরাফি | আশফী | নাইম

রাশিদ | রাজীব | মুনেম | সামিন | আল ওয়াহিদ | আবু বকর | ফাহিম | রেজোয়ানুর

মেহেদী | মামুন | নিশাত | কাব্য | নাসির | ইকবাল | মাহিউর | সজীব

রায়হান | তাকি | পরশ | আরিফুল | নাঈম | আকরাম | আহসান | নাজিব

একাদশ শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

অনিক | আমজাদ | রাইয়ান | আহসান | নাহিদ | বিকাশ | রিফাত | আ. রহিম

আল-আমিন | মোর্শেদ | তন্ময় | অমিত | সাকিব | সোহান | হানিফ | মিরাজ

জুয়েল

একাদশ শ্রেণি-ছ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মৃন্ময় | রিফাত | ইফতিলা | সাদিকুর | অমিও

অয়ান | হাসান | আজাদ | আরিফ | সাদমান | অর্ক | নিবরাজ | অর্নব

সাফাওয়ার | রাব্বি | আরেফিন | সাফাত | আবির | রেজওয়ান | ফাহাদ | সাফর

তানভীর | আরিফ | মুশফিক | স্মরণ | আদিব | কাশিফ | সাফকাত | ইমামুল

সৌমিন | জুনায়েদ | আদনান | রাগিব | নাঈম | আবির | ফারহান | শাকুরুজ্জামান

আহনাফ | শাহজালাল | শিশির | জাভেদ | আলিফ | তালাশ | অঙ্কন | ফয়সাল

একাদশ শ্রেণি-ছ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

একাদশ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

একাদশ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

একাদশ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

নীলাভ	সুবর্ণ	নোমান	রিফাত	নিলয়	সাদিব	হাসিব	তোহা

ওয়াসিফ	জিলনী	সিফাত	রাফায়াতুল	রিয়াজ	শাহীন	শোয়েব	খালেকুজ্জামান

রিয়াজ	ইকরামুল	অলিউর	ফাইয়াজ	আশিকুর	সালমান	স্মরণ	সাব্বির

নাজিম	তাওসিফ	নাহিয়ান	প্রত্যয়	ইয়াসিন	নিলয়	সাদী

একাদশ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আদিব	রুহান	মুমিত	অন্তর	ইফতি	কাব্য

আরাফাত	আবরার	সনক	মাহমুদুর	ওয়াসি	তামজিদুর	সালমান	তাহমিদ

জাহিন	আরিফুর	মোনায়েম	আশিক	আলভী	রুবায়েত	শফিক	তানভীর

আবির	বখতিয়ার	শাহান	সাদাত	আকাশ	আশেক	শাকিল	নাবিল

একাদশ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সাইফুল্লাহ ইকরা মিশকাত তালহা তুষার সাঈদ শাওন সাজিদ

সাফায়েত সাকিব তাইফুল মেহেদী তানভীর রিফাতুল সৌরভ আল-আমিন

তমাল মইনুল ফরিদুল সাকিব রবিন সাকিব মাহমুদ ছাদেকুল

নিঝুম রুদ্র বান্না আসিফ মাহফুজ সাগর আব্দুল্লাহ মাহবুব

সজীব নাসিফ রিয়াজ নাঈম তানজিল সালমান শিহান নাঈম

শ্রাবণ আমিল শরীফ নাঈম মেরাজ

একাদশ শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আহনাফ

সাইফুল অহীদ আসিফ নাঈম সাকিব শিহাব জাওয়াদ আসিফ

রাহীম আরিফিন রাইয়ান জুলকারনাইন তওসীফ হুসেইন অর্ণব তালাল

একাদশ শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সামাউন সামীর ইকবাল মেহেদী নাঈম আসাওয়াত পলক রূপম

আবীর হাবিবুল হাসিবুর ইয়াসিন আ. রহমান ফারসিদ অর্ণব সুহাইব

লাবীব মিলন তানভীর আনান হাবিব শান্ত নাফিস ফাহিম

পল্লব সোহান জাহিদুল পারভেজ ইমন সেতু আনিকুল যোবায়ের

রাকিব মেহেদী হৃদয় ফাহাদ ফয়সল মাজহারুল মাহফুজ সালেকিন

আবির হেদায়েতুল তাফসিরুল মাহীন জয় তৌহিদুল আশরাফুল জিসান

মাশরুর সাজ্জাদ নকীব সুজন শুভ্র অনির্বাণ শিহাব মাধুর্য

আজহারুল রাকিব খায়রুল রুবেল

একাদশ শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তাহসিন ফাহাদ

একাদশ শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

নিনাদ | আসেফ | তালহা | রিদওয়ান | খালিদ | শরণ | সাবের | জামাল

হৃদয় | শান্ত | তানভীর | এহসান | জামিলুর | রিজভী | মোর্শেদ | সুদান

নাঈম | শাহরিয়ার | অনিক | ফরহাদ | সৈকত | জিসান | তাসনিম | খায়রুল

দুর্জয় | তানজিল | জয় | সিকান্দার | ফাহিম | মারুফ | রাফি | আদনান

নুরুজ্জামান | রাকিন | তৌফিকুর | ফয়সাল | তানভীর | রায়হান | সানি | শুভ

ফাহাদ | মহিন | সজীব | বাপ্পী | নুর | ফাহিম | সানজিদ | আহসানউল্লাহ্

পরাগ | সাকিব | আবিদ | আলম | নুরুল | মহসিন | ইমরান | রাফসান

শুভ | নেয়ামতউল্লাহ্ | রায়হান | সৃজন | রাকিব | সাব্বির | রিফাত | রশীদ

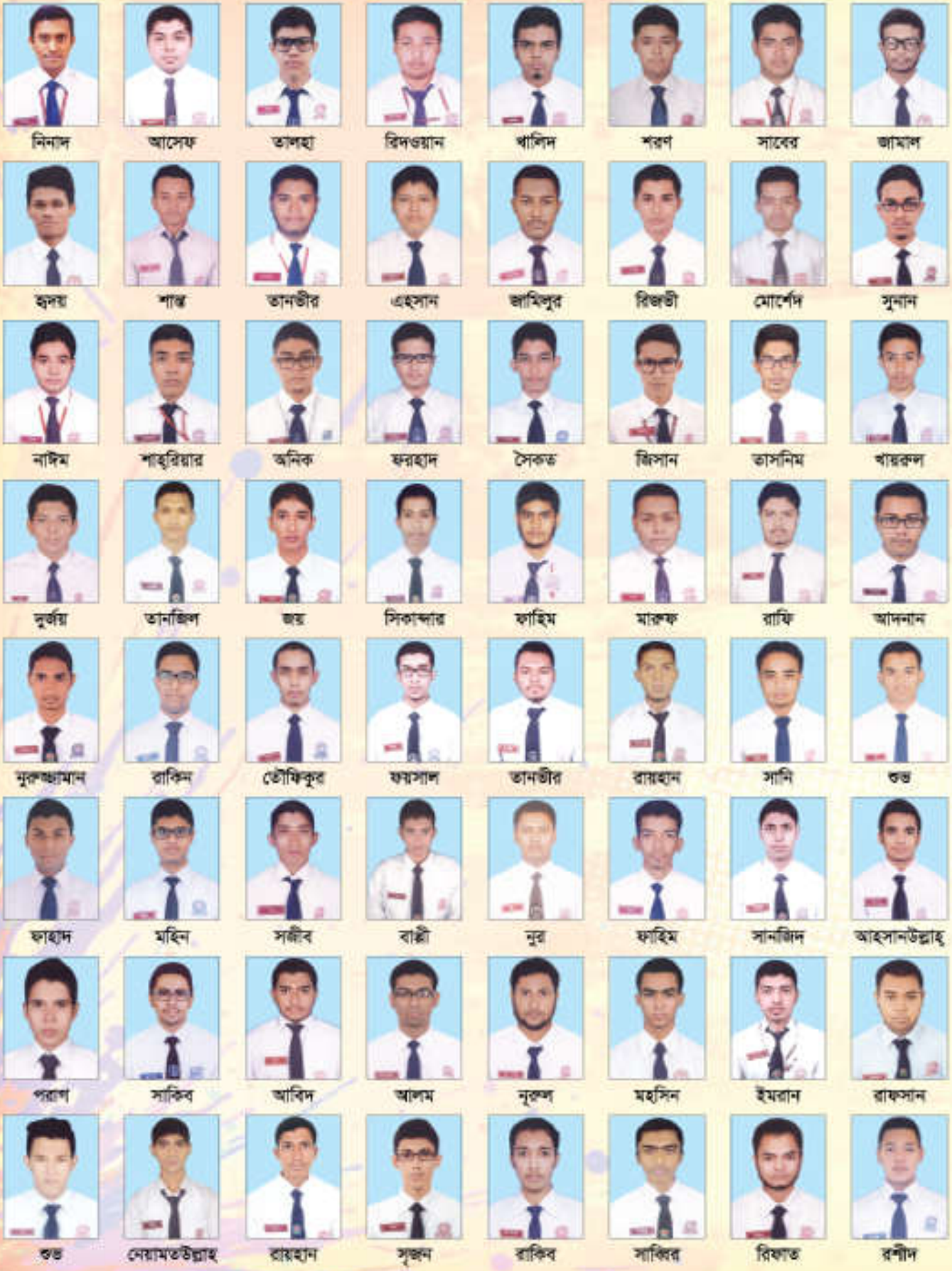

একাদশ শ্রেণি-ত শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

তাহির | তামিম | সাদিক | আরাফাত | তনি | আসাদ | ইসমাইল | হাসান

একাদশ শ্রেণি-ট শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আরিফুর | হাসান | নাফিস | আতিক | রিজভী | গালিব

হাসিবুল | ফারদিন | রাশিদ | শাবাব | রাফাত | আল-আমিন | নাসিমুর | আমিনুল

সামিউল | মারজুক | তানভীর | জারিফ | শুভদীপ | সাদমান | সাকিব | রাফি

রাফিউল | জুবাইর | শাহরিয়ার | ফারহান | রিজওয়ান | মুন | আসিফ | আসাদ

ফারদিন | ইফতেসাম | মাহমুদুর | সাজ্জাদ | ফারদিন | অনিক | ফাহিম | রাকিবুল

আলভী | রুদ্র | ফারাবী | ফুয়াদ | নাহিন | ইব্রাহিম | আহসান | সিজান

আশিকুর | মাসুম | রিফাত | নাঈম | রাফি | শাকিল | শাহরিয়ার | ফাহিম

একাদশ শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

শান্তনু আমিরুল ইশতিয়াক নাফিউল মেহেদী ইমন মিঠু বর্ণ

তালহা নেছার আসিফুর মুস্তাসিম বাবলু রিফাত মাহবুব রাকিবুল

মিরাজ সোহাগ ফাইজুর জাহিদ রেদোয়ান লোকমান অক্ষর কৌশিক

একাদশ শ্রেণি-ছ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আকাশ নাঈম সালমান তাহমিদ আরশাদ তোজাম্মেল

আজ্রিনী নিলয় রেদোয়ান মুনতাসির ইফতেখার ইহতেশাম সুদীপ্ত কাওসার

জিবিয়ান শুভ তৌফিক আলতামাস রিয়াদ পলক মাহমুদুল সামসদ্দুর

তিসান মাঈন তাহিয়াৎ রাফিউ নুরী লেলিন জয়ন্ত ওয়ারেশ

রাফেল রিফাত মৃন্ময় নাবিল নুহিন আদিব ফারুকী ফারদিন

একাদশ শ্রেণি-ছ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আদিত্য	সুমিত	মাহমুদ	মিনহাজ	রাফিদ	মাশফুরুল	রায়হান	সিয়াম

তাবিকুল	আফরাঈম	মাহিন	সালমান	রনি

দ্বাদশ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

মুকিত	সাকিব	তাজুল	সাজ্জাতুল	মিনহাজ	সাকিব	আজিজী	খালেদ

মাহের	নবী	অপূর্ব	রব্বানী	সুদীপ্ত	আরমান	আকিব	ইমরান

মাকসুদুল	রোকনুজ্জামান	জাহিদ	জুনায়েদ	আরিফ	সবুজ	আশরাফুল	সাদ

সবুজ	প্রিন্স	মাসুদুর	রায়ান	শুভ	হাফিজুর	নাঈম	হিজল

প্রতীক	সাইফুল্লাহ	সাদেক	সাকিব	মেহেদী	ফাইয়াজ	আ. কাইয়ুম	নাঈমুর

মাহমুদুল	জিহান	আরিফ	বেল্লাল	তুষার	আরিফ	রাব্বি	ফাহিম

দ্বাদশ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

আকিব মেহেদী রানা রাজিব সাইফুল শুভজিৎ ফয়সাল আশরাফুল

ছিদ্দিক ইমরান মুস্তাফিজুর সবুজ ফজলুল ইনজামুল ইমদাদুল

দ্বাদশ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

হামিদ মুশফিকুর রাফিজুল সাব্বির জোবায়ের রেজাউল

মোনেম রাব্বি হাবিবুল জাহিদুল মশিউর আরশাদ নেছার জাহিদ

তানভির নাঈম মারুফুল শরীফ তৌহিদ আলম এনামুল জাওয়াদ

অর্ণব মাজেদুল আজাদ দীপ কামরুল রাফিউল জিহাদ তাওসিফ

সাকিব সরল হামজা শুভ প্রিতম সাইফুল রাকিব আশিক

বখতিয়ার সৌরভ আদিব ফাহিম রাইসুল বিদ্যুৎ জুনায়েদ প্রান্ত

দ্বাদশ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রিয়াদ | মেহেদী | মাসরুর | সাকি | রাতিন | শাবির | হাসান | এনামুল

তানজিম | নূর | বরকত | তাইজুল | নজরুল | অনিক | রিফাত | হাসিব

দ্বাদশ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

সামিন | কামরুল | সিদ্দিক | নিয়াজ | সাব্বির | আজমাইন

রাইসুল | রায়হান | সালেকিন | মেহেদী | প্রীতম | অনিম | হাসান | সাদিক

মুহীব | মেহেদী | সাইদুর | আরিয়ান | সাইফুল | নাজিমুদ্দিন | নিশাত | নাজমুল

শফিক | আতিক | জাবের | তৌহিদুল | সাকিব | আহাদ | সিয়াম | তৈমিম

জয়ন্ত | আসিফ | মেহেদি | সাকিব | ফারাবী | এহতেশামুর | নাজমুল | কাশেম

মাহমুদ | সোহাগ | ইস্পাহানী | লিমন | সাকিব | রেজা | মেহেদি | রাইয়ান

দ্বাদশ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রাফিউ · আবীর · সাদমান · সাকিব · ইথার · মোহাইমেনুর · সোহান · নাফীস

নাইমুর · মুশফিক · মুজিবুল · হৃদয় · তৌকির · নাজমুল · আলিফ · মিনহাজুল

আফরুল · ফাহিম

দ্বাদশ শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

ওয়াসিফ · ফুয়াদ · এনাম · বন্ধন

মুওয়াইসির · তেশিব · মেহেদী · ফাহিম · হাসিব · এহসানুল · ফাইয়াজ · প্রিতম

রাজ · ইশনাইন · আশিকুর · নাফিউর · আশিকুল · সালমান · মেহেদি · রায়হান

মুশফিকুর · আমিল · উদয় · কামরান · সাদমান · মারসাদ · রওনক · জুহায়ের

মাহিবুর · ইকবাল · আরাফাতুর · ফাতিন · মাসুক · সৌরভ · নোমান · উচ্ছ্বাস

আসিফ · সাজেদুল · মেহেদী · সালসাবিল · সৌরভ · ইউশা · ইহতেশাম · মশিউর

দ্বাদশ শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

তানজিল | জয়গোপাল | মুহিব | শাহদিন | আশিকুর | জোবায়ের | তাওহিদ | আবির

রেজওয়ান | সাইফুল | অন্তর | জিহাদ | সিয়াম | জুনায়েদ | রাব্বী | মামুন

আফতাব | হাসান | আফনান | সজল | ইমরুল

দ্বাদশ শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

শিহাব

মিকাত | আশকারি | আনিসুল | তাহসিন | আশরাফুজ্জামান | মোহাইমেনুল | সাব্বির | মুনির

শুভ | লিংকন | রাতুল | বাশার | সোলাইমান | আসিফ | ফাহাদ | সাইফ

আফ্রিদী | আসিফ | রাফাত | সাইফ | নাশিক | অংকন | মোস্তাকিমুর | ইমতিয়াজ

আতিক | রনি | সাকিব | আসিফ | হানিফ | যাফর | সারোয়ার | শাহারুল

রাব্বি | সোহাগ | রিপন | হলি | মাহদী | আজমাইন | তৌকির | আশিক

দ্বাদশ শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

সালেক | তৌফিক | মবিন | শিহ্বারী | জয় | রাগীব | সৌরভ | ইব্রাহিম

দীপ্ত | সিয়াম | সাব্বির | সিয়াম | রায়হান | আকাশ | তন্ময় | রাহাত

সাকিব | আজহার | আশরাফুল | আশিক | তুহিন | সালমান

দ্বাদশ শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

তানভীর | তৌফিক | নবী | জাওয়াদ | জহিরুল | মামুন | জয় | রিশাদ

তানজীর | খালিদ | রাগিব | আকিব | তরিকুজ্জামান | শাহিল | আবির | আদনান

ধ্রুব | জিহান | মাহি | সাবিত | ইমন | ইশতিয়াক | মাহমুদুল | মুজাহিদুল

উচ্ছ্বাস | রিয়াজ | আজমাইন | জাওয়াদ | বর্ণ | মুস্তাকারুল | মিসবাহ্ | আবরার

নাঈম | ফাহিম | শাহরিয়ার | করিম | শাহিনুর | মাহফুজুর | নাঈম | আলভী

দ্বাদশ শ্রেণি-ঢ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

সানিক | কবির | মিজানুর | সাদিক | জাভেদ | আজম | তাসনিম | মোহাইমিনুল

ফেরদৌস | তাঈম | ওয়াকিল | সৌরভ | নাফিস | ইবন | মামুন | আশফাকুল

শায়ের | জাহিন | তৌফিক | বাঁধন | রেহান | মাশরুর | রাফি | হৃদয়

জাহাঙ্গীর

দ্বাদশ শ্রেণি-ছ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

রাগিব | আলমগীর | শেহাব | অর্ণব | সাকিব

আমের | ফারহান | তামজিদ | ওয়াসিম | আবেদীন | আওসাফ | সাদাদ | বিজয়

ইউসুফ | বরণ | জাওয়াদুল | রাফিদ | নাফিস | সাজিদ | সালেহীন | সালমান

রাফি | সাদিক | হাসিব | মাসনুন | জারিফুল্লাহ্‌ | আমীন | রহমত | সাহিল

প্রত্যয় | সদল | ইকতেদার | আকিবুর | হুজায়ফা | সিদ্দিক | সাদি | আব্দুল্লাহ্‌

দ্বাদশ শ্রেণি-ছ শিক্ষার্থীবৃন্দ (প্রভাতি)

দ্বাদশ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

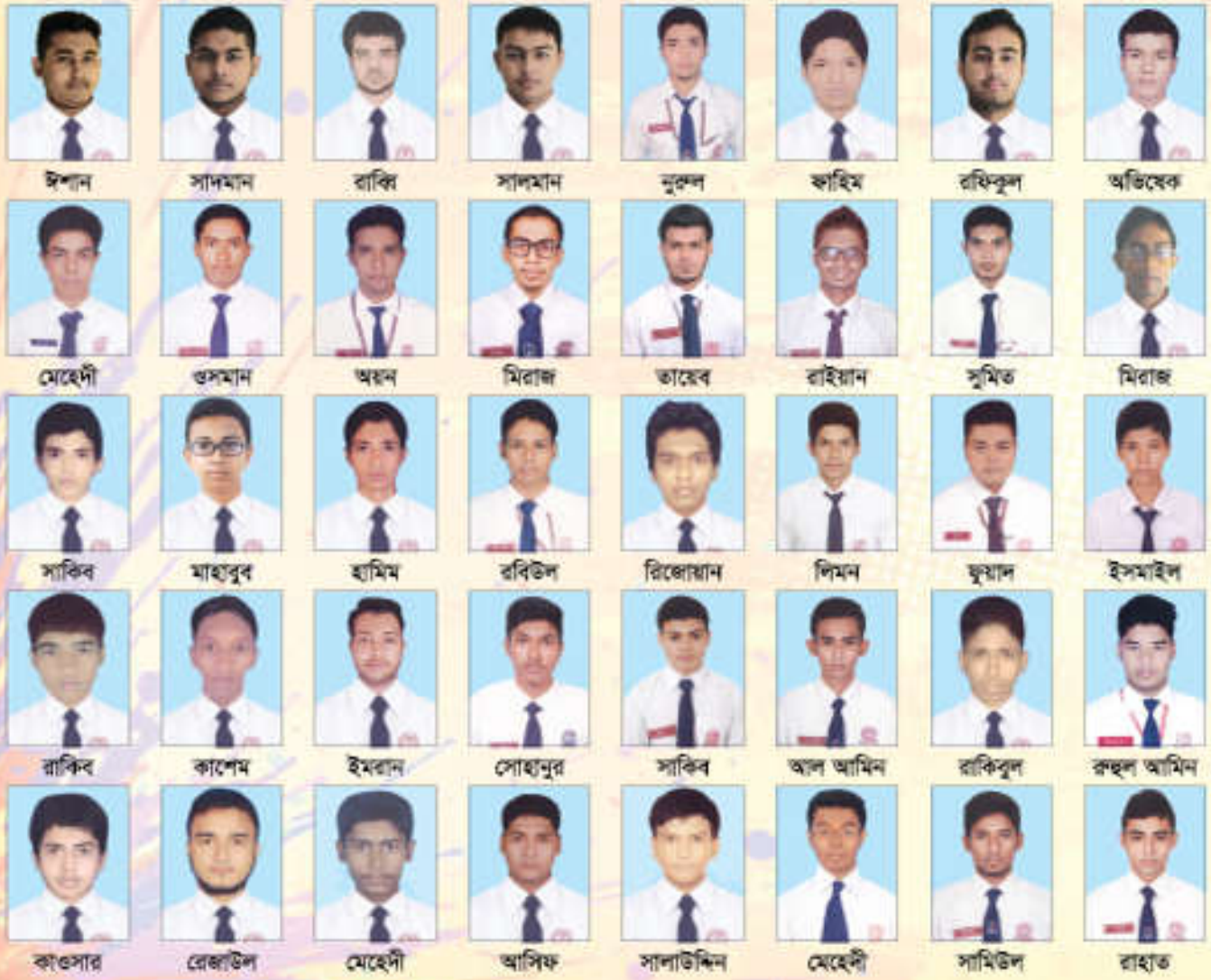

দ্বাদশ শ্রেণি-ক শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সাগর | আরিফুল | তামিম | রিয়াজ | নাজিমুল | আলমগীর | শান্ত | সালমান

সৈকত | আশিক | ইফাজ | সাব্বির | রাফিউল | শহিদুল | ইউসুফ | আসাদুল্লাহ্

কাফিল | আবিদ | সুস্মিত | শাহরিয়ার | রিদোয়ান

দ্বাদশ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

সানজিদ

জারিফ | রিদওয়ান | ইয়াছিন | আইয়াজ | তন্ময় | আবির | আরাফাত | জাফর

শোয়েবুর | মুনতাসির | তৌহিদ | নাজমুল | মিসবাউল | ফারুক | রিয়াসাত | সালমান

আয়মান | জিলানী | ওমর | সুমন | আরিফুর | ফরাশ | হামিম | সানজিদ

শরীফুল | নাঈম | মেহেদী | সামছুল | আসফার | সবুজ | শাকিল | মেহেদী

সুমন | রাশিদ | কামাল | শাকুর | আকিব | মাহমুদ | হৃদয় | আক্তার

দ্বাদশ শ্রেণি-খ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

হাসানুল | তারেকুল | নাহিদ | রাকিব | শান্ত | ইশরাক | এলাহি | শাওন

রাব্বি | আশিকুর | নাবিল | সাদমান | পলাশ | আকিব | মুবদি | যুবায়ের

নাবিদ | মইনুল | রিজেল

দ্বাদশ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

ফাহিম | সুফিয়ান | জারিফ

আকতার | চয়ন | তাসকিদ | ইজাজ | মুশফিকুর | শাবাব | ফারদিন | নাফিউল

ফাহরিদ | সালমান | সামী | নশিন | সাকিব | জোবায়েদ | রাফিদ | আতাউল্লাহ

আশরাফ | আজিজুর | হাবিব | আবরার | সাফি | আবরার | নোমান | রাকেশ

আ. সালাম | আসিফ | আদিত্য | রিয়াজ | ইফতেখার | ফুয়াদ | নাঈমুর | অন্তু

আসিফ | সাকিব | রাকিব | মেহেদী | ফয়সাল | সাকী | সাজিদ | ফাহিম

দ্বাদশ শ্রেণি-গ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

শাকিল | সুমন্ত | জোবায়ের | আ. রহিম | নাঈম | সাইফ | হাসিবুল | সানি

অয়ন

দ্বাদশ শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

জোবায়ের | আতিক | মাহদি | ফারদিন | রাফিন

আদনান | রাইসুল | জোবায়ের | শাতিল | ওমর | রাগীব | অর্জুন | প্রান্ত

শাহরিয়ার | সাজিয়াত | মেহেদী | মুশফিক | শোভন | আকিব | মাতলুব | সজিব

রাইয়ান | শফিউল্লাহ্ | তন্ময় | আদনান | প্রণয় | আকাশ | শাকিল | নিলয়

নাঈমুল | সায়েম | স্বরূপ | মাহমুদুল | রায়হানুর | সালমান | ইসতিয়াক | রাফি

রিফাত | সাবির | নাঈম | তাসফিক | শাহরিয়ার | সেজান | সাজ্জাদ | রাফিদ

মৃদুল | তন্ময় | তূর্য | মাহমুদ | নাফিজ | মাহমুদ | শাহরিয়ার | সাকিব

দ্বাদশ শ্রেণি-ঘ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

আসিফ | জয়নাল | তারেক | জাহিদুর | সাকিব | মেসকুল | ফুয়াদ | আল-আমিন

সামি | তন্ময় | সিরাত | হানজালা | অনিক | ইনজামাম | ওয়াসি | জিহাদুল

রিফাত | মমদু

দ্বাদশ শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

স্বপ্নীল | আশিকুর | ফাহিম | শান্ত

ফয়সাল | রাশিব | অনিক | রেদওয়ান | রাফি | তারেক | আজিম | অপূর্ব

তৌসিফ | জিসান | রুবাইয়াত | তাহমিদ | রাতি | অনিন্দ্য | জান্নাত | ফয়সাল

নাঈম | তানভির | সাফকাত | নাভিদ | ইজাজ | ইমন | ফাহিম | ফয়সাল

ইফতি | সজীব | শংকর | নূর | নাজিফ | নাঈমুল | ইশ্রাত | আলাউদ্দীন

রিফাত | জোবায়ের | মেহেদী | মেহেদী | মাহবুবুর | সাজিদ | সায়েম | কাজী

দ্বাদশ শ্রেণি-ঙ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

শোয়াইব মাহফুজুর মুস্তাকিম নিঝুম মুস্তাফিজুর মোতালেব মাহমুদুল রফিকুল

হাসান মুন্না নাজমুল পাভেল জাহিন মাহমুদুল ইমতিয়াজ সালমান

সাজ্জাদ মুস্তাফিজুর ওসমান রায়হান নাজমুল ইশমাম শিহান মেহেদী

ফাহিম হাবিব

দ্বাদশ শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

ইয়াসিন রাফসান ফাহাদ সওগাত

সোয়েব ওয়াসী সিয়াম মাহবুবুল সাদিক জিলান সালেহ্ মিলকান

তালহা মাহমুদুল রিমন সিফাত মাহদী সাদমান ফাহিম মুসাদ

তানজীর আবদুল্লাহ্ মোস্তাক হাসান ওয়াসিফ সুজয় মাহফুজুর মাহবুবুর

সৈকত জাহিদ জহুর ইমন শাহরিয়ার নুরুজ্জামান স্বপ্ন শাদমান

দ্বাদশ শ্রেণি-চ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

শুভ্র	রিদওয়ান	সাজিদ	আব্দুল্লাহ্	নূর উদ্দিন	শাওন	আব্দুল্লাহ্	খালেদ

আশফাক	শান্তনু	জাহিদ	ইশতিয়াক	সুজা	সালমান	রাকিবুল	রাফিন

মেহেদী	সাদাত	আবরার	কাওসার	ফাহিম	রিয়াজুল	ফাইয়াজ	আদিব

মাফিউর	মুস্তাকিম	মিনহাজুল	শাহ্‌রিয়ার

দ্বাদশ শ্রেণি-ছ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

চয়ন	তন্ময়	আসিফ	ইয়াসের	জামান	জোবায়ের

সাজিদ	নাহি	রেজওয়ানুল	আনিসুল	আমিনুল	রাইহান	সালমান	সাজিদ

তূর্জ	মাহ্‌তাব	রওশন	সালমান	আহনাফ	সৌমেন	সালভী	সাকিব

সাদমান	ফারেক	কাশেম	নাসিক	মাহবুব	ইকরাম	শাফিন	মাহমুদ

দ্বাদশ শ্রেণি-ছ শাখার শিক্ষার্থীবৃন্দ (দিবা)

জোবাইর

রাহাতিল

তাহসিন

তাহসিন

নাফিস

নকীব

দেবাশিস

আব্দুল্লাহ্

শঙ্খ

রুহুল

তামিম

রিফাত

শাশ্বত

মুহাম্মাদি

ইকরাম

সাজ্জাদ

রাফি

ফারহান

ইশরাক

আসিফ

শাফিউল

মুত্তাকিম

রাশিক

মুবিন

রাব্বি

মাসাব

ইশরাক

সাইমন

ইরফান

ইফতার মাহফিল

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
এবং
শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

নবীন বরণ

স্মৃতি-কৃতি-সাফল্য

বিদায়ী অধ্যক্ষের নিকট হতে দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন বর্তমান অধ্যক্ষ

নবাগত অধ্যক্ষকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন উপাধ্যক্ষবৃন্দ

পাঠ্যপুস্তক উৎসব-২০১৫ এ নতুন শ্রেণির বই হাতে শিক্ষার্থীর

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ এর উদ্বোধনী দিবসে ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়াঙ্গন প্রদক্ষিণ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ এ ছাত্রদের কুচকাওয়াজ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ এর সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথির সালাম গ্রহণ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ এ ছাত্রদের তায়কোয়ান্দো ডিসপ্লে

আর্ট অ্যান্ড ফটোফেস্ট-২০১৫ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব-২০১৫ এ অভিবিবৃন্দের বিজ্ঞানপ্রজেক্ট পরিদর্শন

জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব-২০১৫ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৫ এ ক্ষুদে শিক্ষার্থীর সঙ্গীত পরিবেশন

কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর বিদায়ী সভাপতিকে মানপত্র প্রদান

অমর একুশের ভোরে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভাতফেরি

প্রভাতফেরি শেষে কলেজের শহিদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস এবং জাতীয় শিশুদিবস-২০১৫ উদযাপন

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৫ উদযাপন অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীরপ্রতীক লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির এর সাথে শিক্ষার্থীরা

পহেলা বৈশাখ উদযাপন অনুষ্ঠানে স্কুলে শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

নজরুল-জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে ছাত্রদের সমবেত পরিবেশনা

কলেজের ইফতার মাহফিলে বোর্ড অব গভর্নরস এর মাননীয় সভাপতি ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

জাতীয় বিতর্ক উৎসব-২০১৫ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী পালন

কলেজ আয়োজিত জাতীয় ভাষা উৎসব-২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী

জাতীয় ভাষা উৎসব-২০১৫ এ মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী কর্তৃক বিজয়ী ছাত্রকে সনদপত্র প্রদান

জাতীয় ভাষা উৎসব-২০১৫ এর ফটো গ্যালারিতে
সম্মানিত অতিথিবৃন্দের সাথে কলেজের ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের সদস্যরা

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষকে ক্রেস্ট প্রদান

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে মানপত্র প্রদান

বিদায়ী অধ্যক্ষকে কলেজএন্ডার ও কলেজপ্রিফেক্ট কর্তৃক মানপত্র প্রদান

বর্ষশেষে ক্লাসপার্টি অনুষ্ঠানে ক্ষুদে ছাত্রদের সাথে অধ্যক্ষের কেককর্তন

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ উদযাপন অনুষ্ঠানে ছাত্রদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ উদযাপন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষের ভাষণ প্রদান

কলেজের স্মার্ট ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শ্রেণিপাঠদান

কলেজের শিক্ষাভবন-৩ এ বিল্ড ক্লায়েন্ট পদ্ধতির অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব-এ ICT ক্লাস গ্রহণ

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস

রসায়নবিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস

জীববিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস

শিক্ষাভবন-১ এর জিরো ক্লায়েন্ট পদ্ধতির কম্পিউটার ল্যাব-এ ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস

অধ্যক্ষ কর্তৃক তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণির ভর্তিপরীক্ষার হল পরিদর্শন

কলেজের লাইব্রেরিতে বই ও পত্রিকাপাঠে মগ্ন শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

এসএসসি পরীক্ষা-২০১৫ এর ফলাফলে আনন্দমুখর ছাত্রদের মাঝে প্রাক্তন অধ্যক্ষ

এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৫ এর ফলাফল পাওয়ার পর উচ্ছ্বসিত ছাত্ররা

পিইসি পরীক্ষা-২০১৫ এর ফলাফল প্রকাশের পর উল্লসিত ছাত্রদের মাঝে অধ্যক্ষ

জেএসসি পরীক্ষা-২০১৫ এর ফলাফল প্রকাশের পর উল্লাসমুখর ছাত্রদের মাঝে অধ্যক্ষ

কলেজপ্রাঙ্গণে আবাসিক ছাত্রদের মর্নিং পিটি

জুনিয়র হাউসের প্রেয়াররুমে আবাসিক ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুশীলন

কলেজমাঠে আবাসিক ছাত্রদের বৈকালিক খেলাধুলার একাংশ

মাগরিবের নামায আদায়ের উদ্দেশে আবাসিক ছাত্রদের কলেজের কেন্দ্রীয় মসজিদে গমন

উপাধ্যক্ষ কর্তৃক জুনিয়র হাউসে ছাত্রদের নৈশপাঠ প্রস্তুতি পরিদর্শন

কলেজের হাসপাতালে অসুস্থ ছাত্রদের পরিচর্যারত মেডিকেল অফিসার

গণভবন ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এর ফাইনাল খেলা পরিচালনার জন্য কলেজের ক্রীড়াশিক্ষক ভারত চন্দ্র গৌড়-কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ট্রফি প্রদান

সিটি ব্যাংক-প্রথম আলো জাতীয় বিজ্ঞান জয়োৎসবে সেকেন্ডারি গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন এ কলেজের ছাত্রদেরকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কার প্রদান

নায়েম কর্তৃক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অনরাউন্ডার পারফরমেন্স এর জন্য কলেজের নবীন প্রভাষক মোঃ খায়রুজ্জামান-কে শিক্ষাসচিব কর্তৃক ডিজি অ্যাওয়ার্ড প্রদান

গ্রীষ্মকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৫ এ ঢাকা অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন ছাত্রদেরকে মাউশির মহাপরিচালক কর্তৃক পুরস্কার প্রদান

জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০১৫ এ জুনিয়র সার্কেলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন মোঃ এহসানুল হক-কে পুরস্কার প্রদান

কোরিয়া অ্যাম্বাসেডর কাপ তায়কোয়ান্দো চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা-২০১৫ এ বিজয়ী ছাত্রদের সাথে কলেজের ক্রীড়া বিভাগের দুজন শিক্ষক

কোলাজ

ভালো কলেজ মানে...
প্রতিটি ভালো কলেজের সংজ্ঞা পাল্টেছে
প্রথম আলো
প্রীতিযোগিতা
The Daily Star
DHAKA, THURSDAY, JANUARY 1, 2015
Victory Day celebration at Dhaka Residential Model College
বাংলা ভাষা চর্চায় আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান
সিলেবাসের বাইরে
সবুজের সমারোহে ভাষা উৎসব
ঢাকা বোর্ড সেরা আট প্রতিষ্ঠান
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ধারাবাহিক সাফল্যে উচ্ছ্বাস

শিক্ষা ভবন-২
KNOWLEDGE

শিক্ষা ভবন-৩

শিক্ষা ভবন-১
EDUCATION
DISCI